ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪০৯ : ১০

মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুসলিম পুরাকীর্তি
পুঠিয়ার দোচালা মন্দির
বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি: জাসদের ভূমিকা
মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভিধানিকতা
বরেন্দ্র অঞ্চলের পোড়ামাটি ফলকে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি
তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ
জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ
বরেন্দ্র অঞ্চলের বিনধ জাতিগোষ্ঠী
ধানকল চাতালে কর্মরত শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন ও জীবিকা
গ্রামীণ বাংলাদেশে বয়োবৃদ্ধদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ধরন
বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি
হস্তচালিত তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যয়ের নির্ধারকসমূহের গুরুত্ব নির্ণয়
বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
১০ম সংখ্যা ১৪০৯

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
এম. জয়নূল আবেদীন

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯
প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৪১০ ॥ জুলাই ২০০৩

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
জাইদুর রহমান
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ॥ ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibsru@yahoo.com

কভার ডিজাইন
ড. আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস. এম. গোলাম নবী
সহকারী রেজিস্ট্রার, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রক
শাহ্‌পীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

এম. জয়নূল আবেদীন
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সামাদ আবেদীন
প্রফেসর, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আনওয়ারুল হাসান সুফি
প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আফরাউজ্জামান খান চৌধুরী
প্রফেসর, ফিনান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ এনামুল হক
প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মু. রফিকুল ইসলাম
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু তাহের
সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার-ডিস্কেটসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" ফন্টে কম্পোজ করলে ভালো হয়। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে।

সূচিপত্র

মোঃ মনিরুল হক ॥	মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুসলিম পুরাকীর্তি : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা	১
কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ॥	পুঠিয়ার দোচালা মন্দির	১৭
মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম ॥	বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	২৫
মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার ॥	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি : জাসদের ভূমিকা	৪১
স্বরোচিষ সরকার ॥	মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভিধানিকতা	৫১
আবদুল মতিন তালুকদার ॥	বরেন্দ্র অঞ্চলের পোড়ামাটি ফলকে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি	৬১
ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু ॥	তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ	৬৭
মোঃ খাদেমুল ইসলাম ॥	জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ	৭৯
মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী ॥	বরেন্দ্র অঞ্চলের বিন্ধ জাতিগোষ্ঠী: সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন	৯১
রেজা হাসান মাহমুদ ও রায়হানা আখতার জাহান ॥	ধানকল চাতালে কর্মরত শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন ও জীবিকা	১০১
শর্ম্মিষ্ঠা রায় ॥	গ্রামীণ বাংলাদেশে বয়োবৃদ্ধদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ধরন	১১৩
এস. এম. এক্রাম উল্যাহ ॥	বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি : বর্তমান ধারা বিশ্লেষণ	১২১
সুব্রত কুমার দে ॥	হস্তচালিত তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যয়ের নির্ধারকসমূহের গুরুত্ব নির্ণয়	১৩৫
খবির উদ্দীন আহম্মদ ॥	বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	১৪৭

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুসলিম পুরাকীর্তি: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা

মোঃ মনিরুল হক *

Abstract: This paper brings into focus some archaeological finds of a place known as Mahisantosh in the present district of Naogaon. These comprise fragments of mosques, buildings and the like, inscriptions, coins, bricks of burnt-clay and utensils. The study of these relics suggests that during the Muslim rule in Bengal Mahisantosh played an important role in the life of the people of the area. Mahisantosh provides us with a valuable source for reconstructing the history of medieval Bengal. Accordingly, the paper emphasizes the need for extensive excavations and researches in the area.

বাংলায় মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বহু পূর্বে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন শাসনামল থেকেই বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমানে নওগাঁ জেলা) মাহীসন্তোষ বা মাহীগঞ্জ বা মাইগঞ্জ বাংলার একটি বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তবে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পর থেকেই মাহীসন্তোষ অঞ্চলটি অধিকতর সমৃদ্ধ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে থাকে এবং এই সমৃদ্ধির ধারা মুঘল আমলের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সামরিক, প্রশাসনিক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে ইতিহাসে মাহীসন্তোষ সমধিক খ্যাতি লাভ করে।

বখতিয়ার খলজী বাংলার লক্ষ্মণাবতী রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁর রাজ্যকে যে চারটি ইউনিট (unit) বা 'ইকতা'য় বিভাজন করেছিলেন, তার অন্যতম 'ইকতা' ছিল মাহীসন্তোষ। এই 'ইকতা'র প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ইয়যউদ্দীন মুহাম্মদ শীরান খলজীকে 'মুকতা' (administrator) নিযুক্ত করেন।[১] পরবর্তীকালে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) মাহীসন্তোষে একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করলে স্থানটির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।[২] প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই টাঁকশাল 'বারবাকাবাদ টাঁকশাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, বরেন্দ্র তথা সমগ্র উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বারবাকাবাদ টাঁকশালই একমাত্র টাঁকশাল–যেখান থেকে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে মুদ্রা প্রণীত হয়েছে। মুঘল শাসনামলে বাংলায় জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) ও মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের নাম অবগত হওয়া গেলেও, বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত অন্য কোনো টাঁকশালের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না।[৩] মুঘল সম্রাট আকবর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাকে উনিশটি অঞ্চলে বিভক্ত করার সময়ে মাহীসন্তোষের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি ইউনিটের নামকরণ করেন 'সরকার বারবাকাবাদ' এবং মাহীসন্তোষ হয় এর কেন্দ্রভূমি।[৪]

বাংলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা ও কৃষ্টির পীঠস্থান ও পুরোভূমি হিসেবেও মাহীসন্তোষ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানে উন্নীত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ শরিফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রভূমি হিসেবে দেশি-বিদেশি শিক্ষানুরাগীদের আকৃষ্ট করতে থাকে।[৫] এভাবে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মাহীসন্তোষ অঞ্চলে প্রশাসনিক কেন্দ্র গঠন, মুদ্রা প্রণয়ন,

---

* সহকারী পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

টাঁকশাল স্থাপন এবং ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ্ প্রতিষ্ঠার ফলে এ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু এই ঐতিহ্য বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস বিনির্মাণে, মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে। মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত পুরাকীর্তিগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়:

১। স্থাপত্য শিল্প
২। অভিলেখমালা
৩। মুদ্রা
৪। পোড়ামাটির ইট এবং
৫। বিবিধ প্রত্নিদর্শন

১. স্থাপত্যশিল্প

মাহীসন্তোষে আবিষ্কৃত স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, টাঁকশাল ও খানকাহ্ শরিফ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয় ও ইসলামি সমাজ গঠনে মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহ্ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাহীসন্তোষে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার লিপিসাক্ষ্যে পণ্ডিতগণ এখানে নির্মিত মসজিদ সম্পর্কে অবহিত হন। এছাড়া সন্নিহিত এলাকা জুড়ে অনেক পাকা ইমারত ও পাকা প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পোড়ামাটির ইট ও প্রস্তরখণ্ডের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, মাহীসন্তোষ এক সময়ে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

(ক) মসজিদ: মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত শিলালিপি-ভাষ্যে জানা যায়, বাংলায় মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় সুলতানি আমলে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু এখানে বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঠিক কয়টি মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল – তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত ভিন্ন সন-তারিখ যুক্ত একাধিক লিপি থেকে অনুমান করা যায়, মাহীসন্তোষ বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তৎকালে একাধিক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। অধ্যাপক আব্দুল বারী তাঁর (Archaeological Heritage of Rajshahi: Muslim Period) শীর্ষক প্রবন্ধে মাহীসন্তোষের দুটি মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬] মাহীসন্তোষে যে-কয়টি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার সব কয়টি মসজিদ নির্মাণ-সংক্রান্ত। যেহেতু একই মসজিদে একাধিক নির্মাণ-সংক্রান্ত লিপি থাকা যুক্তিযুক্ত নয়, সে কারণে বলা যায়, সেখানে একাধিক মসজিদ থাকাই স্বাভাবিক। এছাড়া, একই হিজরি সনে উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপি সাক্ষ্যে অনুমান করা যায় যে, মাহীসন্তোষের দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে একই সনে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকতে পারে।[৭] অধিকন্তু, বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত মাহীসন্তোষ একটি সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায়, সেখানে একাধিক মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল—একথা বলাই বাহুল্য। যদিও গবেষকগণ এখন পর্যন্ত সেখানে একটি মাত্র মসজিদের ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু ঐ মসজিদের উৎকীর্ণ শিলালিপি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ৮৬৫ হিজরি সনে (১৪৬০-'৬১ খ্রি.) সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে উৎকীর্ণ শিলালিপি—যা ই. ভি. ওয়েস্টম্যাকট সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত[৮]—তার আলোকে মি. ব্লকম্যান,[৯] শামসুদ্দীন আহমেদ,[১০] আ. কা. মো. যাকারিয়া[১১] এবং এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী[১২] যে মসজিদের পরিমাপ ও পরিকল্পনা-বিন্যাস প্রদান করেছেন—সেই মসজিদের শিলালিপি ঐটি নয় বলে ড. সুলতান আহমেদ মত প্রকাশ করেছেন।[১৩] তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে ঐ মসজিদের নির্মাণ ও লিপি অঙ্কনের সময়কাল ৮৬৭ হিজরি সনে রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে সম্পন্ন হয় এবং মসজিদটি ৯১২ হিজরি সনে (১৫০৭ খ্রি.) সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনামলে সংস্কার করে অপর একটি লিপি অঙ্কিত করা হয়। মসজিদের জন্য নির্দিষ্ট শিলালিপি যেটাই হোক, ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ মসজিদের পশ্চিম দিকে টিকে থাকা প্রাচীরের অংশবিশেষ এবং নামায কক্ষের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান কয়েকটি শিলাস্তম্ভ থেকে এর একটি সম্ভাব্য ভূমি নকশা ও নির্মাণ পরিকল্পনা অধ্যাপক এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, মসজিদের আকার, আয়তন এবং গঠন প্রণালী সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু

বলা যায় না। তবে এটি একটি বৃহদাকার মসজিদ ছিল বলে অনুমান করা যায়। মসজিদটি সম্পূর্ণ পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল অথবা মসজিদ প্রাচীরের মূল কাঠামো পোড়ামাটির ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। এর উপর, বাহির ও ভিতর সব অংশে নির্দিষ্ট আকারের শিলাখণ্ড বিশেষ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় সংস্থাপিত হয়েছিল। পরিকল্পনার দিক থেকে এটি আয়তাকার মসজিদ–অভ্যন্তরীণ পরিসরে উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ২০.১১ মিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থ ১১.৮৮ মিটার। তবে মসজিদ প্রাচীরের প্রশস্ততা পরিমাপ করে সম্পূর্ণ মসজিদের পরিমাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্যে ২৪.৩৮ মিটার এবং প্রস্থে ১৬.১৫ মিটার। জুল্লাহ্ বা নামায কক্ষের অভ্যন্তরে পাথরস্তম্ভের অবস্থান বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই মসজিদ উত্তর থেকে দক্ষিণে তিন আইল বা লম্বমান তিন খিলান পথ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাঁচ 'ব্যে' বা হ্রস্বমান গলিপথে বিভক্ত ছিল। তাতে করে এই নামায কক্ষের পনেরটি পরিসর ছিল, যার ছাদ অর্ধ গোলাকৃতির পনেরটি ইটের গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।[১৪] কিন্তু আ. কা. মো. যাকারিয়া তাঁর 'বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে দশটি গম্বুজের কথা উল্লেখ করেছেন। এর উত্তর দেয়ালে কালো পাথরের চৌকাঠ নির্মিত একটি দরজার চিহ্ন লক্ষণীয় এবং একই পাশে আরো একটি দরজা ছিল বলে অনুমান করা হয়। দক্ষিণের দেয়ালে দুটি এবং পূর্বের দেয়ালে খুব সম্ভব পাঁচটি দরজা ছিল। পশ্চিম দেয়ালে লতা, পাতা, ঝুলন্ত শিকল, প্রস্ফুটিত পুষ্প ইত্যাদি অলঙ্করণের অনুপম কাজযুক্ত কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত পাঁচটি মিহরাবের অস্তিত্ব ছিল।[১৫] ভূমিকম্প বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন প্রস্তরসমূহ খণ্ডিত হয়ে যায়। এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দীর্ঘদিন গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। বর্তমানে জঙ্গল পরিষ্কার করে প্রাচীন মসজিদ প্রাঙ্গণে টিন দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীন মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়াল ভূমির সাথে মিশে গেছে; তবে ভূমি থেকে প্রায় তিন ফুট উচুঁতে পশ্চিম দেয়ালের কিছু অংশ এখনো টিকে আছে (দ্রষ্টব্য: চিত্র-১)।

মি. ভি. ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক আবিষ্কৃত অপর একটি শিলালিপি সাক্ষ্যে অনুমান করা হয় যে, একই হিজরি সনে, অর্থাৎ ৮৬৫ হিজরিতে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে মুয়াজ্জাম উলুঘ ইকরার খান কর্তৃক অন্য আর একটি মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করা হয় এবং ৮৭৬ হিজরি সনে (১৪৭১-'৭২ খ্রি.) তা সমাপ্ত হয়।[১৬] কিন্তু এই মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত লিপি সাক্ষ্যে একথা বলা যায় যে, সেখানে সুলতানি আমলে অন্ততপক্ষে তিনটি মসজিদ নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ চত্বরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায় ঐ মসজিদের মিহরাবের কিছু খণ্ডিত অংশ জাদুঘরে নিয়ে আসেন এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে মিহরাবের ষোলটি খণ্ডিত প্রস্তরাংশ সিমেন্ট সহযোগে সংযুক্ত করে একটি মিহরাবের আকৃতি প্রতিষ্ঠিত করে প্রদর্শন করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য: চিত্র-২)।[১৭] কিন্তু মিহরাবটি আকার আয়তনের দিক থেকে মোটেই পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেনি। এই মিহরাবটি মসজিদে ব্যবহৃত পাঁচটি মিহরাবের প্রস্তর খণ্ডের সংমিশ্রণে নির্মাণ করা হয়েছে। মিহরাবে ষোলটি খণ্ডিত পাথর সংযুক্ত করা হলেও, এতে ব্যবহৃত দশটি খণ্ডের পরিগ্রহণ সংখ্যা লক্ষ করা যায়।[১৮] অর্ধবৃত্তাকৃতির এই মিহরাবের উচ্চতা ১.৪০ মিটার, প্রস্থ ১.৩৫ মিটার, গভীরতা ০.৮৪ মিটার এবং অর্ধবৃত্তের পরিধির পরিমাপ ২.২৬ মিটার। মিহরাবের অভ্যন্তরভাগে অল্প খোদাইয়ে নকশা অঙ্কিত এবং বিভিন্ন প্যানেলে বিভক্ত। এর মধ্যভাগে উল্লম্বভাবে যে নকশাটি খোদাইকৃত, তা অতি পরিচিত হিন্দু 'শিকল ও ঘণ্টা' নকশার বিস্তৃত রূপ। এটি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের দেয়ালে অঙ্কিত 'শিকল ও ঘণ্টার' অনুকৃতি বলা হয়। তবে এই নকশাটির 'ঘণ্টার' আকৃতি আরও বেশি বিস্তৃত এবং এর অলঙ্করণে মুসলিম প্রভাব সুস্পষ্ট। এই বেশি বিস্তৃতি এবং মুসলিম প্রভাব সাক্ষ্য দেয় যে, মাহীসন্তোষের মসজিদ ও মিহরাব ছোট সোনা মসজিদের পরে নির্মিত হয়েছে।[১৯] 'শিকল ও ঘণ্টা' নকশার উভয় পার্শ্বে একটি করে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও ফুলের শাখা এবং এর ভূমিখণ্ড পদ্ম 'পামেট' (palmette) দ্বারা অলঙ্কৃত। 'শিকল ও ঘণ্টা' নকশার দুই পাশে যে সমস্ত 'প্যানেল' রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই বৃত্তস্থিত প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা দ্বারা সজ্জিত। বৃত্ত ও পদ্ম নকশার প্যানেলগুলি নানা ধরনের পাড় দ্বারা শোভিত। পাড়গুলির অধিকাংশই 'এরাবেস্ক' (arabesque) এবং জালিকা নকশায় অঙ্কিত। প্যানেলের নিচে অনুভূমিকরূপে দুটি পাড় স্তম্ভের ভূমিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মিহরাবের উপরে যে কার্নিশ রয়েছে, এর সম্মুখ ভাগ 'এরাবেস্ক' নকশা এবং উপর ও নিম্নভাগ পদ্ম পাতার নকশায় সজ্জিত। মসজিদ ও মিহরাবে ব্যবহৃত প্রস্তর বা প্রস্তর খণ্ড কালো পাথরের তৈরি (black basalt)।

এগুলি প্রাক্ মুসলিম যুগে ছোট নাগপুর ও রাজমহল পাহাড় অঞ্চল থেকে মন্দির ও প্রতিমা নির্মাণ কাজের জন্য নীত হয়ে থাকতে পারে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।[২০] কারণ, মিহরাবে ব্যবহৃত এবং অন্যান্য প্রস্তর খণ্ডের পশ্চাৎ ভাগে হিন্দু দেব-দেবীর বিভিন্ন ভাস্কর্য স্পষ্টত লক্ষণীয়। মসজিদে ব্যবহারের সময়ে ঐ সমস্ত ভাস্কর্য প্রস্তরের পশ্চাৎ ভাগের সমতল পৃষ্ঠ খোদাই করা হয়েছিল।

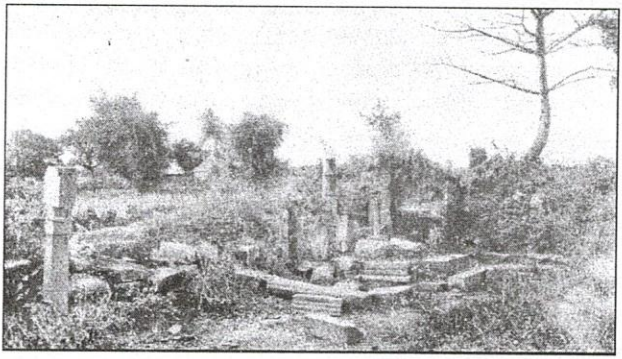

চিত্র নং ১. মাহীসন্তোষ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, ধামুইর হাট, নওগাঁ

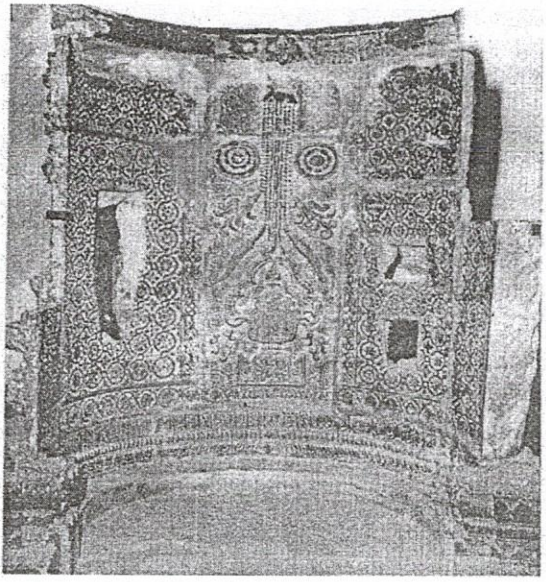

চিত্র নং ২. মিহরাব, মাহীসন্তোষ মসজিদ

এই সময়েই সম্ভবত ভাস্কর্য প্রতিমার অনেকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; ফলে জাদুঘরের মিহরাবটির (?) পশ্চাৎ ভাগে প্রতিমা-অবয়ব বেশ অস্পষ্ট। প্রফেসর মুখলেসুর রহমান মূর্তিগুলিকে নিম্নোক্তরূপে ক্যাটালগ প্রণয়ন করেছেন–

The seven pieces of sculptures which are now exposed to view at the back of the Mihrāb are:

a. An image of Sūrya, much mutilated (VRM-301-a).

b. Pedestal of a Mahiṣamardinī image, severely damaged, with the figures of a decapitated buffalo and a pair of worshippers (VRM -301-b).
c. Pedestal of an uncertain image (VRM -301-c).
d. Pedestal of an uncertain image (VRM -301-d).
e. Pedestal of an uncertain image (VRM -301-e).
f. An image of Viṣṇu Trivikrama, very badly mutilated (VRM-301-f).
g. Fragment of an uncertain image (VRM-301-g).[২১]

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রদর্শিত মিহরাবটির ষোলটি প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে একটি বালুকা প্রস্তর (Gray sandstone) নির্মিত অলঙ্কৃত খিলান (Decorated Arch, No. VRM-311); দুটি মিহরাবের অংশ বিশেষ (Part of a Qiblah, No.VRM-299 A & 299 B); সাতটি খণ্ডিত প্রস্তরাংশ একপাশে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত (Fragmentary Hindu Sculptures, No.VRM- 301-a, 301-b, 301-c, 301-d, 301-e, 301-f, 301-g); একটি প্রস্তর খণ্ড (Stone Slab, No.VRM-300) এবং পাঁচটি Architectural fragment– যা জাদুঘরের নথিভুক্ত হয়নি।

(খ) মাদ্রাসা: ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত আলিম ও ইসলামি সাধক মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী মাহীসন্তোষে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[২২] তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও এটা জানা যায় যে, তাঁর শিষ্য ইয়াহিয়া মানেরী ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই সূত্রে অধ্যাপক ইয়াকুব আলী মত পোষণ করেন যে, খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে মাওলানা তাকীউদ্দীন আল-আরাবী মাহীসন্তোষের মাদ্রাসায় ইলমে দীনের শিক্ষা প্রদান করতেন।[২৩] ইসলামি জীবন বিধান এবং অন্যান্য জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত বিষয়ে সেখানে দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থীরা এসে অধ্যায়ন করে যেতো।[২৪] বর্তমানে মাহীসন্তোষ মাদ্রাসার কোনো নির্দিষ্ট স্থাপত্য চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয়, বর্তমানে যে মাযারটি রয়েছে, তার পশ্চিম পাশে এই মাদ্রাসাটির অবস্থান ছিল। এখানে বেশ কয়েক বছর পূর্বেও প্রাচীন ইট পাওয়া গেছে।

(গ) মাযার: মাহীসন্তোষে অবস্থিত প্রাচীন জলাশয়ের মধ্যে 'মিঠাপুকুর' নামে পরিচিত যে দিঘিটি রয়েছে, তার পশ্চিম পাশে মাহীসন্তোষ মাযার অবস্থিত। কার বা কাদের নামের সাথে এই মাযারের নাম সম্পৃক্ত, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মন্টগোমারি মার্টিনের *Eastern India* গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, At Mahigunj on the east side of the Atreyi, near the northern extremity of the division, is said to be such another place, with a monument of a Muhammedan saint named Mohi Sontosh, who has communicated his name to the district (Purgunah), ...[২৫] এই বক্তব্যের সূত্র ধরে পরবর্তীতে ওয়েস্টম্যাকট, ব্লকম্যান, শামসুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ পণ্ডিত একই মত সমর্থন করেন। বস্তুত ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তর লিপি দুটি ঐ মাযারের দেয়াল গাত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। মি. বুকানন মাযার এবং মসজিদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, The two inscriptions, as is so often the case, have nothing to do with the tomb. In all probability, the tomb is older than the inscriptions.[২৬] আমরা জানি, কোনো বিশিষ্ট আলেম, ধর্ম প্রচারক এবং জনহিতৈষী ব্যক্তির আস্তানা বা সমাধি প্রাঙ্গণকে ঘিরে আমাদের দেশে মাযার প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলায় মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিককালে যে কয়জন ইসলামি সাধক এদেশে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্মীয় আচার-আচারণ এবং জনকল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাহীসন্তোষের তাকীউদ্দীন আল-আরাবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার পাশে তাঁকে সমাহিত করা হলে, সম্ভবত সেখানে একটি মাযার গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শিষ্য বা মুরিদ হিসেবে মাহী ও সন্তোষ নামে মাতা-কন্যা ঐ মাযারে আস্তানা গেড়ে বসে এবং কালক্রমে তাঁদের দুজনের নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্থানটির নাম মাহীসন্তোষ রূপে পরিচিত লাভ করতে থাকে। ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুহাম্মদ শীরান খলজী মাহীসন্তোষেই নিহত ও সমাহিত হন ; কিন্তু তাঁর কবর আজও সনাক্ত করা যায়নি। মাহীসন্তোষ মাযারটি শীরান

খলজীর কিনা, তা নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও এ ধরনের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।[২৭] মাহীসন্তোষ মাযারের তেমন কোনো প্রাচীন নিদর্শন আজ আর অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে একটি অনুচ্চ আধুনিক প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে মাযারটি অবস্থিত। মাযারের আশে পাশে এবং মাযার প্রাঙ্গণে বেশ কিছু কবর রয়েছে; এর মধ্যে শিলালিপির নির্মাতা 'উজির'-এর একটি কবর রয়েছে বলে স্থানীয়ভাবে লোকশ্রুতি আছে।

২. অভিলেখমালা

ইতিহাস পুনর্গঠন ও সংকলনের অন্যতম উপাদান হলো লেখমালা। প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে মাহীসন্তোষের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–তার সিংহভাগ উপকরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে মাহীসন্তোষ অঞ্চলে প্রাপ্ত অভিলেখে। প্রাপ্ত অভিলেখের সবগুলিই শিলালেখ। কালো পাথরে খোদাইকৃত সবকয়টি শিলালিপিতেই মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত চারটি শিলালিপির মধ্যে দুটি ওয়েস্টম্যাকট,[২৮] একটি কুমার শরৎকুমার রায়[২৯] এবং একটি ড. সুলতান আহমেদ[৩০] কর্তৃক সনাক্ত। অবশ্য লিপির আবিষ্কর্তা ও প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। জনাব আব্দুল করিম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, একটি লিপি জন মার্শম্যান কর্তৃক উদ্ধারকৃত। কিন্তু তথ্যটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। মার্শম্যান কর্তৃক যে লিপিটি গৌড় থেকে সংগ্রহ করে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চত্বরে নিয়ে যাবার কথা রাখালদাস উল্লেখ করেছেন,[৩১] বস্তুত ঐ লিপিটি সুলতান বারবাক শাহের নামাঙ্কিত হলেও, তা মাহীসন্তোষের নয়। দিনাজপুরের চেহেল গাজীর মাযার থেকে ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক একটি লিপি উদ্ধারের দুই মাস পর মার্শম্যান অপর একটি লিপি গৌড় থেকে শ্রীরামপুর কলেজ চত্বরে (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ) নিয়ে যান এবং এটি পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতায় হস্তান্তরিত হয়।[৩২] চেহেল গাজীর মাযার থেকে ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক উদ্ধারকৃত লিপির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধেও বিভ্রান্তি রয়েছে। আহমদ হাসান দানী তাঁর *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal* গ্রন্থে এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান মাহীসন্তোষ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] কিন্তু লিপিটির বর্ণনা, নির্মাণ তারিখ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি দিনাজপুর জেলার হলেও, মাহীসন্তোষের নয়;[৩৪] কারণ চেহেল গাজীর মাযার মাহীসন্তোষে অবস্থিত নয়। উল্লেখ্য, এই লিপিটিও সুলতান বারবাক শাহের আমলে ৮৬৫ হিজরি সনে নির্মিত হয় এবং এটিও ওয়েস্টম্যাকট উদ্ধার করেন।

(ক) ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক আবিষ্কৃত মাহীসন্তোষ লিপি: ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলার (তখন মাহীসন্তোষ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অধীনে আসে এবং বর্তমানে নওগাঁ জেলার ধামুইর হাট উপজেলার সীমানাভুক্ত) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টম্যাকট দুটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। এর মধ্যে একটি লিপি আকারে বড় দুই সারিতে সমাপ্ত এই শিলালিপিটির দৈর্ঘ্য ৯১.৪৪ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ২৭.৯৪ সেন্টিমিটার। অপর লিপিটি আকারে ছোট, যার দৈর্ঘ্য ৪৩.১৮ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ২১.৫৯ সেন্টিমিটার; এই লিপিটিও দুই সারিতে সমাপ্ত হয়েছে। ওয়েস্টম্যাকট দুটি লিপিই মাহীসন্তোষে অবস্থিত 'মাহীসন্তোষ' নামক মুসলিম পিরের মাযার থেকে উদ্ধার করেন–যার মধ্যে আকারে বড় লিপিটি মাযারের প্রবেশ পথের অভ্যন্তরীণ দরজার উপরে এবং ছোটটি মাযার ভবনের বাহিরের দেয়ালে গ্রথিত ছিল।[৩৫]

ওয়েস্টম্যাকট সাহেব লিপি উদ্ধারের পর তার বিবরণ *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIV,1875 - এ প্রকাশ করেন।[৩৬] পরবর্তীকালে শামসুদ্দীন আহমেদের সম্পাদনায় *Inscriptions of Bengal*, Vol.IV-এ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এবং এইচ. ব্লকম্যান-এর *Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammedan Period)* গ্রন্থে তা বিস্তারিতভাবে পুনরুল্লিখিত হয়েছে।[৩৭] ওয়েস্টম্যাকট লিপি উদ্ধারের পর তা পাঠোদ্ধারের জন্য জে. পি. স্লেইড ও এইচ. ব্লকম্যানের নিকট প্রেরণ করেন।[৩৮] কালো পাথরে আরবি হরফে তুঘরা (*Tughra*) স্টাইলে খোদাইকৃত বড় আকারের শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের শাসনামলে বারবাকাবাদের উজির খান উলুঘ ইকরার

খানের তত্ত্বাবধানে এবং খান আশরাফ খানের মাধ্যমে ৮৬৫ হিজরি সনে (১৪৬০-'৬১ খ্রি.) একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এই মসজিদের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। অধ্যাপক ইয়াকুব আলী, আ. কা. মো. যাকারিয়া প্রমুখ পণ্ডিত বর্তমানে ধ্বংসস্তূপের উপর অবস্থিত টিনের চালা দ্বারা নির্মিত মসজিদের স্থানকে ঐ মসজিদ বলে উল্লেখ করলেও, ড. সুলতান আহমেদ তাতে ভিন্নমত পোষণ করেন।[৩৯] মি. ওয়েস্টম্যাকট কর্তৃক আবিষ্কৃত দুই সারিতে সমাপ্ত তুলনামূলক ছোট লিপির আংশিক পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায়, সুলতান বারবাক শাহের আমলে খান-উল-আজম ওয়াল মুয়াজ্জম উলুঘ (খান) বিখ্যাত বারবাকাবাদ শহরের উজির ৮৭৬ হিজরি সনে (১৪৭১-'৭২ খ্রি.) একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।[৪০]

(খ) শরৎকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত শিলালিপি: ১৯১৬ খ্রি. বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (পরবর্তীতে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুমার শরৎকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে মাহীসন্তোষ অঞ্চলে সীমিত পর্যায়ে একটি অনুসন্ধান ও উৎখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উৎখনন কালে মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে (যে ধ্বংসস্তূপের উপর বর্তমানে টিনের চালা দ্বারা মসজিদ নির্মিত আছে) একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। লিপিটি শরৎকুমার রায় সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে হস্তান্তর করেন।[৪১] অধ্যাপক সরাফ-উদ-দীন লিপিটির আংশিক পাঠোদ্ধার করেন এবং তা বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ করেন।[৪২] পরবর্তী কালে শামসুদ্দীন আহমেদ লিপির অবশিষ্টাংশের অর্থোদ্ধার করে *Inscriptions of Bengal*, Vol. IV-এ প্রকাশ করেন।[৪৩] লিপির উপরের দিকে বাম অংশ খণ্ডিত হওয়ার কারণে ঐ অংশের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

কালো শিলাখণ্ডে খোদাইকৃত লেখাটি দুই সারিতে সমাপ্ত এবং আরবি হরফে নাসখ স্টাইলে লিখিত। উল্লেখ্য, শিলালেখের পশ্চাৎ ভাগে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর প্রতিকৃতি, পদ্ম মটিফ এবং অন্যান্য আলঙ্কারিক চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।[৪৪] লিপির দৈর্ঘ্য ৪৮.৩ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ২৪.১ সেন্টিমিটার। লিপি পাঠে জানা যায়, ৯১২ হিজরি সনের রমযান মাসের নয় তারিখে (১৫০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি) সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর হুসেন শাহের নির্দেশে সুহেলের পুত্র কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, একই মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় (অন্যটি ড. সুলতান আহমেদ কর্তৃক আবিষ্কৃত ৮৬৭ হিজরি সনের লিপি) অনুমান করা যায় যে, দুটি লিপিতেই একই মসজিদ নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে (দ্রষ্টব্য: চিত্র-৩,৪)। এ বিষয়ে ড. সুলতান আহমেদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বস্তুত মসজিদটি সুলতান বারবাক শাহের শাসনামলে ৮৬৭ হিজরি সনে নির্মিত হয়েছিল—যা পরবর্তীকালে ৯১২ হিজরি সনে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনামলে পুনর্নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়।[৪৫]

(গ) সুলতান আহমেদ কর্তৃক আবিষ্কৃত শিলালিপি: কুমার শরৎকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক অনুসন্ধানের দীর্ঘদিন পর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সুলতান আহমেদ মাহীসন্তোষে আর একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। মাহীসন্তোষে ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের উপর বর্তমানে যে টিনের চালা দ্বারা নির্মিত কাঁচা মসজিদ রয়েছে, তার সামনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ড. আহমেদ লিপিটি সনাক্ত করেন এবং এর পাঠোদ্ধার করে তিনি *JPHS*, Vol. XLVI, No. 2-তে প্রকাশ করেন।[৪৬] ঐ শিলালিপিটি পরবর্তীকালে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চৌঘাট গ্রামের জনাব নূর মোহাম্মদের নিকট থেকে পাহাড়পুর জাদুঘরের সহকারী কাস্টোডিয়ান জনাব মাহাবুব-উল-আলম ৮ নভেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রহ করে নিয়ে যান।[৪৭] বর্তমান লিপিটি পাহাড়পুর জাদুঘরের প্রদর্শন কক্ষে উন্মুক্ত রাখা আছে। কালো পাথরের উপর দুই সারিতে লেখা এই লিপিটি পূর্বে আবিষ্কৃত অন্য লিপি থেকে আকারে বেশ বড় ; এর দৈর্ঘ্য ১১০ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ৪২ সেন্টিমিটার। শিলালিপির উপরের দিকে বাম অংশ খানিকটা ভাঙা। আরবি হরফে নাসখ (*Naskh*) স্টাইলে খোদিত এই লিপি থেকে জানা যায়, ৮৬৭ হিজরি সনে (১৪৬৩ খ্রি.) সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ উলুঘ খান হাসানের মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করান।[৪৮] ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির স্থলে বর্তমানে টিনের চালা দ্বারা নির্মিত একটি মসজিদ দণ্ডায়মান।

৩. মুদ্রা

বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রণীত মুদ্রার ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। বরেন্দ্র অঞ্চলে মুদ্রিত মুদ্রা মানেই মাহীসন্তোষ তথা বারবাকাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত মুদ্রাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলার মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে একমাত্র সুলতানি আমলেই সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ কর্তৃক মাহীসন্তোষে ১৪৫৯-'৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে একটি টাঁকশাল (mint town) প্রতিষ্ঠিত হবার কথা অবগত হওয়া যায়–যা সুলতানের নামানুসারে 'বারবাকাবাদ টাঁকশাল' নামেই পরিচিতি লাভ করে। পণ্ডিতগণের মতে, এই বারবাকাবাদ টাঁকশালই ছিল মাহীসন্তোষের সরকারি টাঁকশাল।[৪৯]

বারবাকাবাদ টাঁকশাল থেকে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা ছাড়াও পরবর্তী পর্যায়ে সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ (১৪৯০-'৯৩ খ্রি.) এবং সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের (১৫১৯-'৩২ খ্রি.) নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা যায়।[৫০] তবে আশ্চর্যের বিষয়, 'বরেন্দ্রে অবস্থিত টাঁকশাল (বারবাকাবাদ টাঁকশাল) হতে মুদ্রিত মুদ্রা সমগ্র বাংলার জন্য প্রবর্তিত ছিল বলে জানা গেলেও, এই টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত কয়েকটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য: চিত্র-৫)।[৫১] অধ্যাপক আব্দুল বারী তাঁর প্রবন্ধে তিনজন সুলতানের নামাঙ্কিত ছয়টি রৌপ্য ধাতুর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন; এর মধ্যে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের নামাঙ্কিত তিনটি রৌপ্য, সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের নামাঙ্কিত দুটি রৌপ্য এবং সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহের নামাঙ্কিত একটি রৌপ্য মুদ্রা।[৫২] কিন্তু এই ছয়টি মুদ্রার মধ্যে একটি মুদ্রা তাম্র ধাতুতে নির্মিত (সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহের নামাঙ্কিত) বলে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া অপর আর একটি রৌপ্য মুদ্রার কথাও (সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের নামাঙ্কিত) জানা যায়।

বারবাকাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহের নামাঙ্কিত রৌপ্য ধাতুর নির্মিত মোট চারটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে; এর মধ্যে তিনটি মুদ্রা ৮৬৪ হিজরি সনে (১৪৫৯-'৬০খ্রি.) মুদ্রিত। এই মুদ্রা তিনটি মুদ্রতত্ত্ববিদ এ. এস. এম. তৈয়ফুর সংগ্রহ করে ঢাকা জাদুঘরে (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) দান করেন। মুদ্রা তিনটির মধ্যে একটির পরিমাপ ১.০৮ ইঞ্চি (?) (২.৭৪ সে. মি.) এবং অন্য দুটির প্রতিটি ১.১০ ইঞ্চি (?) (২.৭৯ সে. মি.) করে।[৫৩] বারবাক শাহের নামাঙ্কিত এবং বারবাকাবাদ টাঁকশাল (?) থেকে মুদ্রিত অপর একটি রৌপ্য মুদ্রা ৮৭৩ হিজরি সনে (১৪৬৮-'৬৯ খ্রি.) মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে, One little Coin (No.79) dated 873 A.H. and issued from Bārbakābād (Bārbak in the Coin) mint is a very good specimen in respect of shape, calligraphy and workmanship, and stands out as a rare exception among the large number of crude and uncouth Coins turned out during the later Ilyās Shāhī Period.[৫৪] মুদ্রাটি বর্তমানে পশ্চিম বাংলার প্রদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত (Museum No. 07.612) এবং এর পরিমাপ যথাক্রমে ২.৫৬ সে. মি. ও ১০.৬৪৪৯ গ্রাম।[৫৫]

চিত্র নং ৩. মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত সুলতান বারবাক শাহের শিলালিপি (৮৬৭ হিজরি)

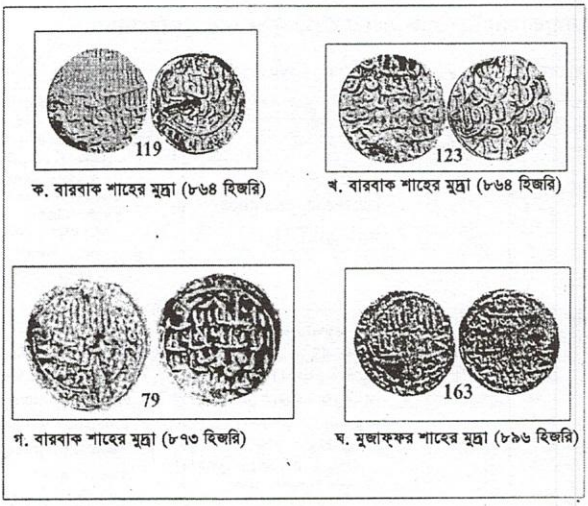

ক. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৬৪ হিজরি)
খ. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৬৪ হিজরি)
গ. বারবাক শাহের মুদ্রা (৮৭৩ হিজরি)
ঘ. মুজাফ্ফর শাহের মুদ্রা (৮৯৬ হিজরি)

চিত্র নং ৫. মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত মুদ্রা

নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহের নামাঙ্কিত মাত্র দুটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে এর মধ্যে একটি রৌপ্য ধাতু এবং অপরটি তাম্র ধাতুতে নির্মিত।[৫৬] তাম্র ধাতুতে নির্মিত মুদ্রাটির ওজন এবং পরিমাপ হলো ১৬৩.১ গ্রেইন (?) (৮.৭৩৬৮ গ্রাম) এবং ১.১৪ ইঞ্চি (?) (২.৯০ সে. মি.)। ৯২৮ হিজরি সনে (১৫২২-'২৩ খ্রি.) মুদ্রিত দুটি মুদ্রাই সিলেট জেলার কঙ্করীবাগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বর্তমানে তা আসামের Provincial Coins Cabinet-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[৫৭] তাম্র ধাতুতে মুদ্রিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এই মুদ্রাটি সুলতানি আমলের একটি দুর্লভ সংগ্রহ। সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহের (১৪৯০-'৯৩ খ্রি.) নামে বারবাকাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা প্রণীত হয়েছে। তবে তাঁর নামাঙ্কিত একটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। ৮৯৬ হিজরি সনে (১৪৯০-'৯১ খ্রি.) মুদ্রিত এই মুদ্রাটির ওজন ১৬৫ গ্রেইন (?) (৮.৮৩৮৬ গ্রাম) ও পরিমাপ ১.১ ইঞ্চি (?) (২.৭৯ সে. মি.)–যা বর্তমানে Indian Museum কলিকাতায় সংরক্ষিত রয়েছে (দ্রষ্টব্য: সারণি)।[৫৮] মুদ্রিত সাতটি মুদ্রা ব্যতীত টাঁকশালের অন্য কোনো প্রত্নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। টাঁকশাল ভবনের ধ্বংসাবশেষও আজ আর চোখে পড়ে না। অনুমান করা হয়, বর্তমান মাযার চত্বরের উত্তর পশ্চিম পাশে টাঁকশাল ভবনের অবস্থান ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ ধ্বংসচিহ্ন অপসারণ করে সেখানে চাষাবাদ করছে। এই অঞ্চলে ব্যাপক উৎখনন এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করলে, আরও মুদ্রা ও টাঁকশালের প্রত্নিদর্শন আবিষ্কার সম্ভবপর বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

৪. পোড়ামাটির ইট

মাহীসন্তোষে কোনো অক্ষত সৌধ বা ভবন এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তবে সেখানকার ধ্বংসস্তূপ থেকে বা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু পোড়ামাটির ইট আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত ইট মাহীসন্তোষের মসজিদ, মাদ্রাসা, মাযার এবং টাঁকশাল ভবনের দেয়ালে স্থাপিত ছিল বলে মনে করা হয়। সমস্ত ইট জ্যামিতিক নকশায় নির্মিত হয়েছে। পদ্ম, শঙ্খলতা, আরশিলতা, ঘণ্টা ও বেলমটিফ সংবলিত প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইটগুলি ছোট সোনা মসজিদ ও দরশ বাড়ি মসজিদের ড্রামের অভ্যন্তর ভাগের যে সমস্ত অলঙ্কৃত ইট ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইটসমূহের নকশা পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, এইগুলি আবহমান বাংলাদেশের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বিলে-ঝিলে পদ্মফুল সহজলভ্য, অনুরূপ আরশিলতা ও শঙ্খলতা প্রভৃতির মটিফ। কেবল মাত্র মাহীসন্তোষে নয়, সমসাময়িক কালের বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদসহ অন্যান্য মুসলিম স্মৃতিসৌধেও ঐ মটিফের বহুল ব্যবহার রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদে ব্যবহৃত পোড়ামাটির

মাহীসন্তোষের বারবাকাবাদ টাঁকশাল থেকে উৎকীর্ণ ও প্রাপ্ত মুদ্রার সারণি:

সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ (৮৬৪-৮৭৯ হিজরি/১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.)

ক্রমিক নং	ক্যাটালগ নং	টাকশাল	তারিখ	উপাদান	পরিমাপ ও ওজন	মুখদিক	পৃষ্ঠদিক
১	১১৯	বারবাকা-বাদ	৮৬৪ হিজরি (১৪৫৯খ্রিঃ)	রৌপ্য	পরিঃ ১.০৮″(?) (২.৭৪ সেঃ মিঃ)	As on No. 117 but the legend ends with السلطان.	In a circle :— السلطان ابن السلطان A deep shroff-mark defaces the next line which appears to be باربک [اباد؟] on the margin :— , السلطانه , اعلی is readable.
২	১২৩	বারবাকা-বাদ (?)	৮৬৪ হিজরি (১৪৫৯খ্রিঃ)	রৌপ্য	পরিঃ ১.১০″ (?) (২.৭৯ সেঃ মিঃ)	In a plain area :— السلطان بن السلطان رکن الدنیا و الدین ابو المجاهد باربکشاه السلطان بن محمود شاه السلطان The name of the Sultan is spelt like اود	The Kalima in crude letters. Then weak short strokes which may be construed into باربک اباد Then a prominent ضرب Then. ٨٧٣
৩	১২৫	বারবাকা-বাদ (?)	৮৬৪ হিজরি (১৪৫৯খ্রিঃ)	রৌপ্য	পরিঃ ১.১০″ (?) (২.৭৯ সেঃ মিঃ)	As on No. 123	As on No. 123
৪	৭৯(জাদু-ঘর নং-০৭.৬১২)	বারবাকা-বাদ (?)	৮৭৩ হিজরি (১৪৬৮খ্রিঃ)	রৌপ্য	পরিঃ ২.৫৬সেঃ মিঃ ওজনঃ ১০-৬৪৪৯ গ্রাম	In a circle, *The Kalimah* and *Bā(r)bak 873* A deep chisel cut in between the word *'Bārbak'*. Margin- Illegible Faint traces of an outside circle, visible at one end. Ref: BMC II, Nos. 135-136, 138, p. 167; JNSI, vol. xxi, 1959, pp. 143-44; Corpus, p. 92, etc.	In a circle, ***Darb(?)*** ***Al-Sulțān al-'Ādi(l)*** ***Al-A'zam Bārbak Shāh Sulțān*** ***Ibn Mahmūd Shāh Sulțān*** ***Khallada Allāh (Mulkahu)*** **Margin-** **Illegible, probably arabesques. There is a peculiar word at the begining of the reverse legend which is read as *'Darb'* following Coin No.135 of BMC II, p. 167;**
সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্ফর শাহ (৮৯৬-৮৯৯ হিজরি/১৪৯০-১৪৯৩ খ্রি.)							
৫	১৬৩	বারবাকা-বাদ (?)	৮৯৬ . হিজরি (১৪৯০ খ্রিঃ)	রৌপ্য	পরিঃ ১.১০″ (?) (২.৭৯ সেঃ মিঃ) ওজনঃ ১৬৫ গ্রেইন (?) (৮.৮৩৮৬৪)	In an ornamented circle, the Kalima and ٨٩٢(= ٨٩٦) باربکاباد In margin divided by arabesques the names of the Four Companions.	In multifoil الدنیا شمس و الدین ابو النصر مظفر شاه السلطان خلد الله ملکه و سلطانه Pl.
সুলতান নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ্‌ (৯২৫-৯৩৯ হিজরি/১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.)							
৬	১	বারবাকা-বাদ	৯২৮ হিজরি (১৫২২খ্রিঃ)	তাম্র	পরিঃ ১.১৪″(?) (২.৯০ সেঃ মিঃ) ওজনঃ১৬৩.১ গ্রেইন (?) (৮.৭৩৬৮ গ্রাম)	In circle with loops outside السلطان بن السلطان ناصر الدنیا ، الدین ابو المظفر.	In double circle with ornaments between. نصرتشاه سلطان بن حسین شاه سلطان الحسینی خلد ملکه باربکاباد ٩٢٨
৭		বারবাকা-বাদ	৯২৮ হিজরি (১৫২২খ্রিঃ)	রৌপ্য			

ইটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। শিল্পী পোড়ামাটির ইট তৈরি করার সময়ে, এর নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই যে বাংলাদেশের প্রকৃতি থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্য মটিফগুলি গ্রহণ করেছিলেন; তা বলাই বাহুল্য। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে মাহীসন্তোষ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বেশকিছু পোড়ামাটির অলঙ্কৃত ইট সংরক্ষিত রয়েছে (দ্রষ্টব্য:চিত্র-৬)।[৫৭]

৫. বিবিধ নিদর্শন

মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কালো পাথরে খোদিত একটি প্যানেল অন্যতম। প্যানেলটি সম্পূর্ণ নয়; খণ্ডিত এই প্যানেলের দৈর্ঘ্য ৮৭.৬৩ সে. মি. এবং প্রস্থ ৫০.৮০ সে. মি.। মসজিদের জন্য ব্যবহারোপযোগী করার পূর্বে প্রস্তর অংশটি হিন্দুদের ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া যায় । কারণ প্যানেলের পশ্চাৎ ভাগে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত রয়েছে।[৬০] প্যানেলটির মধ্যভাগে আরেকটি প্যানেল খোদিত আছে, যা স্তম্ভ বিশিষ্ট খিলান নকশায় অলঙ্কৃত। এর চারদিকের অংশটি এরাবেস্ক-এর 'পামেট' নকশা দ্বারা সজ্জিত। পামেট নকশা এসেছে মূলত পারস্য গালিচার পাড়ের নকশা থেকে। এই নকশা বস্তুত খেজুর পাতার নকশা । বলা হয়ে থাকে আসিরীয়রা খেজুর গাছকে খুব পবিত্র মনে করতো–প্রাণবৃক্ষ হিসেবেও বিবেচনা করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে তার আদি ধর্মীয় অর্থ হারিয়ে ইসলামি নকশাকলা স্থান পেয়েছে যার একটি প্রতিবিম্ব আমরা মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত প্যানেলেও লক্ষ করি। অলঙ্করণ শৈলীর দিক থেকে প্যানেলটি ছোট সোনা মসজিদের প্যানেলের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬১] বর্তমানে এই প্যানেলটি বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[৬২] অপরাপর প্রত্নিদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লৌহ ধাতুতে নির্মিত একটি কামান। স্বাধীন সুলতানি আমলের এই কামান আবিষ্কারের ফলে বলা যায় যে, এই স্থানটি সামরিক দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । এম. মীর জাহান এ বিষয়ে বলেন, "This character of the place has been further corroborated by the discovery of a gun very near the central site."[৬৩] কামানটি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রয়েছে।[৬৪]

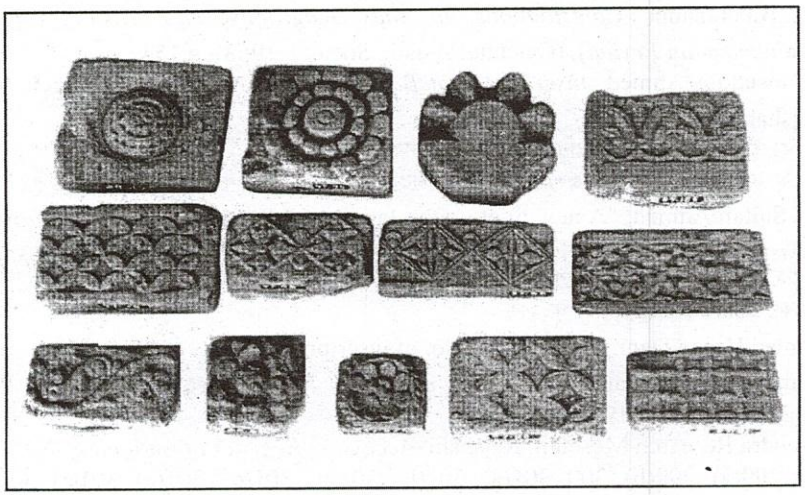

চিত্র নং ৬. মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ইট

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা দ্বিধাহীন ভাবে বলা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনে মাহীসন্তোষে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দু-একটি নিদর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে, তবে আশা করা যায় মাহীসন্তোষে ব্যাপক অনুসন্ধান ও উৎখনন করলে বাংলার মুসলিম শাসনামলের আরও অনেক প্রত্নকীর্তি পাওয়া যেতে পারে, যা হয়তো এ যাবৎ প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির পরিপূরক হতে পারে। আর এভাবেই কেবল এই অঞ্চলের নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলার লুপ্তপ্রায় ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ৮২।

২. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ২৪৬।

৩. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, "বরেন্দ্র অঞ্চলের মুদ্রা ও প্রস্তর লিপি: একটি সমীক্ষা", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগ: ইতিহাস ঐতিহ্য* (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮),পৃ. ৪৫৪।

৪. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী* (কলিকাতা: বসুমতী কার্য্যালয়, ১৩০৬),পৃ. ৮৭।

৫. A.K.M. Yaqub Ali, "Mahisantosh: An Early Muslim Settlement" *The District of Rajshahi: Its Past and Present*, edited by S.A. Akanda, Institute of Bangladesh Studies, Seminar Vol. IV, University of Rajshahi, 1983, pp. 66-67.

৬. Muhammad Abdul Bari, "The Archaeological Heritage of Rajshahi: Muslim Period", *The District of Rajshahi: Its Past and Present,* IBS Seminar Vol.IV, University of Rajshahi, 1983, p.33.

৭. Ahmad Hasan Dani, *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (Down to A.D.1538)* Pakistan, Dacca, 1957, p.23 (Nos. of inscriptions 32&33).

৮. H. Blochmann, "Geography and History of Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLIII(Pt.I) Calcutta, 1874, pp.295-96.

৯. H. Blochmann, *Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammedan Period)*, (Calcutta: Asiatic Society, 1968), p.154.

১০. Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal*, Vol.IV, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960, p.74.

১১. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ* (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৬৭।

১২. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ৮২-৮৩।

১৩. Dr. Sultan Ahmed, "A new light on the Jami Masjid of Mahisantosh", *Journal of the Pakistan Historical Society (JPHS),* Vol. XLVI, No. 2, Pakistan, 1998, p.63.

১৪. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২), পৃ. ৮৩।

১৫. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮।

১৬. Ahmad Hasan Dani, *Op.cit.* p.28 (No. of inscription 42).

১৭. Kumar Sarat Kumar Roy, *Address delivered,* Annual meeting, Varendra Research Society, Rajshahi, 1930, p.9.

১৮. Varendra Research Museum, Rajshahi, *Accession Register of Antiquities No. 1*, VRM. No. 299(a), 299(b), 300, 301(a), 301(b), 301(c), 301(d), 301(e), 301(f), 301(g) and 311.

১৯. এ. বি. এম. হোসেন, "মাহিসন্তোষের মুসলিম নিদর্শন", *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃ. ২৭৮।

২০ Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1961, p.10.
দীনেশচন্দ্র সেন, "কষ্টি পাথর", *সাহিত্য,* ২৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩১৯, পৃ. ৯৯৩।

২১. Mukhlesur Rahman, *Sculpture in the Varendra Research Museum A Descriptive Catalogue*, Varendra Research Museum, University of Rajshahi, 1998, p.460.

২২. মোঃ আব্দুল করিম, *মাহীসন্তোষের ইতিহাস*, রাজশাহী বার্তা, রাজশাহী, ১৯৯৬,পৃ. ৩৬, উদ্ধৃত, মানাকিব-আল-আসফিয়া (মাকতুবা-ই-সাদী),পৃ. ৩৩৯।

২৩. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২),পৃ. ৫১।

২৪. A.K.M. Yaqub Ali, "Mahisantosh: An Early Muslim Settlement", *The district of Rajshahi: Its Past and Present,* IBS Seminar Vol. IV, University of Rajshahi, 1983, p.67.

২৫. Montgomery Martin., *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, Vol.III, (Delhi: Dinajpur, Cosmo Publications,1976), p.667.

২৬. H. Blochmann, *Op.cit*, p.154.

২৭. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৯।

২৮. H. Blochmann, *Op.cit*, pp.153-54.

২৯. Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, p.179.

৩০. Dr. Sultan Ahmed, *Op.cit*, p.62.

৩১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড* (কলিকাতা: নব ভারত পাবলিশার্স, ১৩৭১,পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৪), প. ১৬৭ ; মোঃ আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪৩।

৩২. H. Blochmann, "Geography and History of Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Vol. XLIII (Pt.I), 1874, pp.282, 295; Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, p.75.

৩৩. Ahmad Hasan Dani, *Op.cit.* p.23 (No. of inscription 33).

৩৪. H. Blochmann, "Geography and History of Bengal" *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. XLII (Pt.I), 1873, pp.272-73; H. Blochmann, *Op.cit*, pp.67-70.

৩৫. H. Blochmann, *Ibid*, p.153.

৩৬. Ahmad Hasan Dani, *Op.cit*, p.23.

৩৭. Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, pp.73-74 and 90-91; H. Blochmann, *Op.cit*, pp.153-55.

৩৮. H. Blochmann, *Ibid*, p.153.

৩৯. Dr. Sultan Ahmed, *Op.cit*, p.63.

৪০. Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, p.90.

৪১. S. Sharf-ud-din, "A Note on the Arabic & Persian Inscriptions in the Society`s Museum", *Annual Report of the Varendra Research Society, 1927-28* (appendix), Rajshahi, p.I; Niradbandhu Sanyal, *List of Inscriptions in the Museum of the Varendra Research Society*, Rajshahi, May, 1928, p.18.

৪২. S. Sharf-ud-din, *Ibid,* pp.1-2.

৪৩. Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, p.179.

৪৪. Mukhlesur Rahman, *Op.cit*, Pt. No. 82,p.64, SL. No. 143 VRM. No. 314.

৪৫. Dr. Sultan Ahmed, *Op.cit*, p.63.

৪৬. Dr. Sultan Ahmed, *Ibid*, pp.61-67.

৪৭। মোঃ আব্দুল করিম, *প্রাগুক্ত,* প. ৪৪।

৪৮. Dr. Sultan Ahmed, *Op.cit*, pp.62-63.

৪৯. M. Mir Jahan, "Mint towns of Medieval Bengal", *The Proceedings of the Pakistan History Conference; Pakistan Historical Society*, 1953, pp.236-37; এ. কে. এম.ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯),প. ২৮; Shamsuddin Ahmed, *Op.cit*, p.90 ; Abdul Karim, *Corpus of the Muslim Coins of Bengal (Down to A.D. 1538)*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1960, p.162.

৫০। এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৯২),পৃ. ৮৮।

৫১. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, "বরেন্দ্র অঞ্চলের মুদ্রা ও প্রস্তর লিপি: একটি সমীক্ষা" *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগ: ইতিহাস ঐতিহ্য*, পৃ. ৪৫৪।

৫২. Muhammad Abdul Bari, *Op.cit*, p.47.

৫৩. N.K. Bhattasali, *Catalogue of Coins, collected by A.S.M. Taifoor of Kawser House, Dacca, and presented to the Dacca Museum*, Dacca 1936, p.24, Cat. No119, 123& 125.

৫৪. Pratip Kumar Mitra, "Silver Coins of Bengal Sultans in the collection of the State Archaeological Museum", *West Bengal: Pratna Samiksha*, Vol.1, 1992, *Journal of the Directorate of Archaeology,* Govt. of West Bengal, p.205, Cat. No.79.

৫৫. Pratip Kumar Mitra, *Ibid,* p.225.

৫৬. Abdul Karim, *Op.cit,* pp.122-23 ; A.W. Botham, *Catalogue of Provincial Coin Cabinet, Assam, Allahabad* (Government Press), 1930, p.172.

৫৭. Muhammad Abdul Bari, *Op.cit*, p.48.

৫৮. H. Nelson Wright, *Catalogue of the Coins in the Indian Museum*, Calcutta, Vol. II, Varanasi, Delhi 1972, p.171 ; Abdul Karim, *Op.cit,* p.107.

৫৯. Varendra Research Museum, Rajshahi, *Accession Register of Antiquities, No. 3*, VRM, No. 97.78-97.107 & 2001.16-2001.28.

৬০. Nani Gopal Majumdar, "A New type of Vishnu from North Bengal", *Monographs of the Varendra Research Museum No. 3*, Rajshahi, April 1929, p.16 ; Mukhlesur Rahman, *Op.cit*, Cat. No. 142, Pt. 81, pp.63-64 & 585.

৬১. এ. বি. এম. হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০।

৬২. Varendra Research Museum, Rajshahi, *Accession Register of Antiquities, No. 1*, VRM No. 302.

৬৩. M. Mir Jahan, *Op.cit*, p.237.

৬৪. Varendra Research Museum, Rajshahi, *Accession Register of Antiquities, No. 1*, VRM. No. 313.

পরিশিষ্ট-ক

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত মাহীসন্তোষের প্রত্ননিদর্শন (মুসলিম আমল)

পরিগ্রহণ নং	প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাপ	ব্যাপ্তিকাল
২৯৮	নকশি পাথর, স্তম্ভশীর্ষ	বালুকা প্রস্তর	৪৯.৩X৪৯.৩X১২.৫ সে. মি.	আ.১০ম শতাব্দী
২৯৯ (ক)	মিহরাবের অংশ বিশেষ	কৃষ্ণ প্রস্তর	২৬X২৪.৭X১৬.৭ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
২৯৯ (খ)	মিহরাবের অংশ বিশেষ	কৃষ্ণ প্রস্তর	২৬X২৪.৭X১৬.৭ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩০০	মিহরাব (কিছু হিন্দু দেবতা ও স্থাপত্যের ভগ্নাংশ নিয়ে এই মিহরাব তৈরি করা হয়।)	কৃষ্ণ প্রস্তর	৯০X৩৮ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩০১(ক-ছ)	মিহরাব (মিহরাবে ব্যবহৃত ভগ্নাংশগুলি ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ শিরোনামে সংরক্ষিত)	কৃষ্ণ প্রস্তর	উচচতা: ১৩৩ সে. মি. ব্যাসার্ধ: ২০৮ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩০২	নকশি পাথর (পাথরের স্লাবটি	কৃষ্ণ প্রস্তর	৮৬.৩X৫৩.৪ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী

	মূলত বিষ্ণুমূর্তির, তবে এর পশ্চাৎ ভাগে আরবীয় নকশায় অলঙ্কৃত লতাপাতা)			
৩০৩	বেড়া স্তম্ভ	বালুকা প্রস্তর	উচ্চতা: ৯৩.২ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩০৯	সর্দলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৫৬.৪X৩৩.৪X১৭.১ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী
৩১১	নকশি খিলান	বালুকা প্রস্তর	১২৮.১X৪১.২X১২.২ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩১২	প্রস্তর ফলক	বালুকা প্রস্তর	৫৭X৪১.৫X২০.৩ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩১৩	কামান	লৌহ	উচ্চতা: ১৪৪.৮ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩১৪	শিলালিপি: সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (একটি বিষ্ণুমূর্তির খোদিত পাদদেশ মসজিদে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত এটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগৃহীত।)	কৃষ্ণ প্রস্তর	৪৮.৩X২৪.১ সে. মি.	৯১২ হিজরি (১৫০৭ খ্রিস্টাব্দ)
৩১৫	প্রস্তর ফলক	বালুকা প্রস্তর	৪৭.৫X৫১X২৪ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী
৩২১	প্রস্তর ফলক	বালুকা প্রস্তর	৫৭X৪১.৫X২০.৩ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৩৪১	নকশি পাথর	বালুকা প্রস্তর	৫৩X৩২.২X১৮.৪ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৪৫৪	সর্দলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৪৯.৬X১৬.১X১৮ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী
৪৫৫	সর্দলের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৪৪.৯X১৭.৬X১৬.১ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী
৪৫৬	স্তম্ভের ভগ্নাংশ	বালুকা প্রস্তর	৬৩.৫X৪৫.৫X৪৫.৫X১৮.৯ সে. মি.	আ.১৪শ শতাব্দী
৪৬৪	মিম্বার	বালুকা প্রস্তর	৪৩.২X৪৭X৩০.৮ সে. মি.	আ.১১শ শতাব্দী
৪৮৮	স্তম্ভশীর্ষের খণ্ডিতাংশ	বালুকা প্রস্তর	৬৩.৮X৩৮X৩১.৭ সে. মি.	আ.১০ম শতাব্দী
৬৪৬	নকশি পাথর	বালুকা প্রস্তর	৬৭X৫৪X২৪ সে. মি.	আ.১০ম শতাব্দী
৩৩৫৫	চক্রাকৃতি প্রস্তরফলক	বালুকা প্রস্তর	২৩.৯X১৯X১১ সে. মি.	আ.১৮শ শতাব্দী
৩৬৩২	শেরশাহের মুদ্রা	রৌপ্য	ব্যাস: ৩ সে. মি.	৯৪৯ হিজরি (১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ)
৯৭.৭৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৮X৯X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৭৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫X৯X৪.৮ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫X৮X৩.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১১.৫X৬.৭X৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫X৬.৭X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৪X৭.৩X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫X৭.৫X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৪X৭.৫X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫X৭.৫X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৬.৫X৭.৫X২.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫.৫X৬X৩.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৮৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৪X৪.৭X৫.৭ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৩X৫.৮X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৭.৫X৮.৭X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২X৬.৫X৩.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৮.৭X৭.৫X২.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫X১৪.২X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৭X১১X৫.৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭X৫.৫X৩.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭X৫.৮X৩.৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭.৫X৭.৪X৪.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.৯৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৭.৫X৭.৫X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫X১২.৫X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী

৯৭.১০১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৫.৮X১৪.৫X৪.২ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২X১২X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৪X১০.৬X৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৬.৩X৫.২X৫.১ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	২০.৫X১৬.৫X৪.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯X৮.৫X৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
৯৭.১০৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩X১১X২ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪X১০.৮ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৪.৫X৯.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯.৫X৮ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.১৯	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২X১১.৭ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২০	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১০X৮.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২১	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১১.৫X৬.২ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২২	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯X৪.১X১০.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৩	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১২.৫X৩X৮.৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৪	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৭X৬.৭ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৫	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১০.১X৩.২X১১.৩ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৬	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.৯X১০.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৭	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	১৩.১X১০.৫ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী
২০০১.২৮	অলঙ্কৃত ইট	পোড়ামাটি	৯X৩.৩X৬.৪ সে. মি.	আ.১৩-১৪শ শতাব্দী

পরিশিষ্ট-(খ)
পাহাড়পুর জাদুঘরে রক্ষিত মাহীসন্তোষের প্রত্ননিদর্শন (মুসলিম আমল)

পরিগ্রহণ নং	প্রত্ননিদর্শনের বিবরণ	উপাদান	পরিমাপ	ব্যাপ্তিকাল
৯৭৮	নকশি পাথর	কৃষ্ণ প্রস্তর	৩৯X১৯ সে. মি.	আ.১২শ শতাব্দী
৯৯৫	শিলালিপি: সুলতান রুকনউদ্দীন বারবাক শাহ	কৃষ্ণ প্রস্তর	১১০X৪২ সে. মি.	৮৬৭ হিজরি (১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

পুঠিয়ার দোচালা মন্দির

কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*

Abstract : Among the beautiful temples erected by the Zamindars of Puthia in the district of Rajshahi, two *Dochala Mandirs* are remarkable. One of them is called *Chota Ahnik Mandir* and the other is *Bara Ahnik Mandir*. Built of brick and mortar, their facades are highly decorated with terracotta plaques. In their structure and decorative scheme the influence of Muslim architecture is specially noticed. On both sides of the main *garbha-griha* of the *Dochala* structure have been attached two *Chauchala* chambers. All these resulted in the creation of a *Trimandir* of exquisite novelty. The example of the erection of such *Trimandir* is extremely rare both in or outside Bengal. Along with genre scenes, wide use have been made of the Hindu gods and goddesses in the decorative scheme of these two temples. All these have been skilfully depicted on the red terracotta plaques with the result that the aesthetic value of these two temples has increased enormously. These two temples of Puthia command great significance in the chronology of the erection of structures with gable-roof.

ভূমিকা

বর্তমান রাজশাহী শহর থেকে আনুমানিক ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে অবস্থিত পুঠিয়া উপজেলা। মহাসড়ক হতে মাত্র এক কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে পুঠিয়া রাজবাড়ি। বৃহত্তর রাজশাহী জেলার তদানীন্তন গুটিকয়েক প্রাচীন জমিদারির মধ্যে পুঠিয়ার জমিদারি অন্যতম। মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) এ জমিদারির উদ্ভব।[১] শুধুমাত্র প্রজা শাসনই নয়, সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে স্থাপত্যের প্রতিও ছিলেন এখানকার জমিদারগণ যথেষ্ট অনুরাগী। পুঠিয়ায় নির্মিত প্রাসাদ ও মন্দিরগুলো তাঁদের সে স্থাপত্য প্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে। পুঠিয়ার জমিদারদের নির্মিত এ মন্দিরগুলোর সৌন্দর্য দর্শনের জন্যও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। অযত্ন, অবহেলায় মন্দিরগুলোর সৌন্দর্য আর আগের মতো নেই, তবুও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাও নেহায়েত কম নয়। পুঠিয়ার সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দিরগুলোর মধ্যে দুটি দোচালা মন্দির উল্লেখযোগ্য। এদের একটি ছোট আহ্নিক[২] মন্দির ও অন্যটি বড় আহ্নিক মন্দির নামে অভিহিত। ছোট আহ্নিক মন্দিরটি পাঁচআনি রাজবাড়ির পূর্বভিটায় মহারানী হেমন্তকুমারীর বাসভবন (বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস) সংলগ্ন পশ্চিম-দক্ষিণ কোণায় এবং বড় আহ্নিক মন্দিরটি চারআনি রাজবাড়ির সম্মুখে শ্যাম সরোবরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। দুটি মন্দিরই পূর্বমুখী এবং ইট ও চুন-সুরকি দ্বারা নির্মিত। অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী এ মন্দির দুটির স্থাপত্য বর্ণনা ও মূল্যায়নই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

ছোট আহ্নিক মন্দির

ভূমি নকশা ও গঠন (ভূমি নকশা ১): মন্দিরটি আয়তাকার এবং এক কক্ষ বিশিষ্ট (চিত্র ১)। বহির্ভাগ থেকে এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২৪-২″ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৬-৬″। গর্ভগৃহের আয়তন ১৬-২″ x ৮-৬″। ভূমি থেকে ছাদ

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পর্যন্ত মন্দিরটির উচ্চতা ১৭-২´। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দক্ষিণে একটি এবং পূর্বদেয়ালে তিনটি, মোট চারটি খিলানপথ রয়েছে। পূর্বদিকের তিনটি খিলানপথের মধ্যে পাশের দুটি ছোট (১-৯´ x ৬-০´) এবং মধ্যেরটি বড় (২-৪´ x ৩-০´)। খিলান স্তম্ভ দুটি মজবুত ও খর্বাকৃতির। সবকটি প্রবেশপথের খিলান একটি আয়তাকার কাঠামোর (frame) মধ্যে অর্ধবৃত্তাকার ও সামান্য সুচালোভাবে নির্মিত। পূর্বদিক বা মূল গৃহমুখের (facade) তিনটি প্রবেশপথের উপরে শাল কাঠের সর্দল (লিন্টেল) ব্যবহার করা হয়েছে। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে উত্তর দেয়ালগাত্রে দুটি এবং দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথের পশ্চিম পাশে একটি, মোট তিনটি কুলঙ্গি রয়েছে। মন্দিরটির মেঝে পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এবং উপরিভাগ বাংলার অতি পরিচিত কুঁড়েঘরের ন্যায় কুজাকৃতির দোচালা ছাদে আবৃত। ছাদের উপরে লোহার তিনটি শীর্ষদণ্ড (finial) বিদ্যমান। মন্দিরটির দেয়াল ৪´-০´´ পুরু এবং কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বক্রাকারে নির্মিত।

অলঙ্করণ: মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণটাই পলেস্তারার আস্তরণে আচ্ছাদিত। শুধু উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের শীর্ষভাগে একটি করে দুটি, পশ্চিম দেয়ালে চারটি এবং পূর্ব দেয়ালের শীর্ষভাগে একটি, মোট সাতটি স্বল্পোদ্ভূত (low relief) পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ পদ্মফুলের নকশা ছাড়া মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগে আর কোনো অলঙ্করণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে মন্দিরটির অপূর্ব অলঙ্করণ সৃষ্টি করা হয়েছে এর বহির্ভাগে ব্যবহৃত পোড়ামাটির ফলকে। মন্দিরটির বহির্ভাগের দক্ষিণ ও পূর্ব গৃহমুখ (facade) সম্পূর্ণটাই রক্তিম বর্ণের বিভিন্ন আকারের পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জিত। তাছাড়া উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালগাত্রেরও কিছু কিছু অংশে পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। পূর্ব গৃহমুখের ত্রিদ্বার খিলানপথের দুপাশে কার্নিশ থেকে নীচ পর্যন্ত উল্লম্বভাবে ছয়টি এবং উপরে কার্নিশের নিম্নভাগে বক্রাকারে একটি প্যানেল সারি বিদ্যমান। এ প্যানেল সারিতে প্যানেলের সংখ্যা এগার। এ প্যানেলগুলোর নিম্নাংশে উত্তর-দক্ষিণে লম্বাভাবে একটি রজ্জুবন্ধনী সদৃশ অলঙ্করণ এবং এর নীচের অংশ ও দুই খিলানের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ (spandrel) আরো তিনটি প্যানেলে বিভক্ত। এ প্যানেলগুলো বিভিন্ন আকারের (বর্ফি আকার, বর্গাকার, আয়তাকার ইত্যাদি) এবং এগুলো পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। পোড়ামাটির ফলকসমূহে উৎকীর্ণ হয়েছে হিন্দুদের ধর্মীয় মহাকাব্য গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতে পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য এবং বিভিন্ন প্রতিকৃতি। খর্বাকৃতির খিলান স্তম্ভগুলোও পোড়ামাটির ফলকে আচ্ছাদিত। ফলকযুক্ত প্যানেলগুলোর দুপাশের পাড়সমূহ (রেখা) প্যাঁচানো তসবি দানার সারি, ফুল ও জ্যামিতিক নকশায় শোভিত। খিলান স্তম্ভের পোড়ামাটির ফলকগুলোতে সন্ন্যাসী, রাম, লক্ষ্মণ, দুর্গা, সরস্বতী, ময়ূরে উপবিষ্ট কার্তিক, নৃত্যরত কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপ-গোপিনী, হস্তী, নৃত্যরত ময়ূর, অশ্ব, বাদ্যবাদক, গাভী দোহনের দৃশ্য, পালকি, শিশু কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পালিত মাতা যশোদা, বংশীবাদক কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা, লম্ফমান অশ্ব, ইঁদুর ইত্যাদির প্রতিকৃতি রয়েছে। কার্নিশের নীচে দুই কোণায় একটি ত্রিকোণাকার প্যানেলের মধ্যে তিনটি অশ্ব ও একটি ময়ূরের প্রতিকৃতি বিদ্যমান। ত্রিদ্বার খিলানপথের উপরের আয়তাকার অংশসমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে কৃষ্ণ লীলার উপাখ্যানজনিত ভাস্কর্য ফলকে সজ্জিত। খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) উল্লম্বভাবে ও আয়তাকার ক্ষেত্রের উপরে অনুভূমিকভাবে স্থাপিত ফলকসমূহে উৎকীর্ণ হয়েছে বৈষ্ণব নৃত্যের দৃশ্য। ত্রিদ্বার খিলানপথের উত্তরের দেয়ালের নীচের ফলকসারিতে (মেঝের সামান্য উপরে) কৃষ্ণের বিভিন্ন উপাখ্যান যেমন- কৃষ্ণের মাখন চুরি, দুধ বিক্রেতা, রাজা কংসের কুস্তিগির চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ এবং বলরামের কুস্তি লড়াই ইত্যাদির প্রতিকৃতি বিদ্যমান। খিলানপথের উত্তর দেয়ালের নিম্নভাগের ফলক সারিতে রয়েছে গোয়ালার গাভী দোহন, রাধা-কৃষ্ণ, ক্রোড়ে শিশুসহ দুই রমণী, রাখাল ও গরুর পাল, বাদক ইত্যাদির নজর কাড়া প্রতিকৃতি।

মন্দিরটির বহির্ভাগের প্রতিটি কোণ পোড়ামাটির ফলকে আচ্ছাদিত। ফলকের পাড়সমূহ ফুল ও জ্যামিতিক নকশায় শোভিত। উত্তর দেয়ালের দুই কোণায় স্থাপিত পোড়ামাটির ফলকসমূহে হনুমান, রাম, ফুল নকশা, নৃত্যরতা নারী, গরু, তীর হস্তে রাম বা লক্ষ্মণ, নৃত্যরত কৃষ্ণ-বলরাম এবং কার্নিশের নীচে দুই কোণায় রয়েছে ত্রিকোণাকার প্যানেলে বীভৎস চেহারা সংবলিত দুটি কাল্পনিক জন্তুর (রাক্ষস মুখাকৃতির) প্রতিকৃতি। পশ্চিম দেয়ালগাত্রের ফলকগুলোতে মকরের উপর দণ্ডায়মান তীর হস্তে রাম ও হনুমানের প্রতিকৃতি এবং দুই কোণার

ত্রিকোণাকার অংশে রয়েছে দুটি বীভৎস চেহারার জন্তু। দক্ষিণ গৃহমুখের খিলানপথের উপরের আয়তাকার ক্ষেত্রে ডানে রাবণের রাক্ষস বাহিনী এবং বামে রাম ও তাঁর হনুমান বাহিনীর লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ রয়েছে। এখানে মকরে দণ্ডায়মান রাম ও রাবণের প্রতিকৃতি রামায়ণের কাহিনীর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। খিলানপথের দুপাশে স্থাপিত ফলকসমূহে গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের চিত্র এবং দুই কোণার (কার্নিশের নীচে) ত্রিকোণাকার প্যানেলে উত্তরের দেয়ালগাত্রের ন্যায় দুটি বীভৎস জন্তুর প্রতিকৃতি রয়েছে। মন্দিরের খিলানসমূহের খিলানগর্ভ (intrados) সম্মুখে উপর্যুপরি উদ্‌গত হয়ে তিন ধাপে নির্মিত এবং সর্বশেষ ধাপ খাঁজ নকশা শোভিত।

বড় আহ্নিক মন্দির

ভূমি নকশা ও গঠন (ভূমি নকশা ২): পূর্বমুখী এ মন্দিরটির বহির্ভাগ হতে সামগ্রিক ভূমি নকশা আয়তাকার (চিত্র ২)। এর আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৪৮´-০´´ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৫´-০´´। মন্দিরটি মূলত তিনটি কক্ষে বিভক্ত। মধ্যস্থলে অবস্থিত আয়তাকার বিশিষ্ট দোচালা মূল গর্ভগৃহের দুপাশে দুটি ক্ষুদ্র বর্গাকার চৌচালা প্রকোষ্ঠ সংযোজিত হয়েছে। মূল গর্ভগৃহের অভ্যন্তরভাগের পরিমাপ ১৮´-২´´ x ৯´-৬´´ এবং পাশের বর্গাকার কক্ষ দুটির অন্তরস্থ প্রতি বাহুর পরিমাপ ৮´-১০´´। মূল গর্ভগৃহের উপরিভাগ দোচালা ছাদে আবৃত এবং কার্নিশ ধনুকের ন্যায় বক্রাকারে নির্মিত। কক্ষটির সম্মুখভাগ তিনটি অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলানপথের সাহায্যে উন্মুক্ত। খিলানপথত্রয় দুটি খর্বাকৃতির স্তম্ভের সাহায্যে তিনটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালগাত্রে পাশাপাশি তিনটি প্রশস্ত কুলঙ্গি রয়েছে। পাশের দুটির চেয়ে মধ্যস্থানের কুলঙ্গিটি অপেক্ষাকৃত বড়।

মূল গর্ভগৃহের দুপাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র বর্গাকার কক্ষ দুটির অন্তরস্থ উপরিভাগে পান্দানতিফ পদ্ধতিতে অর্ধগোলাকৃতির গম্বুজ নির্মিত হলেও বহির্ভাগ চৌচালা ছাদে আবৃত এবং কার্নিশ বক্রাকারে নির্মিত। গর্ভগৃহের উত্তর পাশের কক্ষটিতে প্রবেশের জন্য পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে দুটি উন্মুক্ত খিলানপথ রয়েছে। এ খিলানপথগুলোও আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে নির্মিত। তাছাড়া কক্ষটির দক্ষিণ দেয়ালে মূল গর্ভগৃহের সাথে সংযুক্ত আরেকটি উন্মুক্ত খিলানপথ রয়েছে। এ কক্ষটির অভ্যন্তরের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি (এক সারিতে), উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথের দুপাশে দুটি করে মোট সাতটি কুলঙ্গি রয়েছে।

অপরদিকে গর্ভগৃহের দক্ষিণ পাশের বর্গাকার কক্ষটির সম্মুখভাগে রয়েছে (পূর্বদেয়াল) একটি খিলানপথ। তাছাড়া উত্তর পাশের কক্ষটির ন্যায় এ কক্ষেরও উত্তর দেয়ালের মধ্যস্থলে একটি উন্মুক্ত খিলানপথ নির্মাণ করে গর্ভগৃহের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। কক্ষটির অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে এবং উত্তর দেয়ালের প্রবেশপথের দুপাশে দুটি করে মোট আটটি কুলঙ্গি রয়েছে। সমগ্র মন্দিরটির সম্মুখভাগে একটি অসম আয়তাকার বিশিষ্ট (১০´-৬´´ x ৩৬´-৪´´) প্রশস্ত বারান্দা বিদ্যমান। এ মন্দিরের কার্নিশও বক্রাকারে নির্মিত।

অলঙ্করণ: মন্দিরটির অলঙ্করণের অধিকাংশই ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। অভ্যন্তরভাগের পলেস্তারার আস্তরণ খুলে পড়ছে। তবে মূল গর্ভগৃহের ভিতরে সংযোজিত পার্শ্বস্থ দুই বর্গাকার কক্ষের খিলানপথের উপরিভাগ যে এক সময়ে পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত ছিল, তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। মূল গর্ভগৃহের অভ্যন্তরভাগের দেয়ালগাত্র কতকগুলো উল্লম্ব ও অনুভূমিক প্যানেলে বিভক্ত ছিল। তবে প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরভাগে পলেস্তারার আচ্ছাদন ছাড়া আর কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

মন্দিরটির অপূর্ব অলঙ্করণ সৃষ্টি করা হয়েছে এর বহির্গাত্রের গৃহমুখে (পূর্বদেয়াল)। ছাদের বক্রাকার কার্নিশ হতে দেয়াল ও খর্বাকৃতি স্তম্ভের নিম্নাংশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান হিন্দু ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনী ও জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি সংবলিত লাল রঙের পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। দুর্ভাগ্যবশত এসব পোড়ামাটির ফলকের চিত্রসমূহের অধিকাংশই বর্তমানে ভেঙে যাওয়ায় এবং অনেক ফলক খসে পড়ায় চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু নির্ণয় করা অতীব দুরূহ হলেও সেগুলো যে হিন্দুদের দেব-দেবী সম্পর্কিত ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে খিলান স্তম্ভ ও বর্গাকার কক্ষের খিলানপথের উপরিভাগে (কার্নিশ পর্যন্ত) স্থাপিত ফলকগুলো সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে অর্ধভগ্নাবস্থায় যেটুকু পোড়ামাটির ফলক দেয়ালগাত্রে এখনো বর্তমান আছে তাতে দেখা যায় যে, মন্দিরের

উত্তরের বর্গাকার কক্ষের সম্মুখস্থ (পূর্বদেয়াল) খিলানপথের দুপাশের ও উপরিভাগের বিভিন্ন আয়তাকার ও উল্লম্ব প্যানেলগুলোতে স্থাপিত ফলকসমূহে সন্ন্যাসী, পরস্পরের দিকে আগত দুগ্ধবতী গাভীর সারি, খরগোশ, ফুল, পেঁচানো লতাপাতা, নৃত্যরত কৃষ্ণ, বলরাম ও জ্যামিতিক নকসা সংবলিত প্রতিকৃতি রয়েছে। কক্ষটির উত্তর দিকের প্রবেশপথের উপরিভাগও পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত ছিল, তবে বর্তমানে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। শুধুমাত্র প্রবেশপথের দু'পাশ ও উপরিভাগের আয়তাকার প্যানেলে কিছু সারিবদ্ধাকার ফুলের নকশা সংবলিত ফলক পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটির দক্ষিণের বর্গাকার কক্ষের সম্মুখস্থ দেয়ালগাত্রও উত্তরের বর্গাকার কক্ষের ন্যায় একইভাবে অলঙ্কৃত।

মূল গর্ভগৃহের সম্মুখভাগের (facade) দেয়ালগাত্র কতকগুলো উল্লম্ব ও অনুভূমিক প্যানেলে বিভক্ত। প্রতিটি প্যানেল নকশা সংবলিত পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত। নকশায় রয়েছে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত বিভিন্ন প্রতিকৃতি। কিন্তু প্রতিকৃতিগুলোর অধিকাংশেরই মুখাবয়ব বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় সেগুলোর পরিচিতি সনাক্ত করা দুষ্কর হলেও এগুলো যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ছিল, তা বিদ্যমান ফলকগুলোর চিত্র দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। খিলানসমূহের পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমির (spandrel) মধ্যস্থলে উল্লম্বভাবে ও সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত ফলকসমূহে একই ভঙ্গিমায় বৈষ্ণব নৃত্যের দৃশ্য (প্রতিকৃতি) রয়েছে। খিলানের উপরিভাগের আয়তাকার প্যানেল সমূহে স্থাপিত ফলকগুলোর সব প্রতিকৃতিই নিশ্চিহ্ন প্রায়। তবে যেটুকু সনাক্ত করা যায়, সেগুলো হচ্ছেঃ তীরধনুক হাতে রাম-লক্ষ্মণ, লঙ্কাযুদ্ধ, ইঁদুর, নৃত্যরত রাধা-কৃষ্ণ, ফুল, রজ্জু বন্ধনী, জালি নকশা, পেঁচানো তসবি দানার সারি, রাজহংসের সারি, অশ্বারোহী, দুই কোণায় দুটি দ্রুত ধাবমান অশ্ব ইত্যাদি। মন্দিরটির চারদিকের কার্নিশের নিম্নাংশের নকশায় এক সময়ে দুই সারিতে দন্ত নকশা, ফল ও ফুলের নকশাসহ উল্টোমুখী অশ্বের প্রতিকৃতি শোভা পেত। বর্তমানে এগুলো মন্দিরটির শুধুমাত্র সম্মুখাংশে (গৃহমুখে) দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যান্য দিকেরগুলো সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাছাড়াও মন্দিরটির চার কোণ ও বহির্গাত্রের নিম্নাংশের চতুর্দিকের কিছু অংশ পোড়ামাটির ফলকে সজ্জিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। বর্তমানে ফলকগুলো না থাকলেও সেগুলো স্থাপনের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। এ মন্দিরের খিলানগুলোও পূর্বের মন্দিরের খিলানের ন্যায় নির্মিত এবং খাঁজ নকশা শোভিত।

নির্মাণকাল ও নির্মাতাঃ শিলালিপি কিংবা লিখিত কোনো নথিপত্রের অভাবে মন্দির দুটি পুঠিয়ার কোন রাজা বা রানী কর্তৃক কখন নির্মিত হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুষ্কর। তবে মন্দির দুটির অবস্থান প্রমাণ করে যে, ছোট আহ্নিক মন্দির পাঁচআনি রাজা এবং বড় আহ্নিক মন্দির চারআনি রাজা কর্তৃক নির্মিত।[১] কেননা ছোট আহ্নিক মন্দির পাঁচআনি রাজবাড়ি অর্থাৎ মহারানী হেমন্তকুমারীর বাসভবন সংলগ্ন এবং বড় আহ্নিক মন্দির চারআনি রাজবাড়ির সম্মুখে শ্যাম সরোবরের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। তবে মন্দির দুটি কোন রাজা বা রানী কর্তৃক এবং কখন নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক ও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলেও পুঠিয়া রাজবাড়ির আশেপাশে নির্মিত অন্যান্য কয়েকটি মন্দিরের নির্মাণকাল পর্যালোচনা করলে এ মন্দির দুটিরও আনুমানিক নির্মাণকাল নির্ধারণ করা সহজ হতে পারে। যেমন – মন্দির গাত্রের শিলালিপি অনুসারে পাঁচআনি রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় পুঠিয়া-আড়ানি রাস্তার পাশে নির্মিত চৌচালা ছোট শিবমন্দির ও পুঠিয়া রাজবাড়ী থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণপুর মৌজায় নির্মিত চৌচালা ছোট শিবমন্দির যথাক্রমে ১৮০৪ এবং ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। তাছাড়া পাঁচআনি রাজবাড়ির সম্মুখস্থ মাঠের উত্তর প্রান্তে নির্মিত দোলমন্দির বা দোলমঞ্চ ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পঞ্চরত্ন শিবমন্দির ১৮২৩-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। মোটকথা পুঠিয়া রাজবাড়ির আশেপাশে নির্মিত সব মন্দিরগুলোর নির্মাণকাল প্রায় কাছাকাছি অর্থাৎ সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত। তাছাড়া মন্দিরগুলো নির্মাণে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও পরিকল্পনা প্রায়ই একই ধরনের। সে হিসেবে ছোট আহ্নিক মন্দির পাঁচআনি রাজা ভুবনেন্দ্রনারায়ণ (মৃত্যু- ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে) কিংবা তৎপুত্র রাজা জগন্নারায়ণের (১৮০৬-১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে) সময়ে এবং বড় আহ্নিক মন্দির চারআনি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ (মৃত্যু-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে) কিংবা তাঁর সহধর্মিণী রানী সূর্যমণির (১৭৯৮-

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে) সময়ে নির্মিত হতে পারে বলে অনুমিত হয়। সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় মন্দির দুটি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্মিত বলে বিবেচিত হয়।

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলায় যে গুটিকয়েক মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা সবই শিখর বা রেখ রীতিতে নির্মিত। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলায় উচ্চ পদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী ও হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব মন্দির নির্মিত হয় সেগুলোর ঊর্ধ্বাংশের আকৃতি অনুসারে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত, যথা– চালা, রত্ন ও শিখর।[৪] এ তিন শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বাংলায় চালা মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক । চালার পরে রত্ন মন্দিরের স্থান। শিখর মন্দিরের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। চালা মন্দিরগুলো আবার চালার সংখ্যা অনুসারে দোচালা বা একবাংলা, জোড়বাংলা (পাশাপাশি সংযুক্ত দুটি দোচালা মন্দির), চৌচালা ও ডবল চৌচালা বা আটচালায় বিভক্ত। অনুরূপভাবে রত্ন মন্দিরও রত্নের সংখ্যা অনুযায়ী একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। আধুনিক কালেও মন্দির নির্মাণে মধ্যযুগীয় মন্দিরের এ শ্রেণীবিভাগের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তবে এ সময়ে ইউরোপীয় প্রভাবযুক্ত সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান মন্দির নামক এক শ্রেণীর মন্দির বাংলার মন্দির স্থাপত্যে নতুনভাবে সংযোজিত হয়। জন্মসূত্রেই মধ্যযুগ ও বর্তমান কালে নির্মিত বাংলার মন্দিরগুলোর গঠন-প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে কোনো না কোনো ভাবে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব নজরে পড়ে। আলোচিত পুঠিয়ার এ দোচালা মন্দির দুটিও সে ধারার ব্যতিক্রম নয়। মন্দির দুটির অবকাঠামো এবং অলঙ্করণে মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্যের বেশ কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন– বড় আহ্নিক মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের দুপাশে সংযোজিত চৌচালা কক্ষের অভ্যন্তরভাগে পান্দানতিফ পদ্ধতিতে নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজের ব্যবহার (গম্বুজের বহির্ভাগ চৌচালা ছাদে আবৃত), খিলান পরিমণ্ডিত ত্রিদ্বার পথ ও অর্ধবৃত্তাকার খিলান (খাঁজ নকশা শোভিত) নির্মাণ, বক্রাকার কার্নিশ এবং পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ অলঙ্করণের বিষয়বস্তুতে বিমূর্ত উপাদান যথা- গোলাপ, অন্যান্য ফুল, পেঁচানো লতাপাতা, তসবি দানা, বরফি নকশা, জ্যামিতিক নকশা ইত্যাদির বহুল ব্যবহার মুসলিম ধর্মীয় স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। মন্দির দুটিতে নির্মিত খিলান শ্রেণী পরিমণ্ডিত ত্রিদ্বার পথ বাংলার মুসলিম আমলের কতিপয় ইমারতেও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ সুলতানি আমলে নির্মিত গৌড়ের লট্টন মসজিদ (১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং কদমরসুল ইমারতে (১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) এ রীতির ত্রিদ্বার পথ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৫] তাছাড়া বাংলার প্রাথমিক যুগে নির্মিত ত্রিবেণীর জাফরখান গাজীর মসজিদ (১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং পরবর্তীতকালে নির্মিত গৌড়ের কদম রসুল ইমারতের খিলান স্তম্ভের ন্যায় এ মন্দির দুটিরও খিলান স্তম্ভ মজবুত ও খর্বাকৃতির। এ ধরনের স্তম্ভ প্রাক-মুসলিম বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে দেয়। খিলান শ্রেণী পরিমণ্ডিত এ ধরনের ত্রিদ্বার পথ ও খর্বাকৃতির খিলান স্তম্ভ শুধু এ মন্দির দুটিতেই নয় বরং বাংলার অন্যান্য জমিদারদের নির্মিত বহু মন্দিরে দৃষ্টিগোচর হয়।

বাঁশ, মাটি ও খড়ের তৈরি চালা কুটিরের আদলে দোচালা ও চৌচালা নির্মাণরীতি বাংলার নিজস্ব বিশেষত্ব। বাংলায় দোচালা মন্দিরকে 'এক বাংলা' মন্দির বলেও অভিহিত করা হয়। এ ধরনের মন্দির বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়াও পশ্চিম বাংলার তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশেই এর জনপ্রিয়তা বেশি। পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে ও তার আশেপাশে মাত্র পাঁচটি এ ধরনের দোচালা মন্দিরের নিদর্শন রয়েছে। অথচ বিগত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত পুঠিয়ার এ আহ্নিক মন্দিরের ন্যায় দোচালা বা এক বাংলা মন্দিরের অনেক দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিদ্যমান। যেমন– যশোরের লোহাগড়ার গোবিন্দ মন্দির (১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) ও কৃষ্ণ মন্দির (১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ), ঝিনাইদহের গোপালবাড়ি মন্দির (১৭২২ খ্রিস্টাব্দ), পাবনার মেথার বাংলা মন্দির (১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ও উল্লাপাড়ার শিবমন্দির, ফরিদপুর জেলার মকসুদপুরের কালী ও মনসা মন্দির, ঢাকার পুরুয়ার এক বাংলা মন্দির ইত্যাদি এ ধরনের দোচালা মন্দিরের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।[৬] তবে পুঠিয়ার বড় আহ্নিক মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের দোচালা অবকাঠামোর দুপাশে দুটি চৌচালা বর্গাকার কক্ষ সংযোজন করে যে ত্রিমন্দির নির্মাণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত অভিনব। এরূপ ত্রিমন্দির নির্মাণের দৃষ্টান্ত একমাত্র বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার খলিয়ার রাজারাম মন্দির (অষ্টাদশ শতাব্দীর)

ব্যতীত সম্ভবত বাংলাদেশের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।[৭] এমনকি এ ধরনের ত্রিমন্দির নির্মাণের নজির বাংলার বাইরে অন্য কোথাও আছে বলেও জানা যায় না। সুতরাং বাংলার চালা মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে পুঠিয়ার বড় আহ্নিক মন্দির এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

উপসংহার

বাংলার অতিপরিচিত সাধারণ জীর্ণ কুটিরের এ চালা ও বক্রাকার রূপটি মুসলিম শাসনামলেই সর্বপ্রথম ইষ্টক নির্মিত স্থাপত্যে রূপান্তরিত হয়।[৮] বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপত্যে গম্বুজের পাশাপাশি চৌচালা খিলানছাদের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ), গৌড়ের লট্টন মসজিদ (১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ও গৌড়ের ছোটসোনা মসজিদে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)। অন্যদিকে দোচালা ইমারতের অবকাঠামো বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রথম গৃহীত হয় মোগল আমলে নির্মিত গৌড়ের ফতেহ্খানের সমাধিতে (১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ)। এরপর ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ময়মনসিংহের এগারোসিন্ধুর শাহ্ মুহাম্মদ মসজিদের প্রধান তোরণ ও ঢাকার করতলব খানের মসজিদ সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠের ছাদ ঐরূপ দোচালা পদ্ধতিতেই নির্মিত হয়েছে।[৯] মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম শাসকদের দ্বারা স্থাপত্যের এ চালা রূপটির সূত্রপাত ঘটলেও এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে বাংলার উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী ও হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মন্দির স্থাপত্যে। পুঠিয়ার আলোচিত এ মন্দির দুটিও সেই ধারা-পুষ্ট স্থাপত্যরীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তথ্যনির্দেশ

১ রাজবংশের উদ্ভব সম্পর্কে জানার জন্য দ্রষ্টব্য- কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "পুঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা: একটি পর্যালোচনা", *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, পার্ট-এ (কলা ও আইন), খণ্ড-২৫, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৯১-১০১

২ আহ্নিক শব্দের অর্থ প্রাত্যহিক। অর্থাৎ হিন্দুদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনার মন্দির 'আহ্নিক মন্দির' নামে পরিচিত।

৩ ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে এক বণ্টন নামা অনুযায়ী পুঠিয়ার জমিদারি চারটি শরিকে বিভক্ত হয়। এতে অনুপনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ সাড়ে পাঁচআনা (নিজ অংশ চারআনা এবং অন্য তিন ভ্রাতার কাছ থেকে জ্যেষ্ঠত্বের স্বরূপ প্রাপ্ত অর্ধআনা করে দেড় আনা) এবং অন্য তিন পুত্র যথা– মোদনারায়ণ, রূপেন্দ্রনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ সাড়ে তিন আনা করে বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তির এ বণ্টনে নরেন্দ্রনারায়ণের সাড়ে পাঁচ আনা এবং রূপেন্দ্রনারায়ণের সাড়ে তিন আনা অংশ পরিদৃষ্ট হলেও সাধারণ্যে এ দুটি শরিক পাঁচআনি ও চারআনি নামেই অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। সে সূত্রে নরেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ পাঁচআনি রাজা এবং রূপেন্দ্রনারায়ণের বংশধরগণ চারআনি রাজা নামে সমধিক পরিচিত। পুঠিয়ার জমিদারি পরিচালনায় এ দুটি শরিকের রাজারাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। দ্রষ্টব্য: বিমলাচরণ মৈত্রেয়, *পুঠিয়ার রাজবংশ* (কলকাতা : প্যারিস আর্ট প্রেস, ১৯৫০), পৃ. ৩০-৩১।

৪ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, "বাঙালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা" (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক), *ইতিহাস* (ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), ৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, বাং ১৩৭৯, পৃ. ৮৪।

৫ A.H. Dani. *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961). pp. 125 & 127. Figure . 47 & 50 : সুলতান আহমদ, "বাংলা স্থাপত্যের ধারাবাহিকতা: পুঠিয়া মন্দিরের দৃষ্টান্ত," *ইতিহাস (*ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), ষড়বিংশতিবর্ষ, ১ম, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাং ১৩৯৯, পৃ. ৪৩।

৬ রতনলাল চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের মন্দির* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪৫ ও ৪৮।

৭ তদেব, পৃ. ৩৯: ডেভিড ম্যাকাচ্চন, "পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির", *ইতিহাস (ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা)*, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, বাং ১৩৭৫, পৃ. ২৪৫।

৮ A.H. Dani. *op.cit.*. p. 13; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব", *গবেষণা পত্রিকা (*কলা অনুষদ), তৃতীয় সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১৭৬।

৯ A.H. Dani. *op.cit.*. p. 181.

ভূমি নকশা ঃ ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া

ভূমি নকশা ঃ বড় আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া

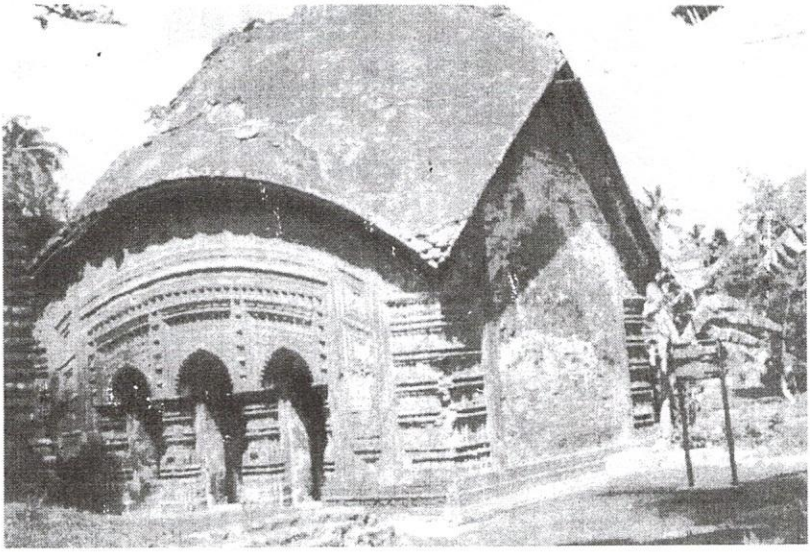

চিত্র ১
ছোট আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া

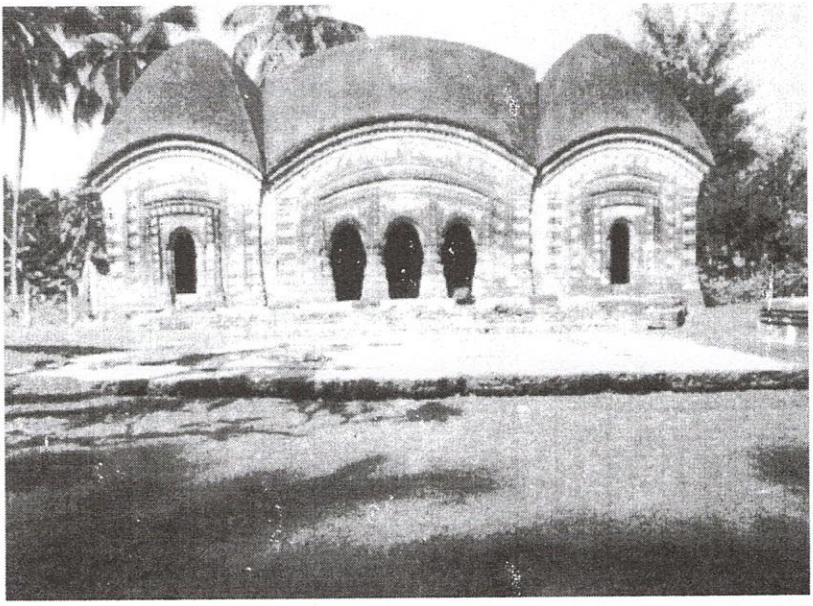

চিত্র ২
বড় আহ্নিক মন্দির, পুঠিয়া

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুম*

Abstract:Being inspired by the partition of Bengal in 1905 and by some positive steps by the British Government the Muslim community of the then Eastern Bengal and Assam province became successful as a being some remarkable socio-political and economic development. But the annulment of partition of Bengal frustated a lot within the Muslim community that took them against their pro-British stand developing the anti-British movement. In this context the British attempted to asssuage the frustration of the Muslim taking education as the principle tool and from that point of view they declared the establishment of Dhaka University in 1912. The paper attempts to describe briefly the background of the annulment of partition of Bengal, its impacts on Muslim society and the establishment of Dhaka University.

ভূমিকা

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলিম প্রতিক্রিয়া ও এ প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে নবগঠিত 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সচেতনতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা এবং ব্রিটিশ সরকারের কিছু ইতবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম সমাজ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ সরকারের সহযোগিতার ফলে মুসলমান সমাজে রাজভক্ত নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্তে এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী কালে মুসলমান নেতৃত্বকে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে রাজভক্ত নীতি থেকে সরিয়ে নিয়ে আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমন ও তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য শিক্ষাকেই উন্নতির প্রধান সোপান হিসেবে বিবেচনা করেন এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯১২ সালে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। এ প্রবন্ধে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বঙ্গভঙ্গ রদের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে এতদঞ্চলের মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ ও এর রদের প্রেক্ষাপট

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ভারতের বড়লাট (১৮৯৮-১৯০৫) লর্ড কার্জন (১৮৫৯ -১৯২৫) প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।[১] ভারত সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে নবগঠিত প্রদেশ সম্পর্কে বলা হয় :

---

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

> চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ, মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসাম প্রদেশ নিয়া একটি লেফটেন্যান্ট গভর্ণর শাসিত প্রদেশ গঠিত হইবে। নতুন প্রদেশের নাম হইবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং চট্টগ্রাম এই প্রদেশের প্রধান বন্দর নগর থাকিবে। নতুন প্রদেশের লোকসংখ্যা হইবে তিন কোটি দশ লক্ষ; ইহার মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু। ... বঙ্গদেশে থাকিবে তার পূর্বদিকস্থ বিভাগসমূহ, ছোট নাগপুরের ৫টি হিন্দী রাজ্য ছাড়া বাদবাকী অংশ, আরো থাকিবে সম্বলপুর ও ৫টি উড়িয়া রাজ্য। ... ইহার লোকসংখ্যা হইবে পাঁচকোটি চল্লিশ হাজার; ইহার মধ্যে চার কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু এবং ষাট লক্ষ মুসলমান ...।"[২]

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ বাংলা বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয় এবং স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে (১৮৫৭-১৯৩১) নবগঠিত 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। পূর্ব বাংলার অবহেলিত মুসলিম সমাজের অধিকাংশ নিজেদের উন্নতির সম্ভাবনায় এই সরকারি ঘোষণায় উল্লসিত হয়।[৩] নবাব সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫), নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ও সৈয়দ আমির হোসেনের (জ. ১৮৪৩) নেতৃত্বে এতদঞ্চলের মুসলমানেরা বাংলা বিভক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অভিনন্দন জানায়।[৪] বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ তারিখে ঢাকার নর্থব্রুক হলে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে পূর্ববাংলার মুসলমানদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নতুন প্রদেশের উন্নতি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে *Mohammadan Provincial Union* নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। উক্ত সভার শেষ পর্যায়ে সভাপতির ভাষণে নবাব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন: 'নতুন সরকার মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনায় প্রস্তুত; নতুন প্রদেশ জনগণের অগ্রগতি সাধনে উদ্দীপনার মশাল নিয়ে দণ্ডায়মান; এই নিরিখে, আমি আশা করি, এ মর্মে আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, লর্ড কার্জন আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।'[৫] বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে সলিমুল্লাহ অন্যত্র একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের উন্নতির পর্যাপ্ত সম্ভাবনা আছে। জনসাধারণ ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জন্য বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করা হয়েছে। এই প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; এই কারণে তারা সরকারের নিকট থেকে বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে।[৬]

বাংলা বিভক্তির পক্ষে মুসলিম সমাজের সক্রিয় সমর্থন ও তাদের মধ্যে নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করলেও বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। হিন্দু সমাজের অধিকাংশই বাংলা বিভাগের পরিকল্পনার শুরু থেকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং পরে বঙ্গবিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হলে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁরা একে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আঘাত বলে বর্ণনা করেন।[৭] বঙ্গভঙ্গ বিরোধী হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫)। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯৩৫), স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫৯) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৮]

সুরেন্দনাথ ব্যানার্জী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে থাকেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। জনৈক লেখকের ভাষায়: 'The Indian National Congress was opposed to the proposal of the partiton of Bengal ever since it came to know of it.'[৯] ১৯০৫ সালে বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে গোপাল কৃষ্ণ গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫) সভাপতির ভাষণে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে সরকারের একটা 'Cruel Wrong' বলে বর্ণনা করেন।[১০] বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের দিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দুরা দেশব্যাপী 'শোক দিবস' পালন করেন।[১১] কবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রস্তাব অনুসারে ঐদিন হিন্দুগণ একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে নিজেদের অবিচ্ছিন্নতার কথা ঘোষণা করেন।[১২]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে ফলপ্রসূ চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় নেন। তাঁরা আইরিশ জাতীয়তাবাদের অনুকরণে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন ও

দেশজ দ্রব্য গ্রহণ অর্থাৎ 'স্বদেশি আন্দোলন' এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য এই আন্দোলনের সূচনা কয়েক বছর পূর্ব থেকেই হয়েছিল। তবে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে স্বদেশি আন্দোলন অনুমোদন করা হয়। অচিরেই সমগ্র দেশে বর্জন আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও তার অনুপ্রবেশ ঘটে। সকল ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত বিলেতি বস্ত্র, লবণ, চিনি, সিগারেট এবং বিলাস সামগ্রী বর্জনের মাধ্যমে একদিকে ব্রিটিশ সরকারকে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করা এবং অপরদিকে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি বিধান করে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল।[১৩] লে. গভর্নর ফুলার ছিলেন মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল।[১৪] তিনি স্বদেশি আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালান। সিরাজগঞ্জের দুটো স্কুলের ছাত্ররা স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ফুলার স্কুল দুটোর মঞ্জুরি বাতিল করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করলে ফুলার এর প্রতিবাদে ১৯০৬ সালের আগস্টে পদত্যাগ করেন।[১৫] অতঃপর লেপ্সলট হেয়ার (১৮৪৯-১৯২২) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

ফুলারের পদত্যাগকে মুসলমানেরা হিন্দুদের বিজয় বলে মনে করেন। ফলে ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।[১৬] এই সময়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ফুলারের পদত্যাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।[১৭] এভাবে একদিকে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা অন্যদিকে কংগ্রেস ও হিন্দুদের বঙ্গবিরোধী আন্দোলন– এই অবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রধান মুসলিম নেতা নবাব সলিমুল্লাহ অনুভব করেন যে, নতুন প্রদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং ব্রিটিশ সরকারের উপর শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিহত করতে হলে ভারতীয় মুসলমানদেরকে একটি রাজনৈতিক দলের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে হবে। এ প্রেক্ষিতেই সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনোত্তর রাজনৈতিক অধিবেশনে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লিগ' গঠিত হয়। ঢাকার এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৮]

এদিকে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বদেশি আন্দোলন অব্যাহত থাকার পরও ব্রিটিশ সরকার যখন বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তখন আন্দোলনকারীরা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চরমপন্থীদের পরামর্শ অনুযায়ী নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। চরমপন্থী তথা বিপ্লবীরা সারা প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু করে। প্রধানত ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে তারা গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। তন্মধ্যে কলকাতার 'যুগান্তর' (১৯০৬) ও ঢাকার 'অনুশীলন' (১৯০৫) বিশেষ প্রসিদ্ধ। ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০), পুলিন বিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯), অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫), প্রমুখের প্রচেষ্টায় এ সকল সমিতির মাধ্যমে সারা বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। সমগ্র দেশে গুপ্ত সমিতির বহু শাখা- প্রশাখা গঠিত হয়। ফলে সারা দেশে রাজনৈতিক হত্যা অহরহ চলতে থাকে। বিপ্লবীরা বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার উৎসাহদাতা পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর এ্যান্ড্রু ফ্রেজার (১৮৪৮-১৯১৮) এবং নতুন প্রদেশের গভর্নর ফুলারকেও হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য দুজন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) ও প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮) বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কিংসফোর্ডের পরিবর্তে জনৈক ইংরেজ মহিলা ব্যারিস্টার ও তার কন্যা নিহত হয়। ১১ই এপ্রিল ১৯০৮ পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করা হয়। ৯ই নভেম্বর, ১৯০৮ বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল(১৮৮৭-১৯৩৯) ব্রিটিশ পুলিশ কর্মচারী নন্দলালকে হত্যা করেন।[১৯]

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার পাশাপাশি বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতাও চালানো হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের জন্য ১৯০৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, পার্লামেন্ট সদস্য এবং নেতৃস্থানীয় বণিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির প্রয়াস পান।[২০]

বঙ্গভঙ্গ রদ

এভাবে একদিকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং অপরদিকে অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতা ও লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৮৫০-১৯৪৪) বড়লাট হওয়ার (২৩ নভেম্বর ১৯১০) পর থেকে কংগ্রেস তথা বাংলার হিন্দুগণ শেষ পর্যন্ত

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হন। অথচ ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সচিব লর্ড মর্লি (১৮৩৮-১৯২৩) হাউস-অব-কমন্সে ঘোষণা করেছিলেন: "The partition of Bengal is now a settled fact." এছাড়া ১৯১০ সালেও তিনি এ সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করেন।[২১] স্যার হেনরি বেনারম্যানের নতুন শ্রমিক সরকারও বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি করেন। কিন্তু বেনারম্যান আবার এরূপ মন্তব্যও করেন যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ কারণ থাকলে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা হতে পারে। এতে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলমান নেতাদের মনে সন্দেহ জাগে তাঁরা স্মারকলিপির মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদ হলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।[২২] তবুও পূর্ব বাংলা ও আসামের অধিবাসীগণ বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা নিশ্চিত ছিল যে, হিন্দুদের বিরোধিতার মুখেও ব্রিটিশ সরকার নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও কংগ্রেসী নেতাদের চাপের মধ্যে গোপনে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য জন জেনকিন্সের পরামর্শে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।[২৩] ফলে ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরির ভারতবর্ষ আগমন উপলক্ষে দিল্লিতে যে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, ১২ই ডিসেম্বর,১৯১১ উক্ত অনুষ্ঠানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। সম্রাট তাঁর ঘোষণায় বলেন :

> আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের জনগণের নিকট ঘোষণা করছি যে, মন্ত্রিবর্গের সুপারিশ অনুযায়ী এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের পরামর্শ মতো আমরা ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে প্রাচীন রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরের এবং তৎসঙ্গে এই স্থানান্তরের ফলশ্রুতি হিসেবে যতশীঘ্র সম্ভব বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য একটি সপরিষদ গভর্নরের পদ সৃষ্টি; বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার সন্নিহিত এলাকাসমূহের জন্য একটি সপরিষদ লে.গভর্নরের পদ সৃষ্টি এবং আসামের জন্য একটি চিফ কমিশনারের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সীমানা পুনর্বিন্যাস ও প্রশাসনিক পরিবর্তন পরে আমাদের সপরিষদ গভর্নর জেনারেল সপরিষদ ভারত সচিবের সম্মতি অনুযায়ী সময়ে ঠিক করে নেবেন। আমরা প্রবলভাবে আশা করি, এসব পরিবর্তন আমাদের প্রিয় জনগণের আরও ব্যাপক উন্নতির সূচনা করবে।[২৪]

রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ রদের এই ঘোষণায় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সরকার এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জকে অভিনন্দন জানায়।[২৫] কিন্তু বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হতাশ হয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি হয়েছিল।[২৬] নতুন প্রদেশের উন্নতির ব্যাপারে সরকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বাংলা পুনর্গঠনের ফলে মুসলমানেরা ভাবতে লাগলো যে, বঙ্গভঙ্গের পূর্বে তারা যে পশ্চাৎপদতা ও প্রশাসনিক অবহেলায় ভুগছিল আবার তাদেরকে সেই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঢাকা মুসলিম ডেপুটেশন কর্তৃক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলা হয় যে, এটা খুবই সুবিদিত যে, পূর্ববঙ্গ বিভাগপূর্ব সময় পর্যন্ত ছিল একটি অবহেলিত অঞ্চল। মুসলমানেরাই ছিল প্রধানত দুর্দশাগ্রস্ত। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কেবলমাত্র বিভাগের সময়েই পূর্ববঙ্গ ও এই এলাকার জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দেবার ক্ষেত্রে সরকার গুরুতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। স্বভাবতই মুসলমানেরা ভাবছে যে বিভাগে রদের ফলে পুরনো অবস্থা আবার ফিরে আসবে এবং তাদেরকে পুনর্বার পেছনে ঠেলে দেওয়া হবে ।[২৭] এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) রদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, বঙ্গবিভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে নতুন আশার সম্ভার নিয়ে এসেছিল। দেশ বিভাগ রদ করার চেষ্টা সে-সব আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।[২৮]

তবে বঙ্গবিভাগ রদের ঘোষণাটি যেহেতু স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখে বর্ণিত হয়েছিল, সেজন্য মুসলমানেরা এর বিরুদ্ধে কোনো চ্যালেঞ্জ বা আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস করেনি। এছাড়া 'মুসলিম লিগ' নেতাদের ভাবাদর্শ ছিল ব্রিটিশ রাজানুগত্য। সে কারণেও তাঁরা তাঁদের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেননি। মুসলমানদের মধ্যে কিছু তরুণ নেতা ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু

প্রবীণরা তা সমীচীন মনে করেননি। মুসলিম লিগের আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০-১৯৩৫) ছিলেন 'র‍্যাডিকেল' অর্থাৎ চরমপন্থী। তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য করেন:

> আমরা যদি নীরবতা পালন করি এবং নামমাত্র সরব হই, তবে আমাদের সেই নীরবতা হলো ক্রোধ এবং কষ্টের নীরবতা এবং তা বস্তুতঃ নীরব বশ্যতা স্বীকার নয়। সম্রাটের সিংহাসন এবং তাঁর প্রতনিধির প্রতি আমাদের যে আনুগত্য ঠিক ততটাই আমরা ক্ষুব্ধ সম্রাটের ঘোষণায় যে কাপুরুষোচিত পরিকল্পনা প্রকাশ পেল তার প্রতি।[২৯]

আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী দিল্লির ঘোষণা-সৃষ্ট পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ১৯১১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সর্বভারতীয় মুসলমান নেতাদের এক সভা আহ্বান করেন। তদনুসারে ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯১১ মাদ্রাজের সৈয়দ মুহম্মদের সভাপতিত্বে কলকাতায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচনায় রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের নীতি পরিবর্তন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমঝোতা করার করার জন্য কোনো কোনো নেতা জোর দাবি জানান। দীর্ঘ আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের নীতি পরিবর্তন করার সময় যদিও সমাগত, কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আরো আলোচনার মাধ্যমে নীতি পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।[৩০]

বঙ্গবিভাগের স্কিম প্রণয়ন ও নতুন প্রদেশের উন্নতি বিধানে নবাব সলিমুল্লাহর অনুরাগ ও ভূমিকা ছিল সর্বাধিক।[৩১] তাই বাংলা বিভাগের রদে তিনি খুবই মর্মাহত হন। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষোভেই তিনি পরে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছিলেন।[৩২] সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে সেজন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। তবে তিনি মুসলমানের পক্ষে ক্ষতিপূরণ দাবি ও রাজভক্তির নীতির মধ্যে সমতা রেখে চলা বিবেচনার কাজ বলে মনে করেন।[৩৩] বঙ্গভঙ্গ রদের সময় 'দিল্লি দরবার'-এ তাঁকে জি.সি. আই. ই. খেতাব প্রদান করা হয়। তিনি অবশ্য তখন ধন্যবাদসহকারে তা গ্রহণ করেন।[৩৪] কিন্তু পরবর্তী সময়ে 'a Bait, a Bribe and a Halter of disgrace round my neek' বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৫]

বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হবার পর নবাব সলিমুল্লাহ দিল্লি দরবারে উপস্থিত প্রধান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা পূর্বক ১৯১১ সালের ২০শে ডিসেম্বর মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি পত্র লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট প্রেরণ করেন।[৩৬] কিন্তু বড়লাটের পক্ষ থেকে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র এই পত্রের কোনো ফলপ্রসূ উত্তর মেলেনি।

মুসলিম স্বার্থের ব্যাপারে সরকারের এরূপ অবহেলা ও বঙ্গভঙ্গ রদ পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য *মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন বেঙ্গল*– এর অনুরোধে সলিমুল্লাহ ঢাকায় ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর উভয় বঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সভায় বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল(১৮৭২-১৯১৭), মুজিবর রহমান (১৮৭৩-১৯৪০), খাজা আতিকুল্লাহ (সলিমুল্লাহর সৎ ভাই) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সভার আলোচনায় মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের স্বার্থের প্রতি অবহেলা প্রদশন করে বঙ্গবিভাগ রদ করার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[৩৭] এই সভায় উপস্থিতি এবং গৃহীত প্রস্তাব থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কিছু মুসলমান অংশ নিলেও পরে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, কিংবা বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তাঁরাও বিচলিত হন।

বঙ্গবিভাগ রদের ফলে ভারতের অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দও সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন।[৩৮] মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১, আলীগড়) ছিলেন মুসলিম লিগের মধ্যপন্থী নেতা। তিনিও এ সময়ে চরমভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[৩৯]

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রাক্কালে বাংলার বাইরের নেতাদের মধ্যে মুসলিম লিগ সেক্রেটারি নবাব ভিকার-উল-মূলকই (১৮৪১-১৯১৭) বেশি প্রতিবাদী ছিলেন বলে মনে হয়। দিল্লির দরবার থেকে ফিরে এসে তিনি ১৯১১ সালের ২০শে ডিসেম্বর আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেটে উর্দুতে 'ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা' শীর্ষক দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এ প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ সরকারের উপর মুসলমানদের ভরসা না করে নিজ শক্তিবলে আপন

উদ্দেশ্য পূরণের পরামর্শ দেন। *পাইওনিয়ার মেইল* সহ অন্যান্য ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকাগুলো প্রবন্ধটির সমালোচনা করে। কিন্তু মুসলিম প্রেসগুলো, বিশেষত: কলকাতার *কমরেড* ও লাহোরের *জমিদার* ভিকার-উল-মূলকের প্রতি অকণ্ঠ সমর্থন জানায়। আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেটের প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, বঙ্গ বিভাগ রদ করে গভর্নমেন্ট মুসলমানদের প্রতি অসমীচীন উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, ইতিমধ্যে কিছু শিক্ষিত লোক এটা ভাবতে শুরু করেছেন যে, হিন্দু জাতি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মুসলমানদের কোনো লাভ নেই, এখন 'মুসলিম লীগ' ত্যাগ করে 'কংগ্রেসে' যোগদান করা দরকার, কারণ কংগ্রেস তো অনেক কাল আগে থেকেই আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি এ ব্যাপারে আপনাদের সাথে একমত যে, গভর্নমেন্ট এমন কাজ করেছেন, যা মুসলমানদের প্রাণে আঘাত হেনেছে। কিন্তু আমরা নিজ জাতির সত্তা বিলীন করে অন্য একটি শক্তিশালী দলের সাথে এমনি মিশে যাবো, যেমন কোনো নদী সমুদ্রে মিশে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা সত্য যে, অনেক সময়ে নৈরাশ্য মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। তিনি আরো বলেন যে, 'আমরা কংগ্রেসের সাথে মিশে যাবো'- এটা হল ঐরূপ নৈরাশ্যেরই ফল, আর এর জন্য দায়ী হলেন বর্তমান সরকার। কিন্তু আত্মহত্যার পরামর্শ কোনো সময়ে দেওয়া যায় না। তাই অবশ্যই ভাবতে হবে যে, আমাদেরকে কি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এখন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদেরকে সরকারের উপর ভরসা করার পরামর্শ দেওয়া বৃথা। আমাদের ভরসা করতে হবে বাহুবলের উপর। আমাদের সম্মানিত দেশবাসী এই নজির রেখে গেছেন, যা আমাদের সম্মুখেই রয়েছে।[৪০] বঙ্গবিভাগ রদের পর ব্রিটিশ সরকারের সাথে বা হিন্দু নেতাদের সাথে মুসলমানদের কি নীতি অবলম্বন করতে হবে–এ সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কোনো কোনো মুসলিম নেতা মনে করতেন যে, ব্রিটিশানুগত্য সত্ত্বেও যখন তাঁদের প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য নেই, সেজন্য হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে থাকাই উচিত। কিছু শিক্ষিত মুসলমান এটাও বলতে শুরু করেন যে, 'মুসলিম লিগ' ভেঙ্গে দেয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম নেতা এটাই সমীচীন মনে করলেন যে, কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের জন্য কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত হবে না। এ মতের অন্যতম বড় প্রবক্তা ছিলেন ভিকার-উল-মূলক। এছাড়া মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাগুলোও বঙ্গভঙ্গ রদের সমালোচনা করে।[৪১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যখন তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতের বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মুসলমানদের হতাশা ও ক্ষোভ প্রশমনের জন্য ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফর করেন। এ সময়ে ঢাকা মুসলিম ডেপুটেশন হার্ডিঞ্জের সাথে দেখা করেন। ডেপুটেশনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী ও এ. কে. ফজলুল হক। তাঁরা হার্ডিঞ্জকে পূর্ববাংলার শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত না করার আবেদন জানান। প্রতিনিধি দল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দেন। বড়লাট বুঝতে পারেন, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মুসলমানদের খুব ক্ষতি হয়েছে। তিনি স্বীকার করেন যে, শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতের মুসলমানরা তাদের উন্নতি করতে পারবে। মুসলমানদের ক্ষতিপূরণের জন্য হার্ডিঞ্জ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯১২ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সরকারি এক ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়।[৪২] ঢাকা সফরের পর হার্ডিঞ্জ কলকাতা যান। সেখানে রাসবিহারী ঘোষের (১৮৪৫-১৯২১) নেতৃত্বে একটি হিন্দু প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করেন। এ সময় হার্ডিঞ্জ পূর্ববাংলার মুসলমানদের ক্ষোভ, উদ্বেগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলেন :

> যখন আমি ঢাকা সফর করেছি তখন বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে চরম উদ্বেগ লক্ষ করেছি যারা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তার কারণ, তাদের ধারণা এতদিন প্রাপ্ত সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হবে এবং শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। আমি একদল মুসলিম প্রতিনিধির নিকট বলেছি যে, ভারত সরকার প্রদেশে শিক্ষার প্রসারে এত বেশি উদ্যোগী যে, যার ফলে গত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় সচিবের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হবে এবং বাংলার শিক্ষার প্রসারে বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়টিও বিবেচিত হবে।[৪৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ক্ষুব্ধ মুসলিম প্রতিনিধিদের সামনে দেওয়া হলেও এটিকে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান করার পরিকল্পনা ছিল না। রাসবিহারী ঘোষ বড়লাটের সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব বাংলার কৃষক মুসলমানদের জন্য কোনো উপকারে আসবে না– এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, "কোনো ক্রমেই এই কথা বলা যায় না যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের সমান অধিকার থাকবেথ– এটা হবে একটা শিক্ষাদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।"[৪৪] লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় আমরা বুঝতে পারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠা হবে। তবে অঘোষিত ইচ্ছাটা ছিল এই যে, এটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হবে, যেখানে মুসলমান ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার অধিক সুযোগ পাবে।[৪৫]

১৯১২ সালের ২৪ই এপ্রিল এক চিঠির মাধ্যমে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। বাংলা সরকার ১৯১২ সালের ২৭শে মে একটি প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি নিয়োগ করেন। রবার্ট নাথনের সভাপতিত্বে কমিটিতে তের জন সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে নবাব আলী চৌধুরী, নবাব সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩), আলীগড়ের মোহাম্মদ আলী, আবু নসর ওহিদ (১৮৭২-১৯৫৩) মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৩ সালে নাথন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অনেক পরিশ্রমের পর এই কমিটি যে রিপোর্ট প্রস্তুত করে তা ছিল এই অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় দলিল।[৪৬] এই রিপোর্টে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং মুসলমান গ্রাজুয়েট কর্তৃক মুসলমান 'ফেলো' নির্বাচনের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। কমিটির এই রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকারের সচিব কর্তৃক অনুমোদিত হয়।[৪৭] কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ দীর্ঘদিন স্থগিত থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার প্রভাবশালী হিন্দুদের একাংশ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাঁদের আশঙ্কা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ক্ষুণ্ন হবে। আমরা উল্লেখ করেছি, ১৯১২ সালের ড. রাসবিহারী ঘোষ বড়লাটের সাথে সাক্ষাতের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। তিনি তখন একথাও বলেন– "এটি হবে বেঙ্গলকে অভ্যন্ত রীণভাবে খণ্ডিতকরণ এবং এতে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কোনো উপকার হবে না।"[৪৮] একই সঙ্গে আশুতোষ মুখার্জী (১৮৬৪-১৯২৪), রমেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), গুরুদাস ব্যানার্জী (১৮৪৪-১৯১৮) প্রমুখ হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সমালোচনা করেন ও আপত্তি তোলেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবী এই যুক্তি দেন যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী মুসলমান কৃষক। তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। ভাইসরয় এজন্য আশুতোষকে ডেকে পাঠালে আশুতোষ হিন্দুদের জন্য চারটি প্রফেসরশিপের দাবি জানান। ভাইসরয় তা মেনে নিলে তিনি তার আপত্তি প্রত্যাহার করেন।[৪৯] কিন্তু পরবর্তীকালে আশুতোষ কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট দেওয়া প্রতিবেদনে মনে হয় না তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন করেছিলেন।[৫০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় হিন্দুরা শহরে শহরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং প্রস্তাব পাশ করে ভারত সচিব, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট প্রেরণ করেন।[৫১] ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিবাদ সভায় তাঁরা এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের একটি অপচেষ্টা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় অতি পরিষ্কারভাবেই একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে যাচ্ছে। কারণ সরকার মুসলমানদের দাবির মুখে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক সংস্থাসমূহে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এছাড়া হিন্দুরা মনে করেন যে, অবধারিতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাকে সংকুচিত করবে এবং তার প্রত্যাশিত অর্থের উপর ভাগ বসাবে। হিন্দুদের ভীতি ও সন্দেহের প্রতিফলন দেখা যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে। ১৯১২ সালের পর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কাজ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে এবং এভাবে আশুতোষ বাংলার প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে সরকারি রাজস্বের উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস

গ্রহণ করেন।[৫২] এক শ্রেণীর হিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করে এটিকে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রূপ করতেন।[৫৩] তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এসব বিতর্ক অল্পকাল পরে স্তিমিত হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ১৯১২ সালে হলেও এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকে চলে আসছিল। কারণ হিন্দু প্রভাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মুসলমানদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বিভিন্ন কারণে অসুবিধাজনক ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থায় মুসলিম প্রতিনিধি ছিল না বললেই চলে। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন তৈরির পূর্ব পর্যন্ত সেখানে কোন মুসলমান সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর থেকে দীর্ঘকাল স্বীকৃত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনো মুসলমান ফেলো হিসেবে যোগ দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে অনেক দাবির মুখে মুসলিম ফেলো নিয়োগ করলেও তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। যেমন, ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১০ জন ফেলোর মধ্যে মাত্র ৭ জন ছিলেন মুসলমান। এই সময়ের পূর্বে ছাত্রদের আবাসিক কমিটি কিংবা প্রশাসনিক কমিটিতে কোনো মুসলমান ছিলেন না।[৫৪] প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ ছাড়াও পাঠ্যসূচিতে হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব, মুসলিম ইতিহাস বিকৃতি, 'শ্রীপদ্মপ্রতীক' প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। পাঠ্য তালিকার সমালোচনায় মোহাম্মদ আজিজুল হক (১৮৯২-১৯৫৩) বলেছেন:

> বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রায়ই সংস্কৃত উদ্ধৃতি যুক্ত হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মুসলমান ছাত্ররা আর সকল বিষয়ে খুব কৃতিত্বপূর্ণ নম্বর পেয়েছে, অথচ তাদের দুর্ভাগ্য কেবল মাতৃভাষার পরীক্ষাতেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে পাঠ্য-পুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মুসলমান বর্জিত হওয়ায় মুসলমান বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকের প্রতি কিম্বা মুসলমান লেখক রচিত পুস্তকের প্রতি সহানুভূতিমূলক বিবেচনা প্রদর্শিত হয় না।[৫৫]

এসব কারণে মুসলমানরা বাংলায় একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে আলীগড় কলেজের ইংল্যান্ড প্রবাসী ছাত্রবৃন্দের এক সভায় সৈয়দ আমির আলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করে বাংলায় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন।[৫৬] মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে এ সময়ে নবাব সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত TMসর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে' মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির উপর জোর দেন। তাঁর মতে অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার অত্যাবশ্যক। শিক্ষা সম্মেলনে নবাব সলিমুল্লাহ নতুন প্রদেশে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় কলেজের চেয়েও বেশি সৃজনশীল হবে এবং এটি ভারতে এক অদ্বিতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা অধিকার করবে।[৫৭] সলিমুল্লাহর প্রস্তাবের প্রতি সকলেই সমর্থন জানালে তা বাংলার মুসলিম সমাজে সাড়া জাগায়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন।[৫৮] কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন ও এর রদের ফলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

অতএব, আমরা দেখতে পাই, ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা অপ্রত্যাশিত বা হঠাৎ করে হয়নি। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে ওই ঘোষণা এসেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্ত-বায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং ১৯১৫ সালে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। ফলে, ১৯১৬ সালে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সর্বনিম্ন খরচের সংশোধিত পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দেয়। অতঃপর বাংলা সরকার একটি সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরি করলে তা ভারত সরকার ও সচিব কর্তৃক গৃহীত হয়।[৫৯]

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে থাকায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে সরকারের সদিচ্ছার প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে, নবাব আলী চৌধুরী বিষয়টি ১৯১৭ সালের ৭ই মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে উত্থাপন করেন এবং ২০শে মার্চ তিনি সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচিরে প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন।[৬০] নবাব আলী চৌধুরীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ হতে মি. শংকরণ নায়ার বলেন, সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মি. শংকরণ নায়ারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নবাব আলী চৌধুরী আশ্বস্ত হন। ফলে, তিনি রাজকীয় আইন পরিষদে পেশকৃত প্রস্তাবটি তুলে নেন। এই আইন পরিষদের সমাপনী অধিবেশনে ১৯১৭ সালের ২৩শে এপ্রিল লর্ড চেমসফোর্ডও অতি দৃঢ়তার সংঙ্গে এই আশ্বাস দেন যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকাতে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে।[৬১]

এদিকে ১৯১৭ সালের ৬ই জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে লর্ড চেমসফোর্ড তাঁর চ্যান্সেলরের ভাষণে বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ অসুবিধা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা নিরসনের লক্ষে একটি বাস্তব ও গঠনমূলক প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করবে। অতঃপর লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.এম.ই. স্যাডলারকে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন* গঠিত হয়।[৬২] কমিশনের একমাত্র মুসলিম সদস্য ছিলেন এম.এ.ও. কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ। প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট মতামত ও পরামর্শের জন্য দেওয়া হয়।[৬৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নাথন কমিটির রিপোর্ট যথাযথভাবে পর্যালোচনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এক মূল্যবান সুপারিশ পেশ করে।[৬৪] নাথন কমিটির পেশকৃত সুপারিশের সাথে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের* এই সূত্রে মূল মতানৈক্য দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কেবলমাত্র আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে, না পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সেটা 'পাঠদান এবং উপযোজন' প্রতিষ্ঠানের মতো হবে? ভারত সরকারের অভিপ্রায় ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে পাঠদান এবং আবাসিক ধরনের। কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর অতিরিক্ত উপযোজন ক্ষমতাও চেয়েছিলেন।[৬৫]

জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন* যখন রাজশাহীতে আসে, তখন একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল তাঁদের সাথে সাক্ষাতের সময়ে এই দাবি করেন যে, পূর্ব বাংলার সমস্ত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 'সংযুক্ত' (Affiliated) থাকবে। নবাব আলী চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ব বাংলার কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সংযুক্ত থাকা উচিত, না হয় মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিতে পূর্বের মতো বাধাগ্রস্ত হবে।[৬৬] নাথন কমিটির সাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এ মত পোষণ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সরকারশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে না, বরং তা হবে স্বায়ত্তশাসিত।[৬৭] ভারত ও বাংলা সরকার এবং নাথন কমিটি এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন তা সব জাতি ও শ্রেণীর ছাত্রদের জ্ঞান আহরণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তবে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা-জ্ঞান আহরণের জন্য সেখানে একটি আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও এ বিষয়টিকে সমর্থন করে। কমিশন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করে।[৬৮] সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয় এবং ১৯২০ সালের ২৩শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট (নং XIII) পাশ হয়। এভাবে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলার মুসলিম সমাজ তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সক্ষম হয় এবং ১৯২১ সালের ১লা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে ৩টি অনুষদ যথাক্রমে কলা, বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদে ১২টি বিভাগ ছিল।[৬৯] এই সকল বিভাগে প্রথমে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। এদের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল ১৭৮ জন।[৭০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মূহূর্তে উত্তরাধিকার সূত্রে ঢাকা কলেজের পুরাতন বিল্ডিংগুলো পায়। তাছাড়া রমনা এলাকায় অবস্থিত অধিকাংশ সরকারি বিল্ডিংও পায়। প্রায় ছয়শ' একর জমির উপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, কলা বিভাগের ছাত্রদের ক্লাসরুম ও মুসলিম ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে এখানেই করা হয়। এ সময় গভর্নর হাউজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে ব্যবহৃত হত। ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য ৩টি হলের ব্যবস্থা করা হয়, যথা ঢাকা হল, মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল।[৭১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারা মতে, ভারতের গভর্নর জেনারেল ১৯২০ সালের ১লা ডিসেম্বর ফিলিপ জোসেফ হার্টগ সি.আই.ই.-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁর এই নিয়োগ ছিল পাঁচ বছর মেয়াদের।[৭২] তিনি ডিসেম্বরের (১৯২১) প্রথম দিকে ব্রিটেন থেকে ভারতে আসেন এবং ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। ভাইস-চ্যান্সেলর ব্যতীত এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন: ১. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্ণওয়েল, ডি.পি.আই. ২. স্যার নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩), ভাইস-চ্যান্সেলর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়;[৭৩] ও ৩. নবাব শামসুল হুদা, বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভাপতি। অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর এই দায়িত্ব পালন করেন নবাবজাদা কে.এম. আফজাল খান বাহাদুর। বেঙ্গল সিভিলিয়ান অফিসার খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার হিসেবে ১৯২১ সালের ১২ এপ্রিল নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৭৪]

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা Court গঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন।[৭৫] ব্যবস্থাপনা পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯২১ সালের ১৭ই আগস্ট 'ইউনিভার্সিটি কোর্ট হাউজ' এ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান মি. নাথন এবং স্যার সলিমুল্লাহর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মুসলমানরা শিক্ষার উন্নতিতে দ্রুত এগিয়ে যাবে, সভায় চ্যান্সেলর এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[৭৬] চ্যান্সেলরের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলরও ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে পূর্ব বাংলার অনুন্নত ও অবহেলিত মুসলমানদের উন্নতির মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিজয় সূচিত হয়। পরবর্তী কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও দেশের নেতৃত্বদানে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর বৃদ্ধি লক্ষণীয়। ১৯২১-২২ সালের শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৮৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল ১৭৮ জন। এবং ১৯২৪-২৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭১ জনে উন্নীত হয়। এ সময়ে মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১৪৮১ জন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলমান ছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে পাস, অনার্স ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ১৯২২ সালে পাশকৃত মোট ২৫৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৫৩ জন ছিল মুসলমান এবং ১৯২৭ সালে উত্তীর্ণ ৩৮৭ জনের মধ্যে ১১৭ জন ছিল মুসলিম ছাত্র।[৭৮] অপরদিকে ১৯২১-২২ সালে সমগ্র বাংলার মুসলিম গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা ছিল ২৬১৫ জন এবং ১৯২৬-২৭ সালে তা ৪৩০৫ জনে বৃদ্ধি পায়।[৭৯] অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই মুসলিম গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সহজেই অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল।

উপসংহার

বঙ্গভঙ্গের পর ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ১৯১১ সালে হিন্দুদের আন্দোলনের মুখে তা রদ করে। ফলে ব্রিটিশ সরকারের বহুল কথিত 'নিষ্পন্ন সত্য' মিথ্যায় পরিণত হয়। বৃটিশ সরকার ধারণা করেছিল যে, বঙ্গবিভাগ রদের মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ হিন্দু জনমতকে শান্ত করা যাবে। "কিন্তু এই ধারণা যে কত ভ্রমাত্মক, তাহাই যেন প্রতিপন্ন করার জন্য মাত্র এগার দিন পর ... স্বয়ং বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করে।"[৮০] বিভাগ রদ মুসলমান সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং বাংলার মুসলিম সমাজে একটা মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের সূচনা করে। এর পর থেকে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের প্রধান

রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লিগ নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। লিগের শিক্ষিত ও যুবক নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের প্রবীণ নেতাদের রাজভক্ত নীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮), ফজলে হোসেন, এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখ শিক্ষিত নেতার মুসলিম লিগে যোগদানের ফলে দলে র‍্যাডিক্যালদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এই র‍্যাডিক্যালদের উদ্যোগেই ১৯১৩ সালে লাহোর অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন দাবি মুসলিম লিগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা ও জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের ধাঁচে স্বরাজ অর্জন লিগের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে, বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানদেরকে সান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার প্রধান উপায় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। যদিও এটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম সমাজের উচ্চ শিক্ষা অর্জন ও তাদের স্বার্থের পথ সুগম হবে- সরকার এটিই আশা করেছিল।[৮১] এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান সমাজে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। বিশেষত উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবুও বঙ্গবিভাগ রদজনিত কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষোভ সঞ্চিত হয়েছিল তার বিশেষ প্রশমন হয়নি। বঙ্গবিভাগ রদছাড়াও সমসাময়িক তুরস্কের ঘটনাবলি এদেশের মুসলমানদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে, যার ফলে উপমহাদেশে বিরাট খেলাফত আন্দোলন সংঘটিত হয়। এভাবে মুসলমান ও ব্রিটিশের মধ্যে সম্পর্কের যে অবনতি শুরু হয়, তা বিশ শতকের প্রায় চল্লিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তথ্যনির্দেশ

১ তবে বহু আগে থেকেই বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে ও ১৮৭২ সালে জন ক্যাম্পবেল অভিযোগ করেন যে, এত বড় প্রদেশের শাসনভার একজনের পক্ষে বহন করা দুরূহ। এর ফলে শ্রীহট্ট, কাছার ও গোয়ালপাড়া একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। এরপরেও বাংলা প্রদেশের শাসনকার্যে অসুবিধা রয়ে যায় এবং ১৮৯২ ও '৯৬ সালে সরকারি মহল থেকে পূর্ব বাংলা ও আসামের জেলাগুলো নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের দাবি জানানো হয়। এছাড়া, বাংলা বিভাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণও কিছুটা কাজ করেছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলা প্রদেশে। এ দেশে বিশেষত বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা এই জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। লর্ড কার্জন এই নব্য জাতীয়তাবাদী শক্তির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদ দেখতে পান। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

২ Ahmed Hassan Dani, *Dacca- A Record of the Changing Fortunes* (Dacca: Mrs. S.S.Dani, 1956), p.124; A.R. Mallick, 'The Muslims and the Partition of Bengal, 1905', Mahmud Husain (ed.), *A History of Freedom Movement(1906-1936).* Vol. III(Karachi, Pakistan Historical Society, 1963), p. 13.

৩ উদ্ধৃত, *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ জুলাই, ১৯০৫।

৪ পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থেই বাংলা বিভাগের পক্ষে ছিল। কারণ, বাংলা প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতায়। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে রাজধানীর দূরত্ব বেশি থাকায় এখানকার শহর-বন্দর বিশেষত গ্রামাঞ্চলের কৃষক মুসলিম সমাজ প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার তুলনায় পিছিয়ে ছিল। বলাবাহুল্য, রাজধানী কলকাতা ছিল ইংরেজ শাসনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। বিশ শতকের গোড়ার দিকে একমাত্র কলকাতাতেই ২২টি কলেজ ও ১টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অথচ পূর্ববঙ্গে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তো ছিলই না, উপরন্তু কলেজের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। বিভিন্ন হাসপাতাল, কলকারখানা, কোর্ট-কাচারি ইত্যাদিরও বেশির ভাগ ছিল কলকাতায় এবং শিক্ষিত, অভিজাত ও জমিদার শ্রেণী কলকাতাতেই বসবাস করতেন। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার কৃষকেরা অনুপস্থিত জমিদারদের শোষণে ছিল দিশেহারা এবং শিক্ষা-দীক্ষা ছিল চরমভাবে অবহেলিত। এছাড়া এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত এবং এর অরক্ষিত নদীগুলো ছিল চোর-ডাকাতের উপদ্রবের শিকার। পূর্ববঙ্গবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার মতো ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী সে এলাকায় খুবই কম ছিল। সেজন্য পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ এ অঞ্চলের জন্য পৃথক প্রদেশের দাবি জানিয়ে আসছিল। এ ব্যাপারে নবাব সলিমুল্লাহ প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বিস্তারিত দেখুন, Sufia Ahmed, *Muslim Comymunity in Bengal 1884-1912*,(Dacca: OUP, 1974), pp. 230-250. A.R. Mallick, *op.cit.*, pp. 5-25.

৫ অপরদিকে মুসলিম নেতৃত্বের একটি অংশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খাজা আতিকুল্লাহ (সলিমুল্লাহ্‌র সৎ ভাই), ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল (১৮৭২-১৯১৭), খান বাহাদুর মুহম্মদ ইউসুফ (সভাপতি, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা কংগ্রেস ঘোষিত স্বদেশি আন্দোলনেও অংশ নেন। ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীঃ চিন্তা ও কর্ম* (১৯০৫-১৯৪৭)(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ১৪৭-১৫৬।

৬ *The Moslem Chronicle*, October 21, 1905,

৭ Nawab Salimullah, 'The New Province - its future possibilities', *The Journal* of *the Moslem Institutue*, Vol. 1, No. 4, April-June, 1907. p. 408.

৮ Abdul Hamid, *Muslim Seperatism in India : A Brief Survey 1858-1947,(*Lahore:Oxford University Press, 1967), p. 53, A.R. Mallick, *op.cit.*, pp. 14-27.

৯ J.H. Broomfield, *Elite Conflict in a Plural Society : Twentieth Century of Bengal* (California: University Of Californie Press,1968), p. 31.

১০ V.K. Saxena, *Indian Reaction to British Policies (* Delhi: 1978), p. 122.

১১ *Ibid.*

১২ 'শোক দিবস' -এর কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ

১৩ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকের বাহুতে লাল ফিতা বেঁধে 'রাখি বন্ধন উৎসব' পালন করতে হবে।

১৪ ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) উপবাসব্রত পালন করতে হবে। তবে রোগী ও অক্ষম ব্যক্তিগণ এর আওতার বাইরে থাকবে।

১৫ দোকান-পাট ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ থাকবে।

১৬ খুব সকালে বিছানা ত্যাগ করে সকলকে খালি পায়ে হেঁটে আত্মশুদ্ধির জন্য গঙ্গাস্নানে যেতে হবে। Surendra nath Benerjea, *A Nation in Making* (London: Oxford University Press),1925, pp. 17-20.

১৭ নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক*, (দ্বিতীয় প্রকাশ, কলকাতা:মিশ্র ও ঘোষ পাব., ১৯৯৬), পৃ. ২১১।

১৮ এম. এ. রহিম, আব্দুল মমিন চৌধুরী, এ.বি.এম. মাহমুদ এবং সিরাজুল ইসলাম প্রণীত *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা:নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭), পৃ. ৪০৮।

১৯ ব্যামফিল্ড ফুলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়াসী ছিলেন। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি চাকরির ক্ষেত্রে মোট আসনের ৬৬% মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধানে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পকালের মধ্যেই ঢাকা, বরিশাল, রাজশাহী প্রভৃতি শহরে 'ফুলার হোস্টেল' স্থাপিত হয়। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ই জুন, ২৯ জুলাই, ১৯০৬।

২০ *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ আগস্ট, ১৯০৬।

২১ এ প্রেক্ষিতে স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতায় হিন্দু - মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং নিরীহ মুসলমানেরা সাজাপ্রাপ্ত হয়। K.K. Aziz, *Britain and Muslim India* (London: Publishers United Ltd., 1963), p. 42.

২২ ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ও তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ফুলারের পদত্যাগের জন্য গৃহীত এক প্রস্তাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯শে আগষ্ট, ১৯০৬।

২৩ Sharifuddin Pirzada, *Foundation of Pakistan: all-India Muslim League documents* (1906-1947), Vol. - 1 (Karachi: National Pub., 1969), pp. 7-15.

২৪ মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭), পৃ. ১৮৫-১৮৬। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব* (কলিকাতা: রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৯৭১), পৃ. - ৪৮- ৬০। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতির জন্য বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Sumit Sarker, The *Swadeshi Movement in Bengal*, 1903-1908 (New Delhi: Peoples Pub. House, 1968.) হেমচন্দ্র কানুনগো, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা* (কলিকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯২৮)। অমলেশ ত্রিপাঠী, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব* (কলিকাতা, আনন্দ পাব., ১৯৮৭)।

২৫ V.K. Saxena, *op. cit.*, p. 123

২৬ K.K. Aziz, *op. cit.*, 44.

২৭ Abdu' Hamid, *op. cit.* pp. 57, 69-70.

২৮ I.H. Querishi, *The Struggle for Pakistan* (Karachi: The University Press, 1969), p. 35. Abdul Hamid. *op.cit., p.* 88.

২৯ অর্থাৎ সম্রাট বলেন :

৩০ We are pleased to announce to our people that on the advice of our ministeres and after consultation with our Governor-General-in-Council, we ahve decided upon the transfer of the seat of the Government of India, from Calcutta to the ancient Capital of Delhi, and simultaneously as a consequence of that transfer, the creation at as early a date as possible of a Governorship-in-Council for the Presidency of Bengal, of a nev Lieutenant-Governorship-in-Council administring the areas of Bihar, Chota Nagpur and Orissa, and of a Chief Commissionership of Assam, with such administrative changes and

redistribution of boundaries as our Governor-General-in-Council, with the approval of our Secretary of State for India-in-Council, may in due course determine. It is our earnest desire that these changes may conduce to the greater prosperity and happiness of our beloved people. Pattabhi Sitaramaya, *History of the Indian National Congress.* Vol. 1, (New Delhi, S. Chand & Co., 1969), p. 72.

৩১ V.K. Saxena, *op. cit.*, p. 133

৩২ নতুন প্রদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে সরকার বিশেষ মনোযোগী হয়। ফলে প্রদেশের আমদানি-রপ্তানি তথা ব্যবসা বাণিজ্যের আয় প্রথম বছরেই উনিশ লক্ষ টাকারও বেশি বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ১৯০৫-১৯০৬ সালে যে বৈদেশিক বাণিজ্য হয়, তা ছিল ১৯০১ সালের চতুর্গুণ। স্থল ও জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। Sufia Ahmed, *op.cit.*, pp. 271-76. এসব আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরাই বেশি লাভবান হয়। তবে মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। যেমন, পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা মোট ৩,৬৪,৭৯১ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৩৩,৩০২ জনে উন্নীত হয়েছিল। এই বৃদ্ধির হার হিন্দুদের তুলনায় ছিল এক থেকে দেড় গুণ বেশি। *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam.* 1906-07 to 1911-12, Vol. II, pp. 8, 92. এছাড়া নব প্রদেশের মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বিস্তারিত দেখুন, M.K.U. Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam* (IBS Rajshahi: 1981). Richard Poul Cronin, *British Policy and Administration in Bengal* 1905-1911 (Calcutta: Firma KLM., 1977).

৩৩ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অতীত ও বর্তমান', *মাহে নও*, ডিসেম্বর, ১৯৬৭, পৃ. ৯৬।

৩৪ সৈয়দ হাশিম রাজা, 'শেরে বাংলার ইন্তেকালে', *মাহে নও*, জুন, ১৯৬২, পৃ. ২।

৩৫ আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর মূল প্রতিক্রিয়া ছিল :

৩৬ If we are silent and fewer vocals, our silence is the silence of anger and sorrow and not that of acquiescence. In proportion to our devotion to the person and Throne of His Majesty is the intensity of our resentment at the cowardly device of putting the announcement in the mouth of the king-Emperor and thus muzzling us effectively. Matiur Rahman, *From Consultation to Confrontation: A Stuy of the Muslim League in British Indian Politics* (1906-1912) (London: 1970), p. 237.

৩৭ *Ibid.*

৩৮ ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সরজমিনে তদন্তের জন্য পূর্ববাংলা সফর করলে সলিমুল্লাহ তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে কার্জন নবাবের বাসভবন আহসান মঞ্জিলেই অবস্থান করেন। সে সময়ে নবাব সলিমুল্লাহ বড়লাটকে অভিনন্দন পত্র সহ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলা বিভক্তির দাবি জানান এবং কার্জন সে অনুযায়ীই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। বঙ্গবঙ্গের পর সলিমুল্লাহর উদ্যোগে *প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ* ও *মুসলিম লিগ* প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য *পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* স্থাপন করেন। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ও জনগণের সেবামূলক কাজে বহু আর্থিক অনুদান দেন। দ্রষ্টব্য, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ই জানুয়ারী ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪। মোহাম্মদ ইসমাইল সলিমাবাদী, 'নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৩৭।

৩৯ সলিমুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের পেছনে অন্য কারণও নিহিত ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। তবুও তিনি রাজভক্ত নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তখনকার লিগের শিক্ষিত যুবক নেতৃত্বের ভাবধারার সাথে রাজভক্ত নীতির সামঞ্জস্য বিধান কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেননি। এছাড়া তাঁর শারীরিক অসুস্থতাও অন্যতম কারণ ছিল। Abdul Hamid, *op. cit.*, pp. 94-95.

৪০ J. H. Broomfield, *op.cit.*, p. 63-64.

৪১ Matiur Rahman, *op.cit.*, p. 238.

৪২ Abdul Hamid, *op.cit.*, p. 92.

৪৩ দাবিগুলোর মধ্যে ছিল : বঙ্গ প্রেসিডেন্সির গভর্নরের কলকাতা ও ঢাকা– উভয় রাজধানীতে সমভাবে অবস্থান করা; ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিষদসমূহে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের সুযোগ; সরকারি চাকুরিতে আরো অধিক হারে মুসলমানদেরকে নিয়োগ দান; উচ্চ শিক্ষাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা; প্রদেশের একজেকিউটিভ কাউন্সিলে পালাক্রমে একজন হিন্দুর পর মুসলিম নিয়োগ; মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার; পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন; মুসলিম শিক্ষার তত্ত্বাবধানে একজন সহকারি পরিচালক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। Matiur Rahman, *op.cit.*, p. 237.

৪৪ এই সভার গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়:

৪৫ That the meeting of the Mahomedan representative of Bengal records its deep sense of regret and disappointment at the annulment of the partition of Bengal in utter disregard of Mahomedan feeling ...;

৪৬ That as the interest of the Mahomedans are likely to be seriously affected by the said announcement this meeting express see the hope that ... the governor general would give the Mahomedans ... an opportunity of waiting upon him with a deputation to lay their view as to how their interest may be safguarded.

৪৭ That in the redistribution of boundaries ... include the district of Sylhet in the residency of Bengal having regard to the fact that its language and system of landtenure are similar to these in other districts of Bengal.

৪৮ That in view of the recent administrative changes it is desirable that one strong representative association for the Whole of Bengal be established ... with head quarters at Calcutta....*The Mussalman*, January 12, 1912.

৪৯ তবে মুসলিম লিগ সভাপতি আগা খান (১৮৭৭-১৯৫৭) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি ভারতের যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু ছিল তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য অগ্রগামী ছিলেন। যেসব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের দাবি-দাওয়াকে সর্বদা তিনি গৌণ হিসেবে দেখেছেন। প্রধানত তাঁর অনীহার কারণেই সিমলা ডেপুটেশনে (১৯০৬) বঙ্গভঙ্গকে স্থায়ীকরণের দাবিটি স্থান পায়নি। তাই বঙ্গভঙ্গ রদে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। পাশাপাশি আগা খান ছিলেন ব্রিটিশ রাজানুগত। এজন্য পরে ১৯১৩ সালে মুসলিম লিগের অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ও রাজভক্ত নীতি পরিহার করা হলে তিনি লিগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন এবং দলকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। আব্দুল ওয়াহেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান*, (তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৩), পৃ. ৬৮-৬৯।

৫০ তিনি বলেন: 'Agitation is acknowledged by the government to be the only effective method of converting them; We trust the Mussalmans, who are by tradition a proselytizing community . will preach this doctrine on the roadside and in the market - place till His Excellency and his colleagues are converted.' *The Comrade*, February 3, 1912.

৫১ মুহম্মদ আব্দুল্লাহ, *নওয়াব সলিমুল্লাহ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬), পৃ. ২১৩।

৫২ এই প্রসঙ্গে *The Mussalman* লেখে:

৫৩ Those of co-religionists who were under the impression that the government were on their side and they could depend upon government patronage ... we think now disillussioned and have realised that the 'favourite wife' may be, and as a matter of fact, has been, divorced without even a monent's previous notice ... We however from the very begining said that the motive that led to the partition was entirely different and that concession the Muslims were said to be enjoying were not for any special love for them but for dissuading them from anything embarassion to the government .... What the position of the Indian Muslims is has now been quite clear to everybody. Self-help should henceforth be their motto.... Unity between diferent sections of the Indian community should also be our watchword. *The Mussalman*, January 19, 1912.

৫৪ *Calcutta University Commission Report*, 1917-19, Vol. IV, p.133.

৫৫ অর্থাৎ লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন :

৫৬ When I visited Dacca I found a widespread apprehension, particularly among the Muhammadans, who form the majority of the population, lest the attention which the partition of Bengal secured for the eastern provinces should be relaxed, and that there might be a set-back in educational progress. It was to allay this not unreasonable apprehension that I stated to a deputation of Muhammadan gentlemen that the Government of India were so much impressed with the necessity of promoting education in a province which had made such good progress during the past few years that we have decided to recommend to the Secretary of State the constitution of a university at Dacca and the appionment of a special officer for education in Eastern Bengal. *Calcutta University Commission Report*, Vol. 1, p. 151. *Report of the Moslem Education Advisory Committee* (Momen Committee Report, 1931-34), p. 16,17.

৫৭ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ঐ।

৫৮ ইমরান হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৫। জাহেদা আহমদ, 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা', সিরাজুল ইসলাম(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ১১৫।

৫৯ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, অনুবাদ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯), পৃ. ৭৫।

৬০ নাথন কমিটির কিছু রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ:

৬১ The University of Dacca should be a state University maintained by the Government and staffed by Government officers. The Director of the Public Instruction would be the official visitor, with full powers to inspect all colleges and departments.

৬২ The University of Dacca should be unitary teaching and residential University. The college was to be a unit of University life combinding teaching and residential hostel for students. ...

৬৩ There should be the Department of Arabic and Islamic Studies in the proposed University at Dacca ...

৬৪ দ্রষ্টব্য, *The Report of the Nathan Committee*, 1912.

৬৫ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত দিনের কথা' *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল, ১৯৮০, পৃ. ২৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও হিন্দুদের প্রতিবাদ এবং রাসবিহারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে এ.কে. ফজলুল হক পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,

৬৬ ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে আমরা তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে এক লিপিতে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে প্রস্তাব পেশ করলাম; বড় লাট বললেন, ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন। ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত এক ইশতেহারে এই প্রতিশ্রুতি সরকারিভাবে সমর্থিত হল। কিন্তু প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রবল উঠল। ১৯১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তার অর্থ হবে "অভ্যন্তরীণ বিভাগ"।

৬৭ সৈয়দ হাশিম রাজা, 'শেরে বাংলার ইন্তেকালে' *মাহে নও*, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৯, পৃ. ৩।

৬৮ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত দিনের কথা', *পূর্বোক্ত* পৃ. ২৯।

৬৯ ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে দেয়া গোপন প্রতিবেদনে আশুতোষ মুখার্জী জোর দিয়ে বলেন, "ঢাকাকে অবশ্যই সীমিত পরিসরে ও যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হবে। অবশ্য যদি তাকে একটি রাষ্ট্রপরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করে কৃত্রিমভাবে কলকাতার চেয়ে উচ্চ আসনে বসানোর চেষ্টা করা হয় তবে ভিন্ন কথা।" অতঃপর তিনি একটি 'অতীব গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্ন উত্থাপন করেন- "যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে কলকাতা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হবে? যদি না হয়, তাহলে কে অগ্রাধিকার পাবে? ... ঢাকার জন্য আমরা যাই করিনা কেন, বাংলায় কলকাতার স্থান সর্বাগ্রে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। কাজেই এধরণের একটি উন্নত শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়া একটি মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ হবে।" উদ্ধৃত, জাহেদা আহমদ, জাহেদা আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০।

৭০ *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pp. 130-150.

৭১ জাহেদা আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০, ১১৬।

৭২ আবুল ফজল, 'স্যার আব্দুর রহীম সম্প্রদায়', *প্রবাসী*, ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৩২, পৃ. ৫২০-৫২১।

৭৩ *Calcutta University Commission Report*, Vol. I, p. 163,164.

৭৪ মোহাম্মদ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৯৬-৯৭।

৭৫ শ্রী পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'মুসলমানের শিক্ষা', *নবনূর*, ১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১০ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৩), পৃ. ২৮২।

৭৬ Muhammad Ali, *Proceedings of Meeting at Dacca*, 30 December, 1906, pp. 10-19.

৭৭ Abdul Hamid, *op.cit.*, p. 63.

৭৮ "The cost of the reduced scheme was estimated at Rs. 1125000" For Dacca Scheme. See, Government Communique of November 26, 1917. Quoted in M.A. Rahim, *The History of the University of Dacca*, (University of Dacca, 1981), p. 10.

৭৯ যাতে তিনি বলেন, "The Eastern Bengal had been assured of a University as a 'Compensation' for the territorial readjustment, and that serious doubts were entertained when the war broke out lest the university question were indefinitely shelved or postponed." *Ibid.*

৮০ *Ibid.*, p. 11.

৮১ *Hundred years of the History of the University of Calcutta.* p. 263, Quoted in M.A. Rahim, *op.cit.*, p. 11.

৮২ বিস্তারিত দেখুন, *Calcutta University Commission Report*, Vol. I, pp. 135, 151.

৮৩ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়:

৮৪ The Commission was fully convinced in this respect, and stated : Even if the establishment of the University of Dacca had not been promised by the Government of

India, the whole policy of the University reorganisation in Bengal, which we advocate, would have led us to recommend the establishment of a University in that town either immediately or at an early date. ... The Commission also noted that, Dacca division and Tippera district supply 7097 out of total number of 27,290 students in the University of Calcutta. So Dacca is therefore, already in the centre of great student population. *Ibid.*, p.132-133.

৮৫ M.A. Rahim, *op.cit.*, p.12.

৮৬ *Ibid.*, p. 13.

৮৭ কমিশন এ মর্মে জোর দাবি উত্থাপন করে বলে যে, "Without a certain degree of freedom we do not think that the University of Dacca can even become a living and healthy organisation." *Calcutta University Commission Report*, pp. 136-137.

৮৮ *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pp. 135-151.

৮৯ বিভাগগুলো হল : (১) ইংরেজি; (২) সংস্কৃত এবং বাংলা; (৩) আরবি এবং ইসলামিক স্টাডিজ; (৪) ফার্সি এবং উর্দু; (৫) ইতিহাস; (৬) অর্থনীতি এবং রাজনীতি; (৭) দর্শন; (৮) গণিত; (৯) পদার্থ বিদ্যা; (১০) রসায়ন; (১১) আইন এবং (১২) শিক্ষা। J.W. Holand, *Progress of Education in Bengal*, 1917-18 to 1921-22, Sixth Quinquennial Review, p. 11. *Dacca University Calendar*. 1921-24, p. viii.

৯০ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত দিনের কথা', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬। অন্য এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র - ছাত্রী ছিল ৮০২ জন। তার মধ্যে বি.এ. ক্লাসে ৪০০ জন, বি. এসসি. তে ১০০, এম. এ. ৯৫, এম. এসসি. তে ৩০ জন ও আইনে ১৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুসলিম ছিল ১৬২ জন অর্থ্যাৎ ২০.২০%। J.W. Holand, *Progress of Education in Bengal*, 1917-18 to 1921-22, p. 11.

৯১ J.W. Holand, *Progress of Education in Bengal*, p. 11-13.

৯২ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত দিনের কথা', পৃ. ২৩। M.A., Rahim, *op.cit.*, p. 26.

৯৩ স্যার নীলরতন সরকারের অবসর গ্রহণের পর পরবর্তী ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

৯৪ He was given a salary of RS. 800/50- 1000/-; *Education Committee Meeting*. 10 April, 1922. Resolution No.53. এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ৫৪ জন শিক্ষক (মতান্তরে ৬০ জন) অধ্যাপনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার মধ্যে আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের ৩ জন, ফার্সি ও উর্দু বিভাগের ২জন, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ১ জন, ইতিহাস বিভাগের ১ জন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ১জনসহ মোট ৮ জন ছিলেন মুসলমান শিক্ষক। কয়েকজন ইউরোপীয় ছাড়া বাকীরা ছিলেন সবাই হিন্দু। দ্রষ্টব্য, *Dacca University Calendar and Annual Report*, 1921-24.

৯৫ J.W. Holand, *Progress of Education in Bengal*, p. 12. এর মধ্যে ৪০ জন ছিলেন মুসলমান সদস্য। জাহেদা আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬।

৯৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মুসলিম হলের কথা উল্লেখ করে তিনি সেদিন বলেন, "In the Muslim Hall, under the guidance of an able and sympathetic Muhammadan gentleman of Bengal, Mr. A.F. Rahman, the community possesses the seed from which will surely spring a vigorous and a spreading tree." *Chancellor's Address at the First Court Meeting*, 17 August, 1921, Quoted in M.A. Rahim, *op.cit.*, p. 36.

৯৭ *Vice Chancellor's Address at the First Meeting of the Court*, 17 August, 1921, M.A. Rahim, p. 36-37.

৯৮ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত দিনের কথা', *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬।

৯৯ P. Hardy, *The Muslims of British India* (London, Cambridge University Press, 1972), p. 205.

১০০ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম*, পৃ. ১৮৩।

১০১ এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলা সরকারের নিকট চিঠিতে নির্দেশও ছিল যে,

১০২ ... the desirability of making accessible to the Mussalmans of Eastern Bengal a University in which they could have a voice (there being only six muslim members on the Calcutta University Senate out of a total of 100, excluding ex- officio members).

১০৩ *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pp. 122-123.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি: জাসদের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার*

Abstract: Jatiya Samajtantric Dal (JSD), the first political party emerged in independent Bangladesh. The activities of the JSD seriously influenced the then newly formed Awami League (AL) government and the politics of Bangladesh. Though the JSD made its appearance as an opposition of the government, this organization was formed mainly by a break away group of young workers and activists of the ruling party. Now JSD is a less important factor in the politics of Bangladesh. Even JSD has now been divided into different parts. Despite all these things, it is essential to evalute the political activities and the history of JSD that was much influencial once upon a time.

ভূমিকা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি আলোচিত নাম। কারণ একদিকে জাসদ হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে গড়ে ওঠা প্রথম রাজনৈতিক দল, অন্যদিকে এ সংগঠনটির কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নবগঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের ভিতকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে, তৎকালীন সরকার ও পরবর্তী কালে বাংলাদেশের রাজনীতিকে এটা দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাসদের জন্ম ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর। সরকারবিরোধী সংগঠন হিসেবে জাসদের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল মূলত তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ হতে বেরিয়ে আসা এক ঝাঁক তরুণ ও জঙ্গি কর্মী বাহিনীর সমন্বয়ে, যাদের চেতনায় ছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' কায়েম করা। দেশ স্বাধীন হবার পর শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুনর্গঠনের জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন এবং জাসদের ভাষায় 'জনগণ তাঁকে সে সময় দিতে প্রস্তুত ছিল।[১] কিন্তু তারপরও একটি সদ্য স্বাধীন দেশে তড়িঘড়ি করে এমন একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার প্রয়োজন কেন হলো তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ জাসদ নেতৃত্বের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের এক সময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও স্নেহধন্য ছাত্রলীগ নেতৃত্বের বিদ্রোহী এক অংশের সমষ্টি হচ্ছে জাসদ, যা শেখ মুজিবের সামনেই তাঁর অস্তিত্বের প্রশ্নে বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সূচনা থেকেই জাসদের রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছিলো মূলত মুজিব সরকারের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করা এবং নিজস্ব কর্মসূচি তুলে ধরার চেয়ে অ্যাকশানধর্মী কর্মকাণ্ডেই জাসদ সংগঠকরা অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন । তার ফলে শেখ মুজিব নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে এ দলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। মুজিব বিহীন বাংলাদেশে জাসদ রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতাও যেন হারিয়ে যায় ।[২]

১৯৭২-৭৫ সময়কালে জাসদের রাজনীতিতে যে জঙ্গিভাব লক্ষ করা যায় '৭৫ পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করেই জাসদ যেন তার জঙ্গিত্ব হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জাসদের জন্ম বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয়ে, সেই আওয়ামী লীগেই আজ মীর্জা সুলতান রাজা (জাসদের এককালীন সভাপতি) মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান (আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এম.পি.), আব্দুল লতিফ মীর্জা (সাবেক এম. পি), শাজাহান খান (বর্তমান এম. পি.), আব্দুল বাতেন প্রমুখ জাসদ নেতার সমাগম ঘটে। এমনকি জাসদ সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব শেখ হাসিনা পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সুতরাং জাসদ গঠন ও জাসদ রাজনীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। জাসদ আজ

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

বহুধা বিভক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও জাসদ আজ আর কোনো ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পার করে এসে এক সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাসদ নামের রাজনৈতিক সংগঠনটির ইতিহাস ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন প্রয়োজন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে ১৯৭৬ সালে জাসদ রাজনীতির প্রাণপুরুষ কর্নেল তাহেরের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে জাসদ রাজনীতি যেন স্বাভাবিকভাবেই ছন্দ হারিয়ে ফেলেছিল। আর এ জন্য আলোচ্য প্রবন্ধে জাসদ রাজনীতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উক্ত সময়কাল পর্যন্ত বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জাসদ গঠনের পটভূমি

১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হলেও এ প্রক্রিয়া ছিল দীর্ঘদিনের। '৭০ এর দশকের শেষ দিকেই মূলত ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক বিতর্ক ও সাংগঠনিক বৈরিতার শুরু হয়। তবে ১৯৭০ সালের ১২ই অক্টোবর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় ছাত্রলীগের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক স্বপন কুমার চৌধুরীর প্রস্তাবে ৫৫-৭ ভোটে[৩] 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ'-এর প্রস্তাব পাশ হলে ছাত্রলীগে বিরোধ আরও প্রকট আকার ধারণ করে এবং সংগঠনের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীদের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ও নির্বাচনী ইশতেহারে 'সমাজতন্ত্র'কে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তারুণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং এ অংশই পরে জাসদ গঠনে সক্রিয় হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ছাত্রলীগের মধ্যে মতপার্থক্য সুস্পষ্ট রূপ নেয়। ১৯৭২ সালের ২৬শে মে এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগের তিন নেতা আ.স.ম. আব্দুর রব (ডাকসু ভিপি) শাহজাহান সিরাজ (ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক) ও শরীফ নূরুল আম্বিয়া দাবি জানান যে, 'দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা বাতিল করা হোক এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠন করা হোক জাতীয় সরকার'। কিন্তু ২৭শে মে ছাত্রলীগের অপর তিন নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী (ছাত্রলীগের সভাপতি), আব্দুল কুদ্দুস মাখন (ডাকসু জি.এস) ও ইসমত কাদির গামা পাল্টা বিবৃতিতে গণপরিষদ ও মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার দাবির বিরোধিতা করেন।[৪] কিন্তু জাতীয় বিপ্লবী সরকারের দাবি অগ্রাহ্য হলে প্রথমোক্তরা সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের শ্লোগান তোলেন, অপর দিকে শেষোক্তরা শ্লোগান তোলেন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের। এই দুই গ্রুপের মূল সংগঠক ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন যথাক্রমে সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মনি।[৫] এভাবে ছাত্রলীগ মূলত 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী' ও 'মুজিববাদী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে যায় ১৯৭২ সালের ২৯শে জুলাই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে। মুজিবপন্থীরা তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা পল্টন ময়দানে সম্মেলন আহ্বান করে। উভয় স্থানেই প্রধান অতিথি করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত হলে ছাত্রলীগ আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে যায়। ছাত্রলীগের ভাঙনের পর আব্দুল মালেক শহিদুল্লাহ ও হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বে নবগঠিত কৃষক লীগের বড় অংশ এবং মোহাম্মদ শাজাহান ও রুহুল আমীন ভূঁইয়ার নেতৃত্বে শ্রমিক লীগের এক বিরাট অংশ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রপন্থীদের সমর্থন করে। এভাবে নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে আ.স.ম. আব্দুর রব বলেন, 'আওয়ামী লীগাররা পাকিস্তানীদের চাইতে অনেক বেশি জঘন্য আর দুর্নীতিবাজ।'[৬] অবশেষে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর মেজর (অব:) এম.এ. জলিল ও আ.স.ম.আব্দুর রবকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদ। অবশ্য যতদূর জানা যায়, '১৯৬৯ সালের দিকেই সিরাজুল আলম খান পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ভেবেছিলেন,' কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বা ঐ সময়ে শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিপরীতে দলগঠন করে সুবিধা করা যাবে না বিবেচনা করে দল গঠন করা থেকে বিরত থাকেন।[৭] যাহোক, ১৯৭২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর জাসদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল 'জয় বাংলা'[৮] যা পরবর্তীতে আর জাসদ অনুসরণ করেনি।

জাসদ গঠন ও আওয়ামী শাসন সম্পর্কে জাসদের বক্তব্য

১৯৭২ সালে প্রচারিত জাসদ কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির এক প্রচারপত্রে বলা হয় যে,' প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তির অধিকারী বাঙালি জাতি আজ এক মহা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন।' সমগ্র বাঙালি জাতির 'বিপ্লবী চেতনা আজ সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো স্তব্ধপ্রায়'। '...ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে তা সমগ্র জাতিকে দুষ্ট রাহুর মতো গ্রাস করতে

উদ্যত'। অন্যদিকে 'মুক্তিযোদ্ধারা নির্দয়ভাবে অস্বীকৃত', সারাদেশে যুবশক্তি 'নির্যাতিত'। এ অবস্থায় '...শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে সহায়ক শক্তি হিসেবে ...জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বাংলাদেশের শোষিত বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।[৯] বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে জাসদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহবান জানিয়ে ঘোষণাপত্রে আরও যেসব বিষয় তুলে ধরা হয় সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ।

(ক) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাসদ শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ ও কৃষক শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

(খ) মুজিব সরকার হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল অর্থাৎ 'পুতুল সরকার'। জাসদ পুতুল 'মুজিব সরকারকে' উচ্ছেদ করতে চায়।

(গ) জাসদ চায় শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়তে।

(ঘ) জাসদের লড়াই 'শোষকের বিরুদ্ধে' ,'শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে' ইত্যাদি।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে জাসদ তাদের ভাষায় 'শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক জনযুদ্ধ' ঘোষণা করে এবং ৮ দফা কর্মসূচি পেশ করে,[১০] যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সফল সামাজিক বিপ্লব সংগঠনে সর্বপ্রকার সহায়তা দান, সমাজতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা, সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি মনোভাবের ভিত্তিতে মেহনতি জনতার ঐক্য গড়ে তোলা, যুদ্ধজোট বহির্ভূত স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন এবং সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনে জনমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার পন্থা অবলম্বন করা ইত্যাদি।

জাসদ প্রতিষ্ঠার মাত্র ৪ মাস ৭ দিনের মাথায় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। জাসদ নেতারা সংসদকে 'শুয়োরের খোয়ার' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে জাসদ এ নির্বাচনে অংশ নিয়ে দু'টি সংসদীয় আসন ও ৬.৫% ভোট লাভ করে। নির্বাচনী ইশতেহারে তারা 'আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, রিলিফ চুরি, স্বজনপ্রীতি ও অরাজক শাসন ব্যবস্থা' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলে যে, 'সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদেশিদের পুতুল বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা'।[১১] আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জাসদের অভিযোগসমূহের অনেক কিছুরই প্রমাণ মেলে তৎকালীন পত্রপত্রিকার দিকে আলোকপাত করলে। বিভিন্ন পত্রিকায় এ সময়ে যেসব চিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'সমগ্র বাংলাদেশে দৈনিক গড়ে ৭০ থেকে ১০০টি আদম সন্তান দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হচ্ছে'[১২] '৯ মাসে রংপুরে ৩০২টি খুন, ২২৬টি ডাকাতি'[১৩], 'দেশে গত দশ মাসে মোট ৪,২৫০টি ডাকাতি, ১৪ হাজার চুরি সংগঠিত হয়'[১৪], 'স্বাধীনতার পর হতে ১৯৭৩ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত ২০টি ব্যাংক ডাকাতি'[১৫], আওয়ামীলীগ 'দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং গণস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ১৯ জন এম.সি.এ. কে দল থেকে বহিষ্কার' করে।[১৬] এ অবস্থায় জাসদের মতে, 'দেশের শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ তথা সমগ্র শোষিত মানুষের নিজস্ব দল গঠন ছাড়া অপর কোন গত্যন্তরই রইলো না। গ্রাম গ্রামান্তর থেকেও দাবি উঠলো মেহনতি মানুষের নিজস্ব দল গড়ার...এ পটভূমিকাতেই ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা।[১৭] তবে এক্ষেত্রে অ্যাহনি মাসকার্নহাসের বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে, 'পাকিস্তানি হায়েনাদের হিংস্র থাবার চরম আক্রোশে দেশটি একটি বধ্যভূমি আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। দোকানপাটে ছিল না খাদ্য দ্রব্য কিংবা জীবন রক্ষাকারী কোনো ঔষধ। দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পাট আর চা শিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থী ফিরে আসতে শুরু করলো। তাছাড়া দেশের ভিতর প্রায় দু'কোটি লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের সকলের আশ্রয় আর খাদ্য বস্ত্রের সংস্থান ঐ মুহূর্তে জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যানবাহন, রাস্তাঘাট, ফেরি, সেতু ইত্যাদি চরমভাবে ধ্বংস করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে বিকল ও স্থবির করে দেয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রিলিফ সামগ্রী জায়গামতো পৌছানো এক অলৌকিক ব্যাপারে পরিণত হলো'। অপর দিকে দেশ স্বাধীন হবার পর 'দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে গেল। সাড়ে তিন লাখেরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে রয়ে গেল। বিভিন্ন ধরনের অভাব অনটনে মানুষ হয়ে উঠলো অতিমাত্রায় বেপরোয়া'।[১৮] এ অবস্থায় জাসদ প্রতিষ্ঠার পিছনে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা বা কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা যায় কিনা, না এর পিছনে অন্য কোন ষড়যন্ত্র জড়িত ছিল, তা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়।

জাসদ রাজনীতি ১৫ই আগস্ট '৭৫ হতে ৭ই নভেম্বর '৭৫

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে নিহত হবার মধ্য দিয়ে এদেশের রাজনীতিতে সমরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। দেশের এ পরিবর্তন সম্পর্কে জাসদের মূল্যায়নে বলা হয় যে, ''আওয়ামী লীগের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। আমরা আজ গর্বের সাথে বলতে পারি যে, সেই স্বৈরাচারী শক্তি আর কোন দিন মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারবে না এবং এ কৃতিত্ব মূলত আমাদেরই'।[১৯] কিন্তু জাসদ খন্দকার মোশতাককেও সমর্থন করেনি। যতদূর জানা যায় মোশতাক সরকারকে উৎখাত করে ''ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বামপন্থী জাসদ আর সর্বহারা পার্টি সৈন্যদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার উস্কানি দিয়ে গোপন সেল গঠন করেছিল[২০] এবং 'ক্ষমতায় আরোহণের জন্য জাসদের প্রচেষ্টাও ছিল'।[২১] কিন্তু ৩রা নভেম্বর '৭৫ খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান ঘটলে জাসদ এ অভ্যুত্থানকে 'ভারতপন্থী' ও 'আওয়ামী স্বৈরাচারের পুনরুত্থান' হিসেবে বিবেচনা করে এবং তৎপর হয় খালেদ মোশাররফের বিপক্ষে। ফলে ৬ই নভেম্বর গভীর রাতে (৭ই নভেম্বর) কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে—যার ফলে খালেদ মোশাররফ নিহত হন এবং মুক্ত হন বন্দী জিয়াউর রহমান। এ অভ্যুত্থান সম্পর্কে জাসদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বার বার 'উচ্চাভিলাষী' সেনাপতিদের অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে তারা ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। আবার একথাও বলা হয় যে, তারা (জাসদ) 'উচ্চভিলাষী খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং জিয়াকে মুক্ত করে জিয়ার হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়।[২২] এক জেনারেলকে উৎখাত করে অন্য এক জেনারেলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া কি জাসদের বিপরীতমুখী নীতি নয়? এখানে উল্লেখ্য যে, ৭ই নভেম্বর তাহেরের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও মোশতাক-ফারুক-রশিদ চক্রের সমর্থকরাও এ সুযোগ গ্রহণ করে জাসদ ও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সাথে মিশে গিয়ে অভ্যুত্থানের পক্ষে কাজ করেছিল মোশতাককে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য। যাহোক, জিয়া মুক্ত হয়েই সচেষ্ট হন নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে, অপর দিকে কর্নেল তাহের চেষ্টা করেন জিয়ার মাধ্যমে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি দাওয়া আদায় করতে।

৭ই নভেম্বর পরবর্তী ঘটনা ও জাসদ

৭ই নভেম্বর দুপুরের পরে রেডিও স্টেশনে উত্তেজিত সৈন্যদের উপস্থিতিতে জেনারেল জিয়া অনেকটা বাধ্য হয়েই তাহের উত্থাপিত ১২ দফা দাবি নামায় সই করেন।[২৩] কিন্তু রেডিও ভাষণে জিয়া ঐ ১২ দফা দাবি বেমালুম চেপে যান। এ অবস্থায় জাসদ ও কর্নেল তাহের বুঝতে পারেন যে, জিয়া আর এখন তাদের উপর ততটা নির্ভরশীল নন- তাদের নিয়ন্ত্রণেও নেই- যতটা ছিল অভ্যুত্থান পূর্ব ও অভ্যুত্থানকালীন সময়ে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় ৮ই নভেম্বর জাসদ নেতারা কারাগার হতে মুক্ত হয়েই জিয়ার বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সৈনিকদেরকে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ছত্রছায়ায় একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান এবং দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অস্ত্র জমা না দেওয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে জেনারেল জিয়ার সাথে বিপ্লবীদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়।[২৪] শোনা যায়, জিয়ার আমলে যে ২১টি ক্যু হয়েছিল[২৫] - তার কয়েকটির সাথে জাসদ জড়িত ছিল এবং জাসদ ও তার বিপ্লবী পিপলস আর্মিকে দিয়ে তিনি (কর্নেল তাহের) জিয়াকে উৎখাতের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কয়েকবার।[২৬] যাহোক, জাসদের ক্রমাগত হুমকি মোকাবেলায় জেনারেল জিয়া যশোর থেকে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডো দলকে ঢাকায় আনেন এবং সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি ও 'বেটম্যান প্রথা' বাতিল সহ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। এরপর ২৩শে নভেম্বর রাতেই রেডিও টিভিতে ঘোষণা করেন যে, 'আমরা আর কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবো না। আর কোনো রক্তপাতকেও সহ্য করা হবে না'।[২৭] এ ঘোষণার পরপরই পুলিশ আ.স.ম.আব্দুর রব, ইনু, তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফ এবং ২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস. এম.হল থেকে কর্নেল তাহেরকে গ্রেফতার করে।[২৮] এর ফলে সিপাহি বিপ্লবের কার্যত সমাপ্তি ঘটে এবং নেতৃত্বের অভাবে জাসদ এগিয়ে চলে নির্দেশনাহীন এক অজানার পথে। যাহোক, প্রায় ৭ মাস আটক রাখার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৭ই জুলাই এক সংক্ষিপ্ত বিচারে তাহেরকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়—যা কার্যকরী হয় ২১শে জুলাই।

ক্ষমতার কাছাকাছি জাসদ

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য থাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং জাসদেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানে সেনাপ্রধান জিয়া বন্দী হলে ৭ই

নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাসদ খালেদ মোশাররফকে সরিয়ে জিয়াকে মুক্ত করে এবং ক্ষমতার খুব কাছাকাছি চলে যায়। ৭ই নভেম্বর সকালে ও দুপুরের পরে জাসদের নামে প্রচারিত ২টি লিফলেটের মূল বক্তব্য ছিল যে, জাসদই মূলত ক্ষমতা দখল করেছে।[২৯] কিন্তু একথা জাসদ বুঝতে পারেনি যে, জিয়াকে মুক্ত করার সাথে সাথেই ক্ষমতা জিয়ার হাতে চলে গেছে জাসদের হাতে নয়, যেহেতু জিয়া ছিলেন সেনা প্রধান। তবে, ৭ই নভেম্বর সকাল ১১টায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার উদ্দেশ্যে জিয়া একটি সভা ডাকেন, যেখানে অন্যান্যদের পাশাপাশি কর্নেল তাহেরও উপস্থিত ছিলেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও তাহেরকে এ সভায় ডাকা হয়েছিল এজন্য যে, সিপাহি বিপ্লবের সময়ে তাঁর সমর্থকেরা সবচেয়ে বেশি তৎপর ও সোচ্চার ছিল।[৩০] সভায় কর্নেল তাহের ও জেনারেল খলিলের প্রচেষ্টাতেই বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩১] কিন্তু প্রেসিডেন্ট মনোনয়নে তাহেরের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও এ সভাতেই তাহের উত্থাপিত সৈনিক সংস্থার ১২ দফা নাকচ করা হয়। ফলে জাসদ ছিটকে পড়ে। ক্ষমতার বিপরীত মেরুতে। প্রকৃতপক্ষে জিয়াকে বিশ্বাস করাটাই ছিল জাসদের জন্য এক মারাত্মক ভুল, যে ভুলের পরিনণতিতে জাসদকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। আসলে সামরিক ক্যুদেতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না, এ সত্যটিই জাসদ নেতারা উপলব্ধি করতে পারেননি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও

জাসদ রাজনীতির প্রথম বড় ধরনের হঠকারী কার্যক্রম ছিল ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাসভবন ঘেরাও করা। আওয়ামী লীগ কর্তৃক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি, জোর পূর্বক শ্রমিক আন্দোলন দমন, গুপ্ত হত্যা, ডাকসু নির্বাচনের ফলাফল ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনার পর '৭৪-এর শুরু থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে উৎখাতের বিষয়টি জাসদ তার রাজনীতির আশু লক্ষ্য হিসেবে হাজির করে।[৩২] ফলে সারাদেশে আওয়ামী লীগের ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতীক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাসদ ঘেরাও-আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ১৭ই মার্চ '৭৪ পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা শেষে প্রায় হাজার তিরিশেক উত্তেজিত জনতার এক মিছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সাথে জঙ্গি জনতার সংঘর্ষে ১২ জন নিহত হয়[৩৩] মহিলাসহ আহতের সংখ্যা ছিল ন্যূনতম আরও পাঁচগুণ। জাসদ অবশ্য নিহতের সংখ্যা ৫০ বলে দাবি করে।[৩৪]

১৭ই মার্চের ঘটনা নিয়ে নানা ধরনের ভাষ্য আছে। ১৯৭৬ সালে জাসদ জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'আত্মসমালোচনামূলক দলিল'-এ এটা স্পষ্ট হয় যে, এখানে হঠকারিতার ঘটনা ঘটেছে । আবার ১৯৮০ সালের ২৮নভেম্বর সাপ্তাহিক *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক পাঠকের চিঠিতে বলা হয় যে, '...সেদিন পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীকে লক্ষ্য করে বিনা উস্কানীতে তৎকালীন ছাত্র নেতা আ.স.ম. মাহবুব স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করেন। ... কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠার পর পুলিশের ফায়ার ওপেন করা ছাড়া আত্মরক্ষার কোনো পথ ছিল না।'[৩৫] জাসদ নেতারা বলে থাকেন যে, ১৭ই মার্চে তাদের লক্ষ্য ছিল কেবলমাত্র স্মারকলিপি পেশ করা। কিন্তু বিশাল জনসভায় উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে জনতাকে জঙ্গি করে তুলে এবং তখনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওয়ের ঘোষণা দিয়ে আক্রমণাত্মক মিছিলসহ মন্ত্রীর কাছে গিয়ে অন্তত শান্তিপূর্ণভাবে যে স্মারক লিপি দেওয়া যায় না এবিষয়টি সহজেই অনুমেয়। যতদূর জানা যায় সেদিনকার পার্টি নির্দেশ ছিল 'যত শক্ত ব্যারিকেডই হোক তা অতিক্রম করে স্মারক লিপি দিয়ে আসতে হবে'।[৩৬] ১৭ই মার্চের ঘটনা জাসদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি করে এবং এ ঘটনা থেকেই বলা যায় জাসদের পতন শুরু হয়।

আর্মি অফিসার হত্যার অভিযোগ

'সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই'- এ জাতীয় শ্লোগান ৬ই নভেম্বর গভীর রাত থেকে সিপাহিদের মুখে উচ্চারিত হলেও জেনারেল খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা এবং লে: কর্নেল হাওলাদারকে হত্যা ছাড়া ৭ই নভেম্বর ঢাকায় তেমন আর কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। প্রকৃত পক্ষে অফিসার হত্যা শুরু হয় ৮ই নভেম্বর। এ দিন ক্যাপ্টেন আনোয়ার, মেজর আজিম, লে: মুস্তাফিজুর রহমান, ডেন্টাল সার্জন করিম এবং আর্মির লেডি ডা: চেরীসহ ১২ জন অফিসারকে হত্যা করা হয়। জেনারেল জিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য জাসদকে দায়ী করে বলেন, জাসদ তার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়, সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা হয়, দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। কারণ এতে করে সেনাবাহিনীতে অফিসারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায়

শতকরা ৩০ ভাগ নেমে আসে।'[৩৭] । জিয়ার অভিযোগ সত্য বলে বিবেচিত হতে পারে এ কারণে যে, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে জাসদই সর্বপ্রথম অফিসারদের বিরুদ্ধে সিপাহিদেরকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। তবে জাসদ অফিসার হত্যার অভিযোগটি বরাবরই অস্বীকার করেছে।

ভারতীয় হাইকমিশনার হাইজ্যাক প্রচেষ্টা

১৯৭৫ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় হাইকমিশনে অভিযান বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। ২৩শে নভেম্বর আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য ভারতীয় হাইকমিশনারকে জিম্মি হিসেবে আটক করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে এ অভিযান চালানো হয় বলে জাসদ নেতারা উল্লেখ করেন।[৩৮] কিন্তু তাদের এ অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ঘটনাস্থলে পুলিশের গুলিতে ৬ সদস্যের অভিযানকারীদের ৪ জন (আসাদ, বাচ্চু, মাসুদ, হারুন) নিহত হন এবং ২ জন (বেলাল ও মিনু) গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন।[৩৯] এ ঘটনা তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী কার্যক্রমে এ ধরনের নজীর আছে। কিন্তু বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষপটে এটা ছিল নিতান্তই একটি হটকারী ঘটনা—যা পরবর্তীতে জাসদ নেতারাও স্বীকার করেছেন।[৪০]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত দেশ থাকতে ভারতীয় হাইকমিশনারকে হাইজ্যাক করার উদ্যোগ নেওয়া হলো কেন? এ ব্যাপারে অপারেশন সংগঠকদের বক্তব্য হলো 'ঐ সময়ে বিভিন্ন মহল থেকে জাসদের কর্মকাণ্ডকে ভারতীয় চক্রান্ত হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছিল। এ রকম অবস্থায় ভারত ব্যতিত অন্য যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করা হলে তা উপরোক্ত অপবাদকেই শক্তিশালী করতো মাত্র। ...ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে জিম্মি করার মধ্য দিয়ে মূল লক্ষ্য হাসিলের পাশাপাশি দেশবাসীর কাছে এটাও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যাবে যে, জাসদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মিত্রতার নয়, বৈরিতার' [৪১] এই ঘটনার পর দলে প্রচণ্ড হতাশা নেমে আসে। বহু কর্মী গ্রেফতার হয়, দল ত্যাগ করে অনেকেই। ফলে দলে চলতে থাকে নৈরাজ্য এবং এভাবে জাসদ রাজনীতি এগিয়ে চলে ভ্রান্ত পথে।

গণবাহিনী গঠন

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের গণবাহিনী গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিপ্লবী গণবাহিনী হচ্ছে জাসদের সশস্ত্র গণসংগঠন। ৭ই নভেম্বর সিপাহি অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' ছিল এই গণবাহিনীরই একটি শাখা সংগঠন। কর্ণেল তাহের ছিলেন গণবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। '৭৪ এ শেখ মুজিব কর্তৃক একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার ঘোষণা ও জরুরি অবস্থা জারির পরপরই জাসদ তার সামরিক কার্যক্রমের সূচনা ঘটিয়েছিল। জাসদের ভাষায় 'বাকশালী প্রাইভেট বাহিনী ও রক্ষীবাহিনীর সশস্ত্র হামলা,' 'রক্ষী বাহিনীর বেপরোয়া নির্যাতন ও হত্যা যজ্ঞ' ইত্যাদি কারণে জাসদের কর্মীরা আত্মরক্ষার তাগিদে ৭৫ সনের শুরুতে বিপ্লবী গণবাহিনী গড়ে তোলে।[৪২] জাসদের গোপন মুখপত্র সাম্যবাদ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় বলা হয়, যেহেতু দেশে এখন আর তথাকথিত গণআন্দোলনের অধিকার নেই, জনগণের প্রত্যেকটি প্রতিবাদকে নিঃশব্দ করে দেওয়া হচ্ছে অস্ত্রের ঝংকারে, সেহেতু অস্ত্রই হবে এখনকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র রূপ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই আমাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হচ্ছে সৈন্যবাহিনী।'[৪৩] জাসদ নেতা নূরে আলম জিকু বলেন, গণবাহিনী হওয়ার কারণে আমরা বেঁচেছি। রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনীর হাতে আমাদের দশ হাজার জাসদ কর্মী নিহত হয়েছে। গণবাহিনী না হলে আরও ব্যাপক মুজিব বিরোধী যুবকের মৃত্যু হতো।[৪৪] জাসদ আরও বলে যে, বিপ্লবী গণবাহিনী শুধু জাসদকেই রক্ষা করলো না, তারা চোর ডাকাতের উৎপাত থেকে গ্রামীন জীবনকে মুক্ত করলো। ... জাসদ এক দিকে এমনি বাকশালী নির্যাতন প্রতিরোধ করে চলছিল, অপর দিকে সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল[৪৫] '৭৪ এর মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ বিশেষ এলাকা যেমন—শিল্পাঞ্চল, শ্রমিক বস্তি, সেনানিবাসের চারপাশ ইত্যাদি স্থান চিহ্নিত করে আক্রমণ পরিকল্পনা ও আক্রমণের কৌশল ইত্যাদির ভিত্তিতে ম্যানুয়েল তৈরি করে গণবাহিনীর সদস্যদেরকে জাসদ ব্যাপক ভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করে। একই সময়ে সেনাবাহিনীর ভিতরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কার্যক্রমের সূচনা ঘটান তাহের। এভাবে ৭৪-এর শেষ দিকে এসে সমগ্র জাসদ রাজনীতিই সশস্ত্র রাজনীতিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।[৪৬]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জাসদের গণবাহিনী সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও রাজনীতির সশস্ত্রায়নের যৌক্তিকতা কতটুকু? বলা যায়, সশস্ত্র সংগ্রামের নামে সমগ্র দলকে বিপুল সম্ভাবনাময় গণসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে জাসদ

প্রকৃতপক্ষে তার ভবিষ্যৎ বিকাশকেই রুদ্ধ করে ফেলেছিল। জাসদ নেতা মাহবুব রব সাদী স্বীকার করেছেন যে, '... বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি (সশস্ত্র মুজিববাদীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা) বিরাজমান না থাকা সত্ত্বেও উপর্যুপরি কেন্দ্রীয় নির্দেশের মাধ্যমে আন্দোলনকে সশস্ত্র দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে আমাদের মধ্যে গণ আন্দোলনের প্রতি অনীহা এবং সশস্ত্র রাজনীতির প্রতি আসক্তি প্রবল হয়ে উঠলো।'[৪৭] এক আত্মসমালোচনা মূলক দলিলে জাসদ স্বীকার করেছে যে, '...ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নেই বলেই গণবাহিনী সদস্য সংগ্রহ করতে লাগলো গণ সংগঠনগুলো থেকে এবং এভাবে সংগঠনসমূহের মৃত্যু ঘটতে লাগলো। ... কারণ যতটুকু পার্টি গড়ে উঠেছিল তাও এর ফলে হয়ে পড়লো গণসংগ্রাম হতে বিচ্ছিন্ন।[৪৮]

কিন্তু একথাও সত্য যে, আওয়ামীলীগের কঠোর দমননীতি গ্রহণের পিছনে জাসদ নেতারও কম দায়ী ছিলেন না। 'অস্ত্রই হবে এখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র রূপ', 'আমাদের সংগ্রামের প্রধান উপায় হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী'- এ জাতীয় বক্তব্য দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলে সরকার তা সহ্য করবে না- এটাই স্বাভাবিক। এমনকি '৭৪ সালে রাজবাড়ি জেলার আওয়ামী লীগ নেতা ও সাংসদ কাজী হেদায়েত হোসেন ও জেলা আওয়ামীলীগ সম্পাদক অমল কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে হত্যা, কুষ্টিয়ায় ঈদের মাঠে একজন আওয়ামীলীগ দলীয় সাংসদকে হত্যা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ী ঘেরাও , একই সঙ্গে ২৯টি স্থানে 'সশস্ত্র ঘটনা- ঘটানোর সিদ্ধান্ত'[৪৯] ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে জাসদ নিজেই সরকারকে কঠোর হতে বাধ্য করেছিল। আসল ব্যাপার হচ্ছে '৭৪-এর শুরুতেই জাসদ অদূরদর্শী নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার রাজনীতিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, নিজস্ব সাংগঠনিক অস্থিত্ব রক্ষার স্বার্থেই তাকে দ্রুত একটি বাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে তারা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুললেন সত্য, কিন্তু সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুললেন না। তবে সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা যে তাদের জন্ম লগ্ন থেকেই ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বক্তব্যে। প্রতিষ্ঠা লগ্নেই জাসদ বলেছিল, 'আঘাত আমরাও হানবো। সে আঘাত হবে তোমাদের (আওয়ামী লীগ সরকারের) জন্য মরণ আঘাত। আমরা কেবল প্রস্তুতি আর সময়ের অপেক্ষায় আছি।'[৫০] এভাবে গণবাহিনীর মাধ্যমে রাজনীতিতে জাসদের সশস্ত্র প্রবেশ এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বিধি ব্যবস্থাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছিল। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৭ই জুলাই জাসদ দল হিসেবে আত্ম প্রকাশের পুনরনুমতি পেলে '৭৬ এর শেষের দিকে তারা গণবাহিনী বিলুপ্ত করে ফেলে। কিন্তু ততদিনে জাসদের ভুল রাজনীতির স্বীকার হয়ে ঝরে যায় এদেশের অনেক সাহসী সন্তান এবং পরিস্থিতির কারণে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রবর্তিত হয় অনেক অগণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা- যার কুফল এখনও আমরা ভোগ করছি।

মূল্যায়ন

জাসদের জন্ম ছিল আওয়ামী লীগের জন্য ভিতর থেকে প্রচন্ডতম একটি আঘাত। কারণ আওয়ামী লীগের গর্ভেই জাসদের জন্ম। জাসদ যে আওয়ামী লীগকে অনেক দুর্বল করে দিয়েছিল- এ সত্যটা স্বীকার করতে হবে। স্বাধীনতার পর মানুষের আশা-আকাঙ্খা থাকে আকাশ চুম্বী- কিন্তু সে তুলনায় প্রাপ্তি থাকে সামান্য। কারণ দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের মনে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হতেই এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, স্বাধীনতার পর বোধহয় তাদের সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে ঘটা করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, বিশেষ করে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বন্ধ কলকারখানা চালু করা, শরণার্থী পুনর্বাসন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় ইত্যাদি কাজ করতে গিয়ে এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে স্বভাবতই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নতুন সরকারের পক্ষে জনগণের মৌলিক চাহিদার দিকটা যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। তখনই জনগণ হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত। কারণ তারা তখন নিজেদের আশা আকাঙ্খার সাথে প্রাপ্তির সমন্বয় খুঁজে পায় না। অর্থাৎ জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন কিন্তু বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের বাস্তবতা মেনে নিতে নারাজ। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী যেকোনো দেশের ক্ষেত্রেই এ জাতীয় অবস্থা বাস্তব সত্য। অন্যদিকে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অবস্থাটা ছিল আরও একটু ভিন্নতর। কারণ তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি আমেরিকা চীনসহ বৃহৎ শক্তিবর্গের অনেকেই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে অর্থাৎ অখন্ড পাকিস্তানের সমর্থক। অন্য দিকে পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী মুসলিম দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা লাভ করায় একমাত্র ইরাক ব্যতীত বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ মুসলিম দেশই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে নারাজ। সুতরাং এ অবস্থায় দেশ পুনর্গঠনে যে আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা

ও সমর্থনের প্রয়োজন ছিল, বাংলাদেশ তা থেকে অনেকটাই ছিল বঞ্চিত। এ অবস্থায় জনমনে তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের ফলে সৃষ্ট ক্ষোভ ও হতাশাকে সরকারবিরোধী সংগ্রামে কাজে লাগানো ছিল অত্যন্ত সহজ- যা জাসদ করেছিল অত্যন্ত সুচারুভাবেই। বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সময়ে যুব সমাজের মধ্য যে আবেগ কাজ করেছিল সে জাতীয় আবেগকে কাজে লাগিয়েই জাসদ রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল। যুব সমাজের আবেগকে কাজে লাগিয়ে তারা ৮/১০ হাজার যুবককে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু দিতে পারেনি সঠিক কোনো নির্দেশনা। জাসদের পুজি ছিল মূলত যুব সমাজ। জাসদের তৎকালীন বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলোর দিকে আলোকপাত করলে অন্তত তা-ই প্রতীয়মান হয়।

তবে একথা সত্য যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর অনেক মাস আওয়ামী লীগ সরকার দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে কোনো বিরোধীতারই সম্মুখীন হয়নি। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি ডানপন্থী শক্তি তখন তাদের যুদ্ধকালীন ভূমিকার জন্য ছিল নিষিদ্ধ। বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ডকে জাতীয় স্বার্থে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলো। ভাসানীও অনেকাংশে ছিলেন নীরব। এতৎসত্ত্বেও কার্যকর দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছিল বাঙালির স্বপ্নের দল আওয়ামী লীগ ও তাদের প্রিয় নেতা শেখ মুজিব এবং এই ব্যর্থতার সরব প্রতিক্রিয়া হিসেবেই মুজিবের 'নিজের ছেলেরা' বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, রক্ষীবাহিনী গঠনে সেনাবাহিনীর মধ্যে সৃষ্ট সংশয় ও নানাবিধ ব্যর্থতার কারণে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জনগণের আবেগ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাসদের জন্য এক শক্তিশালী নৈতিক সমর্থন হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধ বাজেট, বাংলাদেশ থেকে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় তার হিসাব, পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্ম-সমর্পণের পরে কত অস্ত্র-গোলাবারুদ বাংলাদেশে ছিল তার হিসাব, ১৬ই ডিসেম্বরের পরেও বিভিন্ন কলকারখানা ও সড়ক সেতু ধ্বংশের কারণ ইত্যাদি বিষয়ে শেখ মুজিব জনসাধারণকে কোনো ব্যাখ্যা দেননি বলে জাসদ নেতারা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করেন[৫১], আওয়ামী লীগ সরকার তারও কোনো সদুত্তর দিতে না পারায় জনগণ আওয়ামী লীগকেই অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিল- যা প্রকারান্তরে জাসদকেই শক্তি জুগিয়েছিল। কিন্তু যে ঘোষণা দিয়ে জাসদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙনে চমক সৃষ্টি করেছিল সেই 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-র তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করতে এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করতে তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তারই পরিণতিতে দলে নেমে আসে ভাঙন ও বিভ্রান্তি। ১৯৮০ সালে দলে দেখা দেয় প্রথম ভাঙন। গঠিত হয় বাসদ। ১৯৮৮ সাল নাগাদ এক জাসদ থেকে ব্রাকেটবন্দী বহু জাসদের উৎপত্তি। বর্তমানে বাসদ নামে দু'টি (বাসদ-মাহবুব, ও বাসদ- খালেকুজ্জামান) এবং জাসদ নামে ৩টি সংগঠনের (জাসদ-রব, জাসদ-ইনু, জাসদ-মহিউদ্দীন) অস্তিত্ব রয়েছে। শাজাহান সিরাজ অবশ্য ইতোমধ্যেই আর একটি ব্রাকেটবন্দী জাসদের অবসান ঘটিয়ে অনুগতদের নিয়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন- যে বিএনপি হত্যা করেছিল তাদের নেতা কর্নেল তাহেরকে। ভুল ও বিভ্রান্তি মূলক রাজনীতির এটাই পরিণতি। ১৯৭২ সালে যে লক্ষ্য ও স্প্রিট নিয়ে জাসদের জন্ম, আজ বহুধাবিভক্ত জাসদের কোনো গ্রুপের মধ্যেই সে স্প্রিট আর নেই। তারা বিভ্রান্ত-বিচ্যুত। সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম. রব, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ নেতা যে শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন- সেখানেই তাঁরা ফিরে গেছেন এবং অতীতের মত বর্তমানেও সেই শ্রেণীরই স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মাঝখানে কিছুদিন সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক মাঠ গরম করেছেন মাত্র—একথা বললে কোনোভাবেই ভুল বলা হবে বলে মনে হয় না।

জাসদ তাদের স্থিরকৃত শোষক সম্প্রদায়কে উৎখাতের লক্ষ্যকে এক পর্যায়ে মুজিব উৎখাতের উপলক্ষের সঙ্গে অতিমাত্রায় একাকার করে ফেলেছিল এবং এ থেকেই মূলত জাসদ রাজনীতিতে সংকটের শুরু। একজন গবেষকের মতে, '১৯৭২ সালে মুজিবকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের শ্লোগান ছিল কম করে বললে অদায়িত্বশীল আর সঠিক করে বললে সাম্রাজ্যবাদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য সহায়ক।[৫২] জাসদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্বের মূল্যায়ন কখনোই করেনি। শাসক হিসেবে শেখ মুজিবের সমালোচনা করেও একটি জাতির স্থপতি হিসেবে দলগতভাবে তারা শেখ মুজিবের মূল্যায়ন করতে পারতো। এমনকি জাসদ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে তারা জয়বাংলা শ্লোগান দিলেও পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা সৃষ্টিকারী ঐ শ্লোগান বাদ দিয়ে তারা জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তৃপ্তি বোধ করেছে। শুধু তা-ই নয়, ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চার সংগঠকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা বা বিচারের ব্যাপারেও তারা কোনো কথা বলেনি। এটা কি তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের রাজনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? আসলে এসবই ছিল জাসদ রাজনীতির এক বিভ্রান্তিমূলক অধ্যায়। অন্যদিকে যে মুজিব সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য

সংগ্রাম করেছেন, যে মুজিব ১৯৭২ সালে পৃথিবীর অন্যতম সেরা এক গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু করেছেন, শান্তির জন্য 'জুলিও কুরি' পদক পেয়েছেন, সেই মুজিবই বাধ্য হয়েছিলেন বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু করতে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় প্রথা প্রবর্তন করতে, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করতে। এর জন্য দায়ী ছিল যেমন আওয়ামী লীগের অসহনীয় মনোভাব, ঠিক তেমনি জাসদের দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটাও ঠিক যে, জিয়ার আমলে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের ক্ষেত্রে ঐ জাসদেরই অবদান ছিল সর্বাধিক। কারণ বাকশাল সৃষ্টির পর একদলীয় ব্যবস্থা ও প্রবর্তিত কালাকানুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে একমাত্র জাসদই এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে জনমত গড়ে তুলেছিল। তাই এ স্রোতের বাইরে যাওয়া জিয়ার পক্ষেও সম্ভব ছিল না বলে বাকশালের এককালীন সদস্য হয়েও জিয়াউর রহমান বাধ্য হয়েছিলেন বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করতে। তাছাড়া একজন জেনারেল স্বেচ্ছায় বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করেছেন- এরূপ নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ তথা ছাত্র লীগের ত্যাগী ও বিপ্লবী অংশ বেরিয়ে গিয়ে জাসদ গঠন করার ফলে আওয়ামী লীগের আদর্শিক নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। ছাত্র লীগের এ বিপ্লবী অংশ যদি জাসদ গঠন না করে আওয়ামীলীগে থেকেই আদর্শিক লড়াই করতো এবং পূর্বের মতোই শেখ মুজিবের চার পাশে শক্তি হিসেবে থাকতো, তাহলে আওয়ামী লীগে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নেতৃত্বের দেউলিয়াত্ব হয়তো ঐভাবে দেখা দিত না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, তাজউদ্দিনের মতো বিচক্ষণ ও সমাজতন্ত্রমনা প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব আওয়ামী লীগে থেকে খন্দকার মোশতাকসহ ডানপন্থী অংশ দ্বারা কোণঠাসা হয়ে মন্ত্রিপরিষদ হতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, জাসদ গঠনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি স্বাধীনতার উষালগ্নেই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল এবং এ সুযোগে স্বাধীনতাবিরোধীদের অনেকেই জাসদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল নিজেদেরকে রক্ষা করতে। মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ডান-বামের সমন্বয় হচ্ছে জাসদ- যা পরবর্তীকালে বি.এন.পি-এর মধ্যে দেখা যায়। লেবার পার্টির মাওলানা মতিন (যিনি পরবর্তী কালে জাসদ ত্যাগ করে আবার লেবার পার্টিতেই ফিরে যান), চাপাই নবাবগঞ্জের এহসান আলী খান, রাজবাড়ির ডা: আমজাদ (জামাত নেতা ও সাবেক এম.পি.) এবং মাগুড়ার আব্দুল আওয়াল প্রমুখ হচ্ছেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা বিরোধী যাঁরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে জাসদে যোগদান করলেও পরবর্তী কালে আবার ফিরে যান স্ব- স্ব আদর্শের কাছে। তবে একথাও ঠিক যে, জাসদ যদি তার উচ্ছৃঙ্খল কর্মকাণ্ড পরিহার করে সংগঠন হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতো, তাহলে হয়তো দেশের লাভ হতে পারতো। কারণ জনগণ পেতো একটি সঠিক শক্তিশালী বিরোধী দল ও বিকল্প নেতৃত্ব।

তথ্যনির্দেশ

১ জাসদ কেন্দ্রীয় যৌথ কমিটির খসড়া দলিল: *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা: ৭২ থেকে ৯০*, প্রকাশকাল অনুপস্থিত, পৃ. ৭।

২ আলতাফ পারভেজ (রচনা ও সম্পাদনা), *অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ কর্ণেল তাহের ও জাসদ রাজনীতি* (ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১১৪।

৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রস্তাব পেশ করলে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন এবং সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলামের (মার্শাল মনি) সভাপতিত্বে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয়।

৪ *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *বাংলাদেশ অবজারভার*, মে ২৬-২৭, ১৯৭২।

৫ বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, আলতাফ পারভেজ, পৃ. ৬৯-৭০।

৬ Anthony Mascaronhas, *Bangladesh: A legacy of Blood* (অনুবাদ- মোহাম্মদ শাহজাহান) (ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮), পৃ. ১৯।

৭ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল* (ঢাকা: পড়ুয়া), পৃ. ১৭৪।

৮ জাসদের ১ম জাতীয় সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্ট, ১৯৭৩ পৃ. ৪৯।

৯ *দেশ বাসীর প্রতি আহবান* শিরোনামে জাসদ কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রচারিত প্রচারপত্র পৃ. ১-৪।

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩।

১১ জাসদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ৭৩, পৃ. ০৪।

১২ *সোনার বাংলা*, ৪ জুন, ১৯৭২।
১৩ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ অক্টোবর, ১৯৭২।
১৪ পূর্বোক্ত, ৩-৪ ডিসেম্বর ১৯৭২।
১৫ সংসদে স্বরাষ্টমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিলের তথ্য দ্রষ্টব্য, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ জুন, ১৯৭৩।
১৬ পূর্বোক্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২।
১৭ জাসদের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণিকা, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ সম্পাদকীয়, পৃ. ০৩।
১৮ মোহাম্মদ শাহজাহান (অনূদিত), *Bangladesh: A legacy of Blood* ,পৃ. ১১-১২।
১৯ জাসদ (রব) এর জাতীয় সম্মেলন, ৮৭ এর ''রাজনৈতিক রিপোর্ট'' পৃ.০৪।
২০ মোহাম্মদ শাহজাহান (অনূদিত), *Bangladesh: A Legacy of Blood*, পৃ. ১১৪।
২১ আমজাদ হোসেন ,পৃ. ১৭৮।
২২ *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা : ৭২ থেকে ৯০*, পৃ. ১৪।
২৩ মোহাম্মদ শাহজাহান (অনূদিত) *Bangladesh: A Legacy of Blood*, পৃ. ১২৩।
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪।
২৫ জিয়ার আমলে সংঘটিত ২১টি ক্যু- এর কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক Anthony Mascaronhas, *Bangladesh: A Legacy of Blood* গ্রন্থে। তবে প্রবন্ধকারের সাথে আলোচনায় জাসদের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকজন নেতা ক্যু- এর সাথে তাদের জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।
২৬ মোহাম্মদ শাহজাহান (অনূদিত) পৃ. ১২৪।
২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।
২৮ হায়দার আকবর খান রনো, *মার্কসবাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম* (ঢাকা: গণমুক্তি প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১৮৯।
২৯ আমজাদ হোসেন পৃ. ১৭৮।
৩০ মোহাম্মদ শাহজাহান (অনূদিত) পৃ. ১২৩।
৩১ পূর্বোক্ত, প.১২৩, এখানে উল্লেখ্য যে, অন্যান্যদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ওসমানী, বিমানবাহিনী প্রধান তৈয়ব খান, নৌবাহিনী প্রধান এম, এইচ, খান। মাহবুবুল আলম চাষী প্রমুখ। জেনারেল ওসমানী ও চাষী খন্দকার মোশতাককেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে পূর্বাহ্নে প্রস্তাব করেছিলেন।
৩২ আলতাফ পারভেজ, পৃ. ১০৮।
৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।
৩৪ *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা : ৭২ থেকে ৯০*, পৃ. ০৯।
৩৫ আমজাদ হোসেন ,পৃ. ১৭৮।
৩৬ মাহব ুব রব সাদী, *বাংলাদেশের সামাজিক বিকাশ ও সমাজ বিপ্লব* (ঢাকা, ১৯৭৮), পৃ. ৮০।
৩৭ মোহাম্মদ শাহজাহান(অনূদিত), পৃ. ১২৪। উল্লেখ্য,এ্যান্থনী মাসকার্নহাসের সহিত এক সাক্ষাৎকারে জিয়া এ মন্তব্য
৩৮ করেন বলে মার্সকার্নহার্স *Bangladesh: A Legacy of Blood* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ।
৩৯ ২৬ শে নভেম্বর '*৭৫ নিহতদের স্মরণে প্রকাশিত স্মরণিকা*, সম্পাদনা ফারুক শিকদার, প্রকাশনায় জাসদ ঢাকা মহানগরী পৃ. ৪।
৪০ পূর্ বোক্ত, পৃ. ০৪।
৪১ বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা:৭২ থেকে ৯০*, পৃ. ১৪-১৫।
৪২ আলতাফ পারভেজ ,পৃ. ১৫২।
৪৩ *বা ংলাদেশের রাজনীতি জাসদের ভূমিকা : ৭২ থেকে ৯০*, পৃ. ১১।
৪৪ জাসদের গোপন মুখপত্র *সাম্যবাদ-২*, ১৯৭৪, পৃ. ০৬।
৪৫ *স াপ্তাহিক মেঘনা*, ১১ মার্চ সংখ্যা, ১৯৮৭।
৪৬ *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাসদের ভূমিকা : ৭২ থেকে ৯০* ,পৃ. ১১।
৪৭ বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, আলতাফ পারভেজ ,পৃ. ১০১।
৪৮ মাহবুব রব সাদী, পৃ. ৮২।
৪৯ সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রচারিত জাসদের ৪৪ পৃষ্ঠার *এক আত্মসমালোচনা মূলক দলিল*, মার্চ ১৯৭৯, পৃ. ২৪।
৫০ মাহবুব রব সাদী, পৃ. ৭৯।
৫১ জাসদের *১ম জাতীয় সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্ট*, ১১ মে ১৯৭৩ ,পৃ. ১৭।
৫২ জাসদের *১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা*, পৃ. ১৭।
৫৩ নজরুল ইসলাম, *জাসদ রাজনীতি: একটি নিকট বিশ্লেষণ* (ঢাকা: প্রাচ্য প্রকাশনী, ১৯৮১), পৃ. ১৪০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভিধানিকতা

স্বরোচিষ সরকার*

Abstract: Michael Madhusudan Dutt, in his writings, often relied on a good number of archaic words, large number of almost obsolete words and some newly formed words using grammatical rules. The obscurity of these words leads literary critics to conclude that he depended largely on dictionaries to choose words. This complaint is strengthen by the fact that meaning of many of these terms can not be better understood without consulting dictionaries. The present article evaluates the validity of such complaints in light of Dutt's selection and formulation of words as well as his attribution of new meanings to certain words.

ভূমিকা

মধুসূদনের ভাষার ব্যাপারে একটি সাধারণ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়, তা হলো : তিনি তাঁর রচনায় প্রচুর আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১] বাক্যে প্রযুক্ত শব্দাবলির অর্থ নির্ণয় করা এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তা সংকলন করা অভিধানের কাজ। এদিক দিয়ে আভিধানিক শব্দ বলতে অর্থপূর্ণ এবং সুনিয়মিত শব্দসমূহকেই বোঝায়। কিন্তু অভিযোগকারীদের বয়ান বিশ্লেষণ করে মনে হয়, অভিধানের সঙ্গে মধুসূদনের প্রযুক্ত শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় করা তাঁদের আসল উদ্দেশ্য নয়, মধুসূদনের ব্যবহৃত শব্দের দুর্বোধ্যতাই তাঁদের অভিযোগের মূল লক্ষ্য, সে শব্দ অভিধানে থাক বা না-থাক।

মধুসূদনের ব্যবহৃত শব্দ একাধিক কারণে দুর্বোধ্য। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যে অপ্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত প্রচুর শব্দ ব্যবহার করেছিলেন; পৌরাণিক শব্দ, মধ্যযুগীয় শব্দ, এবং কথ্য শব্দের প্রয়োগ

---

* ফেলো (সহকারী অধ্যাপক), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১ তিন জন বিখ্যাত সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে এ অভিযোগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, 'মাইকেল সংস্কৃত শব্দকোষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।' গোলাম মুরশিদ বলেন, 'আভিধানিক শব্দাক্রান্ত বক্তব্যপ্রধান তাঁর কবিতা বড়ো জোর অভিধানের সাহায্য নিয়ে স্থানবিশেষে পড়তে হয়।' হুমায়ুন আজাদ বলেন, 'মধুসূদন দেখিয়ে গেছেন শব্দ কখনো সম্পূর্ণরূপে লোকান্তরিত হয় না, যদিও তা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিঃশব্দে থাকতে পারে অভিধানের গহ্বরে।' যথাক্রমে দ্রষ্টব্য, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, "মাইকেল বাংলার কবি," *কবি মধুসূদন*, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), ৮২; গোলাম মুরশিদ, "মাইকেল ও সুধীন্দ্রনাথ," *পূর্বমেঘ*, ১০ম বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ. ১৬; হুমায়ুন আজাদ, "মাইকেল মধুসূদন : প্রথম বিশ্বভিখারী ও ত্রাতা," *কবি মধুসূদন*, মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, পৃ. ১৯৯।

করেছিলেন; এবং তৎসম উপসর্গ, প্রত্যয়, ও সন্ধি-সমাসের নিয়ম যথাসম্ভব মেনে নিয়ে কিছু নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন। এর অনেকগুলোই প্রচলিত অভিধানে সাধারণত থাকে না। অভিধানে না-থাকা সেই শব্দগুলোর আপাত-দুর্বোধ্যতাই হয়তো অভিযোগকারীদের বিভ্রান্ত করে, এবং তার ফলে মধুসূদন অভিধান দেখে শব্দ ব্যবহার করতেন বলে তাঁদের মনে হয়।

মধুসূদন তাঁর সমকালেও প্রায় অভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হন।[২] রাজনারায়ণ বসুর নিকট লেখা পত্রে মধুসূদনকে তাই কৈফিয়তের সুরে বলতে হয়, "আমি কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি নই। আমার চিন্তা এবং কল্পনাই শব্দকে টেনে নিয়ে আসে—শব্দ নিয়ে আমি কখনো ভাবি না।"[৩] মধুসূদনের এই বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ এবং বর্তমান আলোচনায় খুবই প্রাসঙ্গিক। কেননা, মধুসূদনের ব্যতিক্রমী চিন্তা ও কল্পনা প্রকাশের জন্যই তাঁর রচনায় বহু নতুন শব্দের আগমন ঘটেছিলো। শব্দগুলো অবশ্যই আভিধানিক—তবে অভিধান থেকে চয়ন করা হয়েছে—এই অর্থে নয়। নতুন ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে অভিধানে সংকলনযোগ্য বহু নতুন শব্দ মধুসূদনকে চয়ন করতে অথবা তৈরি করতে হয়েছিলো, হয়তো সেই অর্থে। তবে সমকালীন অভিধানে পাওয়া না গেলেও বর্তমান কালের অভিধানে শব্দগুলোর বৃহত্তর অংশ বিশেষ মর্যাদায় সংকলিত। এসব বিবেচনায় মধুসূদনের ব্যতিক্রমী শব্দগুলোকে অবশ্যই আভিধানিক অভিধায় চিহ্নিত করা যেতে পারে।

আভিধানিকতা শব্দের অন্যতম অর্থ আভিধানিকের বৈশিষ্ট্য বা গুণ। যিনি শব্দের বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ নির্ধারণ করেন তিনি আভিধানিক। মধুসূদন নিজে কোনো অভিধান সংকলন করেননি, তাই প্রচলিত সংজ্ঞায় তিনি আভিধানিক নন। "মধুসূদনের আভিধানিকতা" শীর্ষক ধারণাকে তাই আপাত দৃষ্টিতে যথাযথ মনে নাও হতে পারে। তবে পরোক্ষ অর্থে প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব একটা অভিধান থাকে—যে অভিধানের শব্দভাণ্ডার, ব্যঙ্গ্যার্থ ও শব্দের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য তাঁর একান্তই নিজস্ব। মধুসূদন এর বাইরে নন। বরং মধুসূদনের শব্দব্যবহারের বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব এতো বেশি যে, তা অন্য যে কোনো বাঙালি লেখক থেকে তাঁকে আলাদা করে ফেলে। এদিক দিয়ে শব্দচয়ন, অর্থান্তরসহ শব্দার্থ নির্ণয় ও তার প্রয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মধুসূদন নিজেকে কিভাবে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, সে সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ আগ্রহব্যঞ্জকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া মধুসূদনের মনোলোকের সার্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে এ ধরনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

মাইকেলের অভিধান ব্যবহার

সৃজনশীল সাহিত্য রচনার সময়ে কোনো লেখকই অভিধান ব্যবহার করেন না। তবে লেখালেখির সঙ্গে যাঁরা জড়িত, কোনো না কোনো ভাবে অভিধানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকে। বিশেষভাবে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন, সেগুলোর বানান ঠিক আছে কিনা তা দেখার জন্য হলেও তাঁদের অভিধান খুলতে হয়।

---

২ প্রসঙ্গত রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন, 'মাইকেলের আর একটী দোষ এই, তিনি বোধহয়, অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করেন, এইজন্য তাহার রচনাও দুর্বোধ হয়।' রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* (অখণ্ড সং; হুগলী: বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৭২), পৃ. ২৭২।

৩ "I am not a good scholar. The thought and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew." উদ্ধৃত, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ সং; কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ১৫৬।

মধুসূদনের মতো একজন বহুভাষাবিদের পক্ষে অভিধান ব্যবহারের অভ্যাস না থাকাটাই বরং অবিশ্বাস্য। কিন্তু কী কী অভিধান তিনি ব্যবহার করতেন অথবা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার পরে পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ছাত্রজীবন থেকে মধুসূদন কী কী অভিধান ব্যবহার করেছিলেন, সে সম্পর্কে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, তাঁর জীবনীকারগণ এ ব্যাপারে বিশেষ কোনো তথ্য দেননি। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের কোনো অস্তিত্বও নেই। মধুসূদনের এ পর্যন্ত প্রকাশিত রচনাবলি ও চিঠিপত্রের মধ্যেও প্রাসঙ্গিক তেমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় মধুসূদন কী কী অভিধান ব্যবহার করেছিলেন, শুধু সে ব্যাপারে কিছু অনুমান করা যেতে পারে মাত্র।

১৮৫৮ সালের পূর্ববর্তী কয়েক দশকে কলকাতায় প্রকাশিত অভিধানসমূহ মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বিষয়টি বিবেচনা করে তৎকালীন কিছু অভিধানের উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

প্রথমত সংস্কৃত অভিধান। দুটি সংস্কৃত অভিধানের সঙ্গে মধুসূদনের বিশেষ পরিচিতি থাকা সম্ভব। এক. 'অমরকোষ' এবং দুই. 'শব্দকল্পদ্রুম'। 'অমরকোষ' মূলত সংস্কৃত শব্দকোষ। মধুসূদন খুব যত্নের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন, তাতে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অমরকোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো। মধুসূদনের অমরকোষ পঠনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে মন্তব্য করেছেন গার্গী দত্ত। তিনি লিখেছেন : "অমরকোষ যে তাঁর ভালোভবেই পড়া ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বহু শব্দ ব্যবহারে, বাক্য, বাক্যাংশ বা পংক্তি ব্যবহারে অমরকোষের স্পষ্ট অনুভূতিতে।[৪] তাছাড়া মধুসূদনের সমকালে অভিধানটি বেশ জনপ্রিয়ও ছিলো। এর ফলে ১৮০৯, ১৮৩১ ও ১৮৭১ সালে অভিধানটির বিভিন্ন সংস্করণ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৫] চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর আরো অনেক পুনর্মুদ্রণ হওয়া সম্ভব।

অন্যদিকে 'শব্দকল্পদ্রুম' একটি সংস্কৃত বিশ্বকোষ। তবে অভিধানের মতোই এতে যাবতীয় সংস্কৃত শব্দকে ভুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আট খণ্ডের এই বৃহদাকার গ্রন্থের আটটি খণ্ডের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮২১, ১৮২৭, ১৮৩২, ১৮৩৮, ১৮৪৪, ১৮৪৮, ১৮৫১, এবং ১৮৫৭ সাল।[৬] এর সংকলক রাধাকান্ত দেব গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বিনা মূল্যে বিতরণ করেছিলেন।[৭] ১৮৫৮ সালের মধ্যে কলকাতার সংস্কৃতি-বলয়ে মধুসূদনের যে অবস্থান তৈরি হয়েছিলো, তাতে অনুমান করা যায় যে, প্রাপকদের সারিতে হয়তো মধুসূদনের নামও ছিলো।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজি-বাংলা অভিধান। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করার অভিপ্রায়ে মধুসূদনের পক্ষে ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অনুসন্ধান করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, ইতোমধ্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হিসেবে নিজের মধ্যে স্বতন্ত্র একটি ভাষিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। বাংলায় লিখতে শুরু করতে গিয়ে মধুসূধনের পক্ষে তাই প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ অনুসন্ধান

---

৪ গার্গী দত্ত, "মধুসূদনের সংস্কৃত চর্চা," *মধুসূদন স্মৃতি*, বিধান দত্ত সম্পাদিত (কলকাতা: সাহিত্যম, ১৯৮৪), পৃ. ৭২।

৫ অমর সিংহ, *অমরকোষ* (কলকাতা: রামচন্দ্র মিত্র, ১৮৭১); হাবীবুর রশীদ, "বাংলা অভিধানের কথা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৭ম বর্ষ, গ্রীষ্ম ১৩৭০ [১৯৬৩]।

৬ Mofakhkhar Hussain Khan, *The Bengali Book : History of Printing and Bookmaking*, vol. 2 (Dhaka: Bangla Academy, 2001), pp. 70-72; রাধাকান্ত দেব, *শব্দকল্পদ্রুম*, ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: বরদাকান্ত মিত্র, ১৮৭৪), 'ভূমিকা'।

৭ যোগেশচন্দ্র বাগল, *রাধাকান্ত দেব* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৪২), পৃ. ৯।

করাটা স্বাভাবিক। আর এক্ষেত্রে ইংরেজি–বাংলা অভিধান তাঁকে যথাসাধ্য সহায়তা দিতে পারতো। তবে এই ধরনের অভিধান ব্যবহারের সঙ্গে মধুসূদনের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের আধিক্যের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এ ধরনের অভিধানগুলোর মধ্যে ১৮২৮ সালে প্রকাশিত John Mendies–এর ইংরেজি–বাংলা অভিধানের নাম সর্বাগ্রস্মরণীয়, যাতে Johnson–এর বিখ্যাত ইংরেজি অভিধানের ভুক্তিসমূহের বাংলা প্রতিশব্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৮২৯ সালে প্রকাশিত J. Pearson–এর A School Dictionary, English and Bengali, ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত রামকমল সেনের 'ইঙ্গরেজি–বাঙ্গলা অভিধান', ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত P.S. D'Rozario–এর English, Bengali and Hindustani Dictionary, ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত G. Haughton–এর A Bengalee English Dictionary, ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত উইলিয়ম কেরির 'ইঙ্গরেজি–বাঙ্গালা অভিধান', ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত W. Morton–এর Biblical Theological Vocabulary, ১৮৫০ সালে প্রকাশিত রাধাকান্ত দের Anglo-Bengali Dictionary, ১৮৫১ সালে প্রকাশিত মুখার্জির Anglo-Bengalee Dictionary, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত মল্লিকের Anglo-Bengalee Vocabulary, ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত স্কুল টেক্সট বুকের 'ইঙ্গরাজী–বাঙ্গালা অভিধান', এবং ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যর Anglo-Bengalee Dictionary প্রভৃতি অভিধান বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।[৮] অভিধানগুলোর মধ্যে রামকমল সেনের 'ইঙ্গরেজি–বাঙ্গলা অভিধান'–এর প্রভাব মধুসূদনের উপর কিছুটা অধিক পরিমাণে পড়া স্বাভাবিক। কারণ হিন্দু কলেজে রামকমল সেন মধুসূদনের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক এবং পরীক্ষক ছিলেন।[৯]

তৃতীয়ত বাংলা অভিধান। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত বাংলা অভিধানগুলোতে (বাংলা–ইংরেজি অথবা বাংলা–বাংলা) যেসব শব্দ ভুক্তির মর্যাদা পেতো, তার সিংহভাগই ছিলো সংস্কৃত শব্দ। ১৮২৫ সালে প্রকাশিত (প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯১৫) ৮০,০০০ শব্দ সংবলিত উইলিয়ম কেরির অভিধান এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবিদার। ১৮৪৭ সালে অভিধানটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাই বাংলায় সাহিত্যচর্চা শুরু করার পূর্বে এ ধরনের একটি অভিধান সংগ্রহ করে নেওয়া মধুসূদনের পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক ছিলো। এছাড়া ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী', ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত জগন্নারাণ শর্মার 'নূতন অভিধান', ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত জয়গোপাল শর্মার 'বঙ্গাভিধান', ১৮৫২ সালে প্রকাশিত দিগম্বর ভট্টাচার্যের 'শব্দার্থ প্রকাশাভিধান', ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যর 'শব্দাম্বুধি' প্রভৃতি অভিধানের নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়।[১০]

সমকালীন আভিধানিকগণ বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে খুব একটা আলাদা মনে করতেন না, তা তাঁদের একাধিক মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। বিদেশি আভিধানিকগণ ছিলেন এ ব্যাপারে অধিক অগ্রসর। এ বিষয়ে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, হেনরি পিটস ফরস্টার, উইলিয়ম কেরি, জি. হটন সকলেই প্রায় একমত পোষণ করতেন।[১১] যেমন উইলিয়ম কেরি তাঁর অভিধানের ভূমিকায় বলেছিলেন : বাংলা ভাষার প্রায় সবটাই সংস্কৃত থেকে আগত, ... বাংলা শব্দভাণ্ডারের তিন–চতুর্থাংশের বেশি শব্দই সংস্কৃত এবং বাকি শব্দগুলো সংস্কৃত রূপ থেকে এতো সামান্যই বিকৃত যে, অনায়াসেই তার সংস্কৃত–মূল

---

৮ *The Bengali Book : History of Printing and Bookmaking,* vol. 2, যত্রতত্র।

৯ গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি* (২য় সং; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫।

১০ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, "বাংলা অভিধান," *সাহিত্য পত্রিকা,* ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৬৪; হাবীবুর রশীদ, "বাংলা অভিধানের কথা," *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ৭ম বর্ষ, গ্রীষ্ম ১৩৭০ [১৯৬৩]; *The Bengali Book : History of Printing and Bookmaking,* vol. 2।

১১ গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২), পৃ. ১৮০–১৯৯।

বের করা যায়।[১২] মধুসূদনের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যের সঙ্গে এসব অভিধানের এই প্রবণতার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

শব্দনির্বাচন

মধুসূদনের শব্দনির্বাচন রীতিনির্ভর। এক এক রীতির রচনায় তৎসম ও অতৎসম শব্দের আনুপাতিক হার এক এক রকম। যেমন—মধুসূদনের অধিকাংশ নাটক-প্রহসনে তৎসম শব্দের হার শতকরা ২০, এবং অতৎসম শব্দের হার শতকরা ৮০; অন্যদিকে অক্ষরবৃত্তে লেখা মধুসূদনের লেখা যে কোনো কবিতায়—তা মিত্রাক্ষর হোক, বা অমিত্রাক্ষর হোক—তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহার যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৪০।[১৩] অর্থাৎ মধুসূদনের ভাষা সম্পর্কে এমন কোনো সাধারণ মন্তব্য করা যায় না, যাতে বলা সম্ভব, তিনি তাঁর রচনায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন, অথবা সংস্কৃত শব্দকে যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। বরং তাঁর রচনাবলি থেকে এমন উদাহরণ খুব সহজেই বের করা সম্ভব, যেখানে তৎসম শব্দের ব্যবহার শতকরা প্রায় ৮০, আবার এমন রচনাও দুর্লক্ষ্য নয়, যেখানে অতৎসম শব্দের ব্যবহারও শতকরা ৮০ ভাগের মতো। মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক থেকে চয়ন করা নিম্নের উদ্ধৃতি দুটোতে এ মন্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়:

ক) কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান্, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবনমোহিনী
উত্তরিলা গজপতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জলকান্ত যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে; পলাইল দূরে
মেঘদল, তম যথা ঊষার হসনে!
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতিভূষণ দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।

এই উদ্ধৃতিতে নজরটান শব্দগুলো অতৎসম। শতকরা হার বিচার করলে শতকরা ৯০ ভাগ শব্দই এখানে তৎসম। অন্যদিকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি কৃষ্ণকুমারী নাটকের :

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থাকে না! কি আপদ। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এদিকে

---

১২ "The Bengalee language, ... is almost entirely derived from the Sungskrita: considerable more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupted, that their origin may be traced without difficulty." W. Carey, "Preface," *A Dictionary of the Bengali Language, Vol. I* (Reprint; New Delhi: Asian Educational Services, 1981), p. iv.

১৩ মধুসূদনের রচনাবলি থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে এই হার নির্ণয় করা হয়েছে। সমগ্র রচনাবলির বিচারে এই হারের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

> আসচে। দেখ ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ করতে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষের জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

এই উদ্ধৃতির নজরটান শব্দগুলো তৎসম। অর্থাৎ এখানে তৎসম শব্দের হার শতকরা ২০ ভাগের বেশি নয়।

প্রসঙ্গত লেখকদের শব্দনির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। লেখকগণ কি লেখার সময়ে সচেতনভাবে শব্দের গোষ্ঠী বিচার করেন বা তার আনুপাতিক হার নির্বাচন করে তারপর সাহিত্যচর্চা করেন? এ ধরনের প্রশ্ন অবশ্যই হাস্যকর এবং অবান্তর। বরং এ ব্যাপারে অনেক উপাদানের মধ্যে সাহিত্যের পূর্বদৃষ্টান্ত অনেক সময়ে প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। মধুসূদনের ক্ষেত্রে তা কাজ করেছিলো কিনা, প্রথমে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে।

মধুসূদনের পূর্ববর্তী লেখকগণ তাঁদের রচিত সাহিত্যে কী পরিমাণ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা দেখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত সেই সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছিলো কিনা, সেটাও দেখার বিষয়। মেঘনাদবধ কাব্য লেখার পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে তিনি কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ পড়েছিলেন বলে জানা যায়।[১৪] মধ্যযুগে লেখা এই কাব্যে তৎসম ও অতৎসম শব্দের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৪০ ও ৬০, এই হার মধুসূদনের কাব্যের হারের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও খুব একটা দূরবর্তী নয়। কিন্তু মধুসূদন তাঁর পূর্ববর্তী অন্য যেসব কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৫] ভারতচন্দ্রের কাব্যে তৎসম শব্দ ব্যবহারের হার খুবই কম, যথাক্রমে শতকরা ২৫ ও ৭৫। বাংলা কাব্যের এই ক্রমহ্রাসমান তৎসম ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য মধুসূদন ধারণ করেননি।

প্রসঙ্গত একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। আলাওলের আবির্ভাব (১৬০৭–১৬৮০) ভারতচন্দ্রের (১৭১২–১৭৬০) প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এবং কৃত্তিবাসের (১৩৮১–১৪৬১) প্রায় দুই শতাব্দী পরে হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই ক্রমহ্রাসমানতার সঙ্গে খাপ খান না। দেখা যায় তাঁর কাব্যে তৎসম ও অতৎসম শব্দ ব্যবহারের আনুপাতিক হার কৃত্তিবাস বা ভারতচন্দ্র সকলের থেকে বেশি, যথা প্রায় ৫০:৫০। এমনকি কখনো কখনো আলাওলের এই হার মধুসূদনের হারের নিকটবর্তী হয়ে যেতে দেখা যায়।[১৬] মধুসূদনের তৎসম শব্দ ব্যবহারের আধিক্যকে তাই সমকালীন সংস্কৃতায়ন প্রবণতার সঙ্গে এক করে দেখাও হয়তো ঠিক হবে না।

---

১৪ গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, পৃ. ১২২।

১৫ ভারতচন্দ্রের কাব্য যে মধুসূদন গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন, একাধিক বিষয়ে তা নিয়ে মধুসূদনের বিরূপ মন্তব্য এর প্রমাণ। প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, শিশির কুমার দাস, *মধুসূদনের কবিমানস* (২য় সং; কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৯), পৃ. ১৭–১৮, ১০৪।

১৬ যেমন নিম্নের পদগুলোতে তৎসম শব্দের ব্যবহার :

সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষ পত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত॥
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষ শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥
পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব-জন্তু-শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতি লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥ (নজরটান অতৎসম)

এসব বিবেচনা করে মনে হয়, সাহিত্যচর্চার জন্য মধুসূদনের প্রস্তুতি তথা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাঠ, পাশ্চাত্যের মহাকাব্যের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণা, নতুন ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য, সর্বোপরি মধুসূদনের শিক্ষা ও মানসিক গঠন তাঁকে এই ধরনের আনুপাতিক হারের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো।

সাহিত্যচর্চার জন্য প্রস্তুতি অর্থাৎ তাঁর পঠিত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত এ ব্যাপারে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে থাকতে পারে, সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় পুরোটাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এই তথ্য অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যবহ। মিল্টনের ব্লাঙ্ক ভার্স তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো নিঃসন্দেহে। অন্যদিকে প্রচলিত বাংলা পয়ার, কৃত্তিবাস বা ভারতচন্দ্রের যে দৃষ্টান্ত তাঁর হাতের কাছে ছিলো, তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যকে সেই ছন্দ ধারণের জন্য যথেষ্ট অনুকূল মনে করার কোনো কারণ ছিলো না। কিন্তু যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ইতোমধ্যেই তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিলো, সেখানে তিনি দেখেছিলেন, মিল ছাড়াও কাব্যের ছন্দ কতো সুষম ও গতিশীলতা অর্জন করে। এই পরিস্থিতিতে তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিই অমিত্রাক্ষরকে ধারণ করার জন্য অধিকতর উপযোগী, তাহলে তাঁর পক্ষে তৎসম শব্দের দিকে ঝুঁকে পড়াটা অস্বাভাবিক নয়। হয়তো এ কারণেই মধুসূদনের কাব্যে তৎসম শব্দের এতোটা বাহুল্য দেখা যায়। মানসিকতার দিক দিয়ে যদি তাঁর কোনো শুচিবাই থাকতো, অর্থাৎ তৎসম শব্দকেই যদি তিনি একমাত্র শুদ্ধরূপ মনে করতেন, তাহলে মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যেও যে অসংখ্য কথ্য ও আঞ্চলিক শব্দরূপ লক্ষ করা যায়, তা থাকতো না। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বেলায় তিনি যে বহু মধ্যযুগীয় তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটিও সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দকে খাঁটি বাংলা শব্দ মনে করার বিরোধী।

অন্তত শব্দনির্বাচনের ব্যাপারে মধুসূদন যে অভিধানের শরণাপন্ন হননি, মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যবহৃত স্বর্গরাজ ইন্দ্রের প্রতিশব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য দেখে তা আঁচ করা যায়। সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'-এ ইন্দ্র শব্দের ৩৪টি প্রতিশব্দ আছে। অন্যদিকে মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন ইন্দ্রের ১৮টি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, মধুসূদনের ব্যবহার করা ১৮টি প্রতিশব্দের মাত্র ৮টির সঙ্গেই অমরকোষের মিল রয়েছে, বাকি ১০টি মধুসূদনের নিজের তৈরি করা প্রতিশব্দ। 'অমরকোষ' অভিধানে সংকলিত প্রতিশব্দ ৩৪টি নিম্নরূপ:

> ইন্দ্র, মরুত্বাৎ, মঘবা, বিড়োজা, পাকশাসন, বৃদ্ধশ্রবা, সুনাসীর, পুরহুত, পুরন্দর, জিষ্ণু, লেখর্ষভ, শক্র, শতমন্যু, দিবস্পতি, সূত্রামা, গোত্রভিদ, বজ্রী, বাসব, বৃত্তহা, বৃষা, বাস্তোস্পতি, সুরপতি, বলারাতি, শচীপতি, জম্ভভেদী, হরিহয়, স্বারাজ, নমুচিসূদন, সংক্রন্দন, দুশ্চবন, তুরাষাদ, মেঘবাহন, আখণ্ডল, সহস্রাক্ষ, এবং ঋতুক্ষা।[১৭]

মধুসূদন এখান থেকে যে ৮টি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো হলো : ইন্দ্র, বাসব, জিষ্ণু, নমুচিসূদন, পুরন্দর, শক্র, সহস্রাক্ষ, এবং সুনাসীর। অন্যদিকে মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদনের নবগঠিত প্রতিশব্দগুলো হলো : অদিতিনন্দন, অসুরারি, ত্রিদিব-ঈশ্বর, দেবপতি, দৈত্যরিপু, দৈত্যকুলদম, শচীকান্ত, সুরদলনিধি, স্বরীশ্বর, এবং দিবিন্দ্র।

উদ্ধৃত, Dinesh Chandra Sen, *Vanga Shahitya Parichay* (Kolkata: University of Kolkata, 1914), p. 1310.

১৭ হরগোবিন্দ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), *নামলিঙ্গানুশাসনং নাম অমরকোষ* (বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৭০), পৃ. ২১। [মূল নাগরী লিপিতে হিন্দি ভাষ্যসহ সংস্কৃত ভাষায়]

মধুসূদন যদি মেঘনাদবধ কাব্য লেখার সময়ে অমরকোষ ব্যবহার করে শুধু সেখান থেকেই ১৮টি প্রতিশব্দ গ্রহণ করতেন, তাহলে মেঘনাদবধ কাব্যের চেহারা অবশ্যই আলাদা হতো, শব্দগুলোর ধ্বনিমূল বিন্যাস দেখে প্রাথমিকভাবে অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু মধুসূদন তা করেননি। কিন্তু সেখানকার ৮টি প্রতিশব্দ এবং মেঘনাদবধ কাব্যের ৮টি প্রতিশব্দ অভিন্ন হওয়ার অর্থ, অমরকোষের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় থাকা—তা যে পর্যায়েরই হোক না কেন। তবে একই সঙ্গে এই দৃষ্টান্ত এটাও প্রমাণ করে যে, অমরকোষের চেয়েও বড়ো যে অভিধান—সৃজনশীলতা—তা মধুসূদনের ছিলো, এবং তার ওজন যে অভিধানের চেয়ে ভারী, মেঘনাদবধ কাব্যের ১৮টি প্রতিশব্দের ক্ষুদ্রতর অংশ অমরকোষে এবং বৃহত্তর অংশ মধুসূদনের মগজের কোষে সংকলিত দেখে তা বোঝা যায়।

অভিধা ও অর্থান্তর

প্রয়োগকারী ভেদে শব্দের অভিধা আলাদা হয়। অর্থাৎ বিশেষ কোনো শব্দ একাধিক ব্যক্তির নিকট অভিন্ন বানানে ও অভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়েও তাদের সকলের কাছে শব্দটির অভিধা বা সংজ্ঞার্থ এক রকম হয় না। এর সঙ্গে অর্থান্তরের বিষয়টি জড়িত। একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে ব্যবহারকারী বিভিন্ন সময়ে সুনির্দিষ্ট কোনো শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে পারেন। শব্দের অভিধা ও অর্থান্তরের এই বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখলে বলতে হয়, প্রতিটি মানুষের শব্দভাণ্ডার স্বতন্ত্র। একজন লেখক, যাঁর কাজই হলো শব্দ নিয়ে শিল্পনির্মাণ, অভিধা ও অর্থান্তরের প্রশ্নে তাঁর শব্দভাণ্ডার অন্যদের থেকে দৃষ্টিগোচরভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। এই অর্থে মধুসূদনের শব্দভাণ্ডার সম্পূর্ণ আলাদা মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারে।

শব্দের অভিধার পরিবর্তন ঘটে একাধিক উপায়ে। লেখক তাঁর কাঙ্ক্ষিত অভিধা আরোপ করে শব্দটিকে বাক্যের মধ্যে স্থান দিতে পারেন, যার ফলে শব্দের অর্থান্তর ঘটে। কখনো বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে অভিধাটিকে সম্প্রসারিত বা সংকীর্ণ করতে পারেন। কখনো শব্দটির পদান্তর ঘটিয়ে অভিধার প্রকৃতি বদল করতে পারেন। আবার কখনো বা উপমা প্রয়োগ করে শব্দের অভিধায় অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা নিয়ে আসতে পারেন। মধুসূদন তাঁর কাব্যে উল্লিখিত সব কৌশলকেই কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনমতো শব্দের অভিধা নির্ণয় করে নিয়েছিলেন।

প্রথমে অর্থান্তরের বিষয়টি দেখা যাক। এমন অনেক শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন, যার বাচ্যার্থ তো নয়ই, ব্যঙ্গ্যার্থেরও যথেষ্ট অপ্রচলিত অর্থ আরোপিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ "কাল" শব্দটির অর্থান্তরের কথা ধরা যাক। "হত রথিপতি ইন্দ্রজিৎ কাল রণে" বাক্যাংশে "কাল" শব্দের অর্থ ভীষণ। অথচ শব্দটির সর্বাধিক প্রচলিত দুটো অর্থের মধ্যে একটি মৃত্যু এবং অন্যটি সময়। কখনো তিনি পৌরাণিক নামশব্দকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেন, সেই হিসেবে তার অর্থান্তরও ঘটে যায়। যেমন ভীমা। শব্দটির অর্থ চণ্ডী। কিন্তু শব্দটিকে মধুসূদন একাধিক বার ভীষণা অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো তিনি ব্যাকরণ লঙ্ঘন করে হলেও শব্দের অর্থান্তর গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত বহু আলোচিত "বারুণী" শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৮] "বারুণী" শব্দের প্রচলিত অর্থ মদ্য। এর ব্যাকরণগত গঠন বরুণ+অ(অণ্)+ঈ। এই "ঈ" প্রত্যয়

---

১৮ এ ব্যাপারে মধুসূদন দত্তের উক্তি স্মরণীয়। তিনি জেনেশুনেই এ ব্যাপারে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করেন এবং শব্দের অর্থান্তর ঘটান। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির এক অংশে তিনি লেখেন : The name "বরুণানী", but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as "বারুণী", and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules. মোবাশ্বের আলী, *মধুসূদনের ইংরেজি গদ্য রচনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৫৩।

স্ত্রীপ্রত্যয় নয়। সেদিক দিয়ে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এটি দিয়ে বরুণের স্ত্রীকে বোঝানো যায় না। যদি বোঝানো হয়, তাহলে "বারুণী"-র উপর নতুন একটি অর্থ আরোপ করে নিতে হয়। মধুসূদন সেটাই করেছেন। এভাবে বেশ কিছু শব্দে মধুসূদন সম্পূর্ণ নতুন অর্থ আরোপ করেছেন।

অর্থান্তরের মাধ্যমে মধুসূদন কিভাবে অর্থের প্রসার ঘটান, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। প্রসঙ্গত অজাগর (অজগর অর্থে), অনম্বর (আকাশ অর্থে), আন্তরিক (অন্তর্নিহিত অর্থে), কীর্তিবাস (কীর্তিমান অর্থে), কৌমুদিনী (জ্যোৎস্না অর্থে), গীতী (গায়ক অর্থে), জলবহ (জলবাহ অর্থে), ভর্ত্রিণী (ভর্ত্রী অর্থে), রূপস (রূপবান অর্থে), হেষিল (হ্রেষিল অর্থে) প্রভৃতি শব্দ মধুসূদন কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন, বর্তমান আলোচনার সঙ্গে যা সঙ্গতিপূর্ণ।[১৯]

পদান্তরের প্রশ্নে প্রথমেই নামধাতুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। বিশেষত মধুসূদনের কাব্যে নামধাতুর প্রয়োগ কিছুটা অস্বাভাবিক রকমের। এর ফলে নামধাতুর প্রসঙ্গ উঠলেই মধুসূদনের নাম ওঠে। কিন্তু নামধাতুর প্রয়োগে মধুসূদনের কৃতিত্ব প্রারম্ভিক পর্যায়ের নয়, কেননা, বাংলা গদ্যের সাধু রীতিতে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে, এমনকি বাংলাদেশের কোনো কোনো উপভাষায় নামধাতুর ব্যবহার রয়েছে।[২০] ইংরেজি ভাষাশৈলী থেকেও মধুসূদন তা আহরণ করতে পারেন বলে সমকালে আলোচিত হয়েছিলো।[২১] বৈশিষ্ট্যটিকে মধুসূদন কেন এতোটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, সেটাই বরং প্রশ্ন। তৎসম শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনেই হয়তো মধুসূদন পদ্ধতিটির পুনঃপ্রচলন করেন, হয়তো কিছুটা বেশি মাত্রায়ই করেন। এই জাতীয় পদান্তরের ফলে শব্দের অভিধাগত যে পরিবর্তন হয়, তা মধুসূদনের আভিধানিকতাকে নিঃসন্দেহে অভিনবত্ব দান করে। দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

আয়াস, রণ, বৃষ্টি, প্রতিবিধান, সমর প্রভৃতি বিশেষ্যবাচক শব্দকে তিনি যথাক্রমে ক্রিয়াপদ আয়াসিতে, রণিছে, বৃষ্টিলা, প্রতিবিধানিতে, সমরিব প্রভৃতি রূপে পরিবর্তিত করেন। এর ফলে শব্দের রূপগত পরিবর্তনের পাশাপাশি ধারণাগত পরিবর্তনও ঘটে। বিশেষ্য পদের সাধারণ ধারণা হলো, তা কোনো কিছুর নাম। সেই নাম যখন ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তখন সংশ্লিষ্ট শব্দের ধারণাগত যে পরিবর্তন ঘটে, তা শুধু অর্থান্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেখানে শব্দের অভিধা বদলে যায়। শব্দের অভিধাগত এই পরিবর্তনই এক অর্থে আভিধানিক পরিবর্তন।

তবে শব্দের অভিধাগত এইসব পরিবর্তনের পাশাপাশি কিছু কিছু শব্দাভিধার ক্ষেত্রে মধুসূদনের গতানুগতিক, এমনকি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত "চণ্ডাল" বা "চাঁড়াল" শব্দের অভিধার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। শব্দটি তিনি তাঁর কাব্যে ও নাটকে বহু বার ব্যবহার করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে মেঘনাদ উচ্চারণ করে : "চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে।"[২২] 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে লেখেন : 'এমন কর্ম চণ্ডালেও করতে পারে না।'[২৩] 'কোন এক পুস্তকের

---

১৯ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, "মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দ অনুষঙ্গ," *কবি মধুসূদন,* মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, পৃ. ১৭০-৭১।

২০ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

২১ Then again grammar might have been respected; and we must strongly protest against the constant introduction in imitating of the English idiom of such verbs as *stutila, swanila, nirghoshila.* দ্রষ্টব্য, "Lives of the Bengali Poets by Harimohan Mukerjya" *Calcutta Review,* vol. 52, 1871, p. 307.

২২ মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য,' *মধুসূদন রচনাবলী* (কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৯৯), পৃ. ৮৭।

২৩ 'কৃষ্ণকুমারী', তদেব, পৃ. ৩৪১।

ভূমিকা পড়িয়া' কবিতায় লেখেন : "চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে।"[২৪] সমকালীন বর্ণহিন্দু সমাজের অভিধা অনুযায়ী চণ্ডাল বা চাঁড়াল অস্পৃশ্য তথা নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের একটি জাত—যারা বর্ণহিন্দুদের নিকট স্পর্শের অযোগ্য, শিক্ষা, এমনকি ধর্মচর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত। "চণ্ডাল" শব্দের প্রচলিত অভিধার প্রতি মধুসূদনের এই স্বীকৃতি অস্পৃশ্যতা নামক সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি তাঁর আস্থা প্রমাণ করে—মধুসূদন দত্তের মতো আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে তা কিছুটা অস্বাভাবিক বইকি।

উপসংহার

মাদ্রাসে বসবাসের সময়ে দিনের প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে মধুসূদন এক সঙ্গে বেশ কয়েকটি ধ্রুপদী ভাষার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ জাতীয় অস্বাভাবিক সাধনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, এ হলো পূর্বপুরুষের ভাষাকে অলঙ্কৃত করার পূর্ব পদক্ষেপ।[২৫] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভূমিকা রাখার পরিকল্পনার বিষয় মধুসূদনের এ বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত। এই প্রস্তুতিপর্বে তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কেও তিনি হয়তো ভেবেছিলেন। তাছাড়া তাঁর সাহিত্যে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহারের কারণও ঐ অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।

নতুন ভাব প্রকাশের জন্য এবং সাহিত্যের নতুন রীতিকে দৃশ্যযোগ্যভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে সচেতনভাবেই মধুসূদন জুতসই শব্দ এবং জুতসই অভিধা খুঁজেছেন। এ অনুসন্ধানের কাজে তাঁকে ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে সম্ভাব্য সব দিকে তাকাতে হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ সংগ্রহ করতে হয়েছে। চারপাশের সেই উৎসের মধ্যে যদি নানা ধরনের অভিধান থাকে, যদি সংস্কৃত সাহিত্য থাকে, যদি সংস্কৃতায়িত গদ্যভাষা থাকে, সর্বোপরি থাকে যদি মধ্যযুগের অনুকূল সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত—মধুসূদনের মতো প্রতিভাবান কবি সেসব সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।[২৬]

---

২৪ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী,' তদেব, পৃ. ১৮১।

২৫ প্রাসঙ্গিক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, পৃ. ১২৩।

২৬ বাংলা একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক প্রফেসর মনসুর মুসার অনুরোধে প্রবন্ধটি রচিত এবং ২৯শে জুন ২০০২ তারিখে মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

বরেন্দ্র অঞ্চলের পোড়ামাটি ফলকে জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি

আবদুল মতিন তালুকদার*

Abstract: People of different ethnic origins lived in the ancient Varendra region. Vivid pictures of everyday life of these people of the time are very artistically presented in the *stupas* of Mahasthan of Bogra, Paharpur of Naogaon, Kantazi temple of Dinajpur and the mosques and temples of Rangpur, Rajshahi and Pabna. The terracotta figurines reflect the life of aborigines, their beliefs, happiness and miseries and also nature and landscape of the region. The terracotta plaques of Varendra region show deep commitment, high sensitivity and delicate power of observation of the artists and their direct knowledge about daily life around them.

ভূমিকা

প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বরেন্দ্র অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের ভূ-খণ্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির ধরন কেমন হবে, তা নির্ভর করবে সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থা, ভাষা-সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা সামাজিক আচার-আচরণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। কারণ, প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের জীবন এসবের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল। অধিকন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্য উপকরণ ও ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপি সমূহের উপর আমাদের অধিকাংশ সময়ে নির্ভর করতে হয়।[১] বরেন্দ্র অঞ্চল মূলত বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, বংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও ভারতের মালদহ জেলা নিয়ে এবং পূর্বে করতোয়া ও পশ্চিমে মহানন্দা দ্বারা বেষ্টিত ভূ-ভাগ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রীকে পাল রাজাদের জনকভূ অর্থাৎ পিতৃভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতিক ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ এই বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের জীবন-ধারণের বৈশিষ্ট্য ছিল বৈচিত্র্যময়। নদী-নালা, খালবিল, বনজঙ্গল এবং সমতল ভূমির কারণে মানুষের বসবাস করার মতো উপযুক্ত এলাকা ছিল এই বরেন্দ্র অঞ্চল।

আলোচ্য প্রবন্ধে বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ তৎকালীন আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ দৃশ্যে আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও প্রকৃতি

অনুকূল ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু, শিকারের প্রাণীর সহজলভ্যতা, বনজ খাদ্য বস্তুর প্রাচুর্য প্রভৃতি সুদূর বিস্মৃত অতীত কালেই নানা পরিভ্রমণশীল, আদিম মানবগোষ্ঠীকে এ অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করে।[২] এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, প্রাচীন কালে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। ভাত মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ফল-মূল ছিল তাদের আহার্য সামগ্রী। বরেন্দ্র ভূমিতেও নানা ধরনের পশু-পাখি, উদ্ভিদ, উভচর

---

* সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[১] আব্দুল মমিন চৌধুরী , 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৭), পৃ. ১।

[২] আব্দুর রহমান সিদ্দিকী , 'বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা, নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান', সাইফুদ্দীন চৌধুরী সম্পাদিত *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*,(রাজশাহীঃ বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৯৫।

প্রাণী, জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য সম্পর্কে ধারণা এবং প্রমাণ পাওয়া যায় বগুড়ার মহাস্থান, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির, নঁওগার পাহাড়পুর, রাজশাহী এবং পুঠিয়ার মসজিদ-মন্দিরগুলোয় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে। সেকালের মানুষ নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের ধারে মৎস্যাদি শিকার করে জীবন ধারণ করত। বরেন্দ্রভূমিতে বসবাসকারী লোকসমাজের মধ্যে নানা ধরনের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তা বলাই বাহুল্য।

বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসকারী শবর-শবরীদের জীবনের নানাচিত্র ধরা পড়েছে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি ফলকে চলমান ভঙ্গিতে শবরী পাতা দিয়ে তৈরি পোশাকে কোনো রকমে শরীরের নিম্নাংশ পেঁচিয়ে লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করেছে। উপরের অংশ অনাবৃত্ত এবং পাতা দিয়ে ফুলের মালার মতো করে কোমর থেকে একটি রেখা বাম স্তনের উপর দিয়ে পেঁচানো হয়েছে। বাম হাতে তার শিকার করা নিহত পশু, চলমান ভঙ্গিতে শবরের গৃহে ফেরার দৃশ্যকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তৎকালীন মৃৎশিল্পীগণ। সমসাময়িককালে শবরদের একটি অংশ এখানকার বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াত এবং নানা ধরনের শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। তীর, ধনুক, ফাঁদ শিকারিদের মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। শিকারের দৃশ্য পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকেও যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে মহাস্থানগড় ও পুঠিয়ার মন্দিরে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে। মাহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত একটি শবরকে দেখা যাচ্ছে শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করতে, পাতার পোশাক পরা শিকারির চোখ দুটি বড় বড় করে সামনের দিকে তাকানো, হাতে বালা, গলায় নকসা খচিত হাড়, কিছুটা লম্ফ দিয়ে শিকার করতে উদ্যত (চিত্র নং-১)। একই রকম পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকেও অনুরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। একটি ফলকের বিষয়বস্তু হচ্ছে, বাম হাতে ধনুক, সদ্য জ্যামুক্ত তীর, সামনের দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে এক পা ভাঁজ করে দাড়ানো, মুখ-চোখের নানা অংশে ক্ষতের চিহ্ন; মনে হয় পরবর্তী আমলে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আরেকটি ফলকে দেখা যাচ্ছে ডান হাতে ধনুক বামহাত উপরের দিকে ওঠানো, হাতে পায়ে বালা এবং শিকারির মুখের অংশ ভাঙা দেখা যাচ্ছে (চিত্র নং- ২)। রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও স্থান পেয়েছে, পুঠিয়ার গোবিন্দ মন্দিরে একটি প্যানেলে অনেক শিকারির দল হাতি-ঘোড়ায় চড়ে শিকারের দৃশ্য। শিকারিদের শিকারের হাতিয়ার হিসেবে বর্ষা ফলকের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বর্ষা নিক্ষেপ করে হরিণকে আক্রমণ করে তাকে বধ করার দৃশ্য ফুটে উঠেছে।[৩]

শবররা বাসকরত পাহাড় ও জঙ্গলে। পরনে তাদের থাকতো ময়ূরের পাখনার পরিচ্ছদ, গলায় গুঞ্জাবিচির মালা, কানে বজ্রকুণ্ডল।[৪] বরেন্দ্র ভূমিতে ডোম, চণ্ডাল, কাপালিক, শবর-শবরীদের জীবন-যাত্রা লক্ষ করা যায় তৎকালীন চর্যাগীতিতেও। ডোমেরা শহর ও গ্রামে বাস করত। কাপালিকরা নরকঙ্কালের মালা পরে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুড়ে বেড়াত। সাধারণ মানুষ কাছা দিয়ে ধুতি পরত।

প্রাচীন বরেন্দ্রে আর এক ধরনের শিকারির বসবাস ছিল- তারা হলো কোচ।[৫] তাদের প্রধান পেশাই ছিল মৎস্য শিকার। মাছ ছাড়াও শামুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ, কুচা, বাইন ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবন যাপন করত। পৌরাণিক কাহিনী এবং প্রকৃতির নানা দৃশ্যের স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছেন মৃৎশিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকর্মে। বিশেষ করে গ্রাম্য নারীদের মাছ কোটা, ঝুড়িতে ভরে মাছ হাটে নিয়ে যাওয়া, শিকারের বাস্তব দৃশ্য, নদীতে নৌকা ও মাঝির দৃশ্য, মাছ ধরা, উনুনের পাশে রন্ধনরতা রমণী ইত্যাদি সব সাধারণ চিত্র অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তৎকালীন শিল্পীরা। মাছের দৃশ্য স্থান পেয়েছে ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকেও, এতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় এদেশের মানুষের মৎস্য প্রীতির কথা। বাংলাদেশের বাইরে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকেও মাছ কোটার দৃশ্য স্থান পেয়েছে। নদ-নদী বহুল খালবিলাকীর্ণ বাংলাদেশে মৎস্য যে একটি সামাজিক সম্পদ প্রাচীন কালেও ছিল, তাও সহজে অনুমেয়।

---

[৩] Zulekha Haque, *Terracotta Decoration of Late Medieval Bengal Portrayal of a Society*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1980), p. 91.

[৪] শাহানারা হোসেন 'বাংলার ঐতিহাসিক পরিচয়' আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী , ১৯৮৭), পৃ. ৬১।

[৫] আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে নৌকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[৬] প্রাচীন কালে মানুষের যাতায়াত, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নৌকার প্রয়োজন ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। কারণ নদীমাতৃক এদেশে নৌকাই ছিল যাতায়াত ও মাল পরিবহনের প্রধান বাহক। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে নৌযুদ্ধের বর্ণনাও আছে।[৭] দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে অনেকগুলো পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে একটিতে দেখা যাচ্ছে নৌবিহারের দৃশ্য।[৮] পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুবৃত্তিতে লক্ষ করা যায় যে, রাম তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে নৌ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। 'রাম' নৌকার মাঝামাঝি বসে হুক্কা খাচ্ছেন। তাঁর ডান হাতে হুক্কার নল ধরা। রামের হুক্কা খাওয়ার আয়োজন নিয়ে একজনকে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। দুই পাশে নারী-পুরুষ গান-বাজনা এবং নৃত্য প্রদর্শন করছে। নৌকার দুই ধারে মাঝি মাল্লারা বৈঠা হাতে নৌকা বাইছেন। অনুরূপ পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকেও দুই দাঁড়ির মাল্লার দৃশ্য ফুটে উঠেছে।[৯] আমাদের এদেশে নৌকা এবং মানুষের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, মৃৎফলকের এসব দৃশ্য থেকে তা আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কবি কালিদাসের রচনায় নৌযুদ্ধের লীলাক্ষেত্র হিসেবে বঙ্গদেশকেই নির্দেশ করা হয়েছে। বাঙালি জীবনের সঙ্গে নৌকার আত্মিক যোগাযোগের কথা ধরা পরেছে চর্যাগীতিতেও। নৌকা, নদী, মাঝি, নৌকার বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে রূপক সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায় বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের নানা রচনায়।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্রভূমির বিলে ঝিলে প্রাপ্ত পদ্মফুল, লতাপাতা এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক উপাদান বারবার নকশা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে লোকজ শিল্পকলায়। অনুরূপ মটিফ ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটির ফলকে। অনুরূপ প্রাচীন সমাজে নর-নারীরা যে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং শরীরের নানা অঙ্গে অলংকার ব্যবহার করত, সেই সমাজ সংস্কারের নানা চালচিত্র, গৃহপালিত পশু-পাখি এসবের দৃশ্য পোড়ামাটির ফলকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন তৎকালীন শিল্পীরা। বরেন্দ্র অঞ্চলে অনেকগুলো মসজিদের দেয়ালের ভিতরে ও বাইরে পোড়ামাটির ফলকে লতা-পাতা-ফুল, নানা রকম কারুকার্যের অতুলনীয় নিদর্শন দেখা যায়, যা পোড়ামাটির ফলক শিল্পের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ডেভিড ম্যাকাচ্চন্ উল্লেখ করেছেন, 'মধ্য যুগের শেষের দিকে, মুসলমানদের বিজয়ের পরে বাংলার শিল্পীরা স্থাপত্যের আকৃতি ও গঠন বৈচিত্র্যে, বিশেষ করে পোড়ামাটির শিল্পে যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, তা এই উপমহাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না।'[১০]

এদেশের পরিচিত ফল 'পনস' অর্থাৎ কাঁঠালের ইঙ্গিত পাওয়া যায় চৈনিক পর্যটক য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে।[১১] তাঁর বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় পুণ্ড্রবর্ধনে, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এ ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মাত এবং তার চাহিদাও ছিল বেশ। অন্যদিকে, কলা আদি অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীরই অবদান। পোড়ামাটির ফলকে কলাগাছের দৃশ্য দেখে মনে হয় তৎকালীন সময়ে পূজা পার্বণ বা মঙ্গলযাত্রা অথবা বিয়েতে কলা ও কলা গাছের প্রচলন ছিল। এখনও অজ পাড়াগাঁয় বিয়ের অনুষ্ঠানে কলাগাছ দিয়ে গেট বানানো হয়। কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে মাছ ধরার প্রচলন সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই এসেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে সব ধরনের কৃষিজাত দ্রব্যের চাষাবাদ হতো: ধান, আম, মহুয়া, কাঁঠাল, ডালিম, ইক্ষু, খেজুর, পান-সুপারি নারকেল প্রভৃতি। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, "উত্তর রাঢ়ে বরেন্দ্রীতে গুবাক ও নারিকেলের উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ নাই; শুধু যে লিপিগুলিতেই আছে তাহা নয়, রামচরিতেও আছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ আছে যে, বরেন্দ্রীর মাটি নারিকেল উৎপাদনের পক্ষে খুব উপযুক্ত"।[১২] অরণ্যময় আর্দ্র আবহাওয়ার গ্রীষ্মপ্রধান এই অঞ্চলে জীবজন্তু পশু-পাখির লীলা ভূমি এই বরেন্দ্র

---

[৬] সাইফুদ্দীন চৌধুরী , 'পোড়ামাটির ফলকে আবহমান কালের বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৮।

[৭] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব* (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ১৫২।

[৮] Nazimuddin Ahmed, *Epic Stories in Terracotta* (Dhaka: The University Press Limited, 1990) Plate No- 32 (b).

[৯] K.N. Dikshit, *Excavation at Paharpur, MASI-55 (Mecoirs of The Archaeological Survey of India)* (Delhi: Manager of Publications, 1938) Plate No. XL111(a)

[১০] ডেভিড ম্য কাচ্চন, 'পূর্ব পাকিস্তানের মন্দির', আবদুল হালিম ও আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ সম্পাদিত- *ইতিহাস* (ঢাকা: ইতিহাস পরিষদ, পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৫), পৃ. ২৩৯।

[১১] Thomas Watters. *On Yuen Chwang's Travels in India*. Vol-11 edited T.W. Rhys Davids (London, 1905), Plate No- 184-85.

[১২] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত ,পৃ. ১৪৩।

অঞ্চল, বিশেষ করে পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড়ে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে হাতি, বাঘ, হরিণ, মহিষ, সর্প, শূকর, উট, ঘোড়া, বানর, ময়ূর, কাক, রাজহাঁস, কোকিল, কপোত ইত্যাদির চিত্র লক্ষণীয়। সাধারণ অথচ দক্ষ মৃৎশিল্পীরা অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে মৃন্ময় উপাদানের মাধ্যমে এসব দৃশ্য।

বরেন্দ্রের পুণ্যভূমিতে বসবাসকারী বাংলার এই আদিবাসী, শতাব্দীর পর শতাব্দীর পরিণতিতে এসে কৌম সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উৎস পর্বে এই আদিবাসীরা ছিল নিতান্তই বর্বর শ্রেণীর। জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা পরবর্তী কালে সভ্যতার আলোকময় পরিবেশের সাহচর্যে এসেছে। পরস্পর সম্পত্তি চেতনা এবং সহাবস্থানের ভিত্তিই কৌম জীবন গড়ে লোক সমাজের গোড়া পত্তন করেছিল।[১৩] এখানকার সমাজ জীবন ও লোকসংস্কৃতিতে অস্ট্রিকদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। অনার্যদের জীবন-জীবিকা ছিল মূলত কৃষি ও শিকার। নিষাদ, শবররা শিকারোপজীবী ছিল।[১৪] পশু শিকারি এবং মৎস্য শিকারি সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সাপ খেলাকেও পেশা হিসাবে নিয়েছিল। সংস্কৃত কবি উমাপতিধর তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে সাপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার চিত্ররূপ এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে দৃশ্যমান। লোক সমাজে পূজাচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ স্থলেই আদি চিন্তার উর্বরতাবাদ ও প্রজনন ক্রিয়ার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এ ধারণারই অনুবৃত্তি সূত্রে বলা যায় 'মনসা' অনার্যদেবী: দ্রাবিড় ভাষার 'মঞ্চা' হতে মনসা নামের উৎপত্তি। বৈদিক সাহিত্যে নাগদের অনার্য বলা হয়েছে। নাগদের বাস্তব দেবতা মনসা।[১৫] সুপ্রাচীন কালে সমাজের মানুষেরা প্রথমে সাপকে পূজা করত, সাপের প্রতীক হিসেবে ঘটপূজা এবং পরবর্তী কালে মেয়েদেরকে সাপের প্রতীক হিসেবে সাপের ফণা মাথায় দেওয়া অবস্থায় নারী মূর্তি তৈরি করে তাকে পূজা করত। বরেন্দ্র ভূমিতে প্রাচীন কালে সর্বত্রই মনসা দেবীর পূজা হতো। সর্পদেবী রূপে মনসা মূর্তি আবিস্কৃত ৫০টির মধ্যে ৪০টি মনসা মূর্তি বরেন্দ্র অঞ্চলে এবং ১০টি রাঢ় অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১৬] এভাবেই মনসা পূজার প্রচলন হয়েছে। যেসব রমণীর সন্তান হতো না তারা সন্তান কামনায় ঐ মনসা দেবীর পূজা করত। তাদের ধারণা ছিল যে, সাপের অনেক বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাই উর্বরতা শক্তির প্রতীক হিসেবে এবং সমাজে বংশ বিস্তারের আশায় তারা মনসাদেবীর পূজা করতো। পাথরে নির্মিত মনসা দেবীর মূর্তি ছাড়াও মহাস্থানগড়ে যাদুঘরে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির তৈরি মনসা দেবীর ভাস্কর্য, যা মঙ্গলকোট নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং গুপ্ত আমলের। একটি মনসাদেবী 'নারীমাথা', মাথায় নাগিনীর উদ্যত ফণা উৎকীর্ণ দেখা যায়। দেবীর চোখ দুটো টানা টানা, উন্নত নাক, ভ্রুযুগল বাঁকা, সরু ঠোঁট, মুখে মৃদু হাসি এবং মুখের গঠন সুন্দর। (চিত্র নং ৩)। এসব পোড়ামটির তৈরি মনসা দেবী উন্নত মানের ভাস্কর্য বলা চলে।

পুজার সময় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গ, ঢাক-ঢোল বীণা, বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ করত। কাসার ঘণ্টা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে ঢাক-ঢোল বাজানোর দৃশ্য। একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ বসা অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুটি ঢোল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বাজাচ্ছে। মাথায় টুপি বা ঐ জাতীয় কিছু একটা পরিধেয় অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আরেকটি ফলকে দেখতে পাচ্ছি একজন পুরুষ বীণাবাদক নৃত্যের তালে তালে বীণা বাজাচ্ছে। তার হাতে, গলায়, কানে অলংকার পরিহিত। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও অত্যন্ত চমৎকার (চিত্র নং ৪)।

যে সমস্ত শিল্পী এখানকার প্রকৃতিকে সুন্দর এবং নিপুণভাবে পোড়ামাটির ভাস্কর্যে চিত্রিত করেছে, সত্যিকার অর্থে তাদের সমাজ সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা খুব একটা উঁচু শ্রেণীর ছিল না। এরা অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত এই মৃন্ময় শিল্পে প্রকৃতি মানুষ এবং জীব-জন্তুর জীবনালেখ্য শিল্পায়নে শিল্পীদের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বলাই বাহুল্য যে, পোড়ামাটির শিল্পকলার মতো শিল্পসুষমা এই অঞ্চলের আর কোনো শিল্প মাধ্যমে পরিদৃশ্যমান নয়।

---

[১৩] সাইফুদ্দীন চৌধুরী, অষ্ট্রাল সংস্কৃতির শিল্পে লৌকিক উপাদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[১৪] ওয়াকিল আহমদ, 'বাঙলার লোক সংস্কৃতি উৎস ও ঐতিহ্য' মনসুর মুসা সম্পাদিত *বাংলাদেশ* (ঢাকা: ১৯৭৪), পৃ. ২৬১-৬২।

[১৫] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

[১৬] এনামুল হক 'বাংলাদেশে মনসামূর্তি' *ইতিহাস* , বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, আবু মহামেদ ও মমতাজুর রহমান তরফদার সম্পাদিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ১৯৭৭ ৯ম বর্ষ, ১ম- ৩য় সংখ্যা বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮২), পৃ. ১৩১।

পরিশিষ্ট

চিত্র ১

চিত্র ২

চিত্র ৩

চিত্র ৪

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতি এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ

ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু*

Abstract: The First World countries and their allies (World Bank, IMF, ADB and UN Organizations etc.) divide the world under the heading of First World, Second World and Third World. But there is no objective or universal base for this classification. The main objective of the present paper is to unveil the causes and interests of the developed capitalist world behind the introduction of Third World concept. Moreover, the background of the emergence of this concept and its geo-political strategies and applications are analysed here. At the same time the relevance and effectiveness of the Third World concept in the development-underdevelopment process is examined here with special reference to Bangladesh.

১. ভূমিকা

১৯৫০-এর দশকে সমাজতত্ত্ব যখন সর্বপ্রথম অনুন্নত বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখন সাধারণভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জাতিসমূহ (যাদের তৃতীয় বিশ্ব বলে সম্বোধন করা হয়) পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের ন্যায় হুবহু সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ধারাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি রেডিক্যাল ও মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয় এ কারণে যে, পূর্ববর্তী ধারণায় উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহের সমাজ পরিবর্তনে যে ভূমিকা রাখছে তা বিবেচনা করা হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের সমাজব্যবস্থায় তথা শ্রেণীকাঠামোতে উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে প্রভাব তা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সমর্থনপুষ্ট এবং স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার প্রভাব ও বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় চর্চা করা অসম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে উন্নয়নের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে দরিদ্র বা অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহকে বোঝানোর জন্য তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টি অতি-সাধারণীকরণের শিকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়েই যেসব রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করেছে তাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে অনুন্নত বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়, তা যথেষ্ট উপযোগী প্রমাণিত হয়নি, অধিকন্তু একরৈখিক ও অতিসাধারণীকরণের প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবতাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মার্কসীয়, মার্কসবাদী ও নব্য মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণসমূহ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তবে এসব তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উন্নয়নের মতাদর্শগত কৌশল অপেক্ষা বাস্তব, ঐতিহাসিক, স্থানিক ও বৈশ্বিক প্রভাবসমূহের বিশ্লেষণই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দরিদ্র দেশসমূহের অনুন্নয়নের ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিকতাবাদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, শোষণ প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিগত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের স্বার্থেই তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্তার, বিশ্বায়ন, গ্লোবাল ভিলেজ, মুক্তবাজার অর্থনীতি ইত্যাদি বহুবিধ ধারণা ও প্রত্যয়ের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অবস্থান এবং বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ.-সহ

*সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতা সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী জাতিগত অনগ্রসরতা, বৈষম্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পাঁচ দশকের অধিক সময়ের সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়। বর্তমান শতাব্দীর উন্নয়ন চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই এই "তৃতীয় বিশ্ব" প্রত্যয়টির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

২. তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয়

"তৃতীয় বিশ্ব" একটি বহুল ব্যবহৃত ভূ-রাজনৈতিক প্রত্যয়। মূলত অনুন্নত (underdeveloped), অসম উন্নত (mis-developed), উন্নয়নশীল (developing), তথা সকল দরিদ্র রাষ্ট্রকে বোঝাতে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির মাত্রা ইত্যাদি বিষয় খুব কমই বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টি একটি অতি সাধারণীকৃত প্রত্যয়। তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ফরাসি জনবিজ্ঞানী Alfred Sauvy ১৯৫২ সালে তাঁর *'Three Worlds, One Earth'* প্রবন্ধে ব্যবহার করেন।[১] তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টির উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রাচীন ফ্রান্সের বহির্ভূত শ্রেণী বা প্রাচীন ভারতের অস্পৃশ্য জাতিবর্ণে অবস্থানের সাথে আধুনিক বিশ্বের অনুন্নত দেশের অবস্থানকে তুলনীয় করে তোলে। এতে স্বাভাবিকভাবেই অনুন্নয়নের সমস্যাটি রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়। "তৃতীয় বিশ্ব" প্রত্যয়টি অনুন্নত দেশসমূহকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে দুটি পরাশক্তিকে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) কেন্দ্র করে উদ্ভূত দুটি ব্লকের সাথে সম্পর্কিত করে ভূ-রাজনৈতিকভাবে বিন্যস্ত করেছে। এই দুই ব্লকের একদিকে ছিল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ এবং অন্যদিকে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। এই দুই বিশ্বের প্রান্তে অবস্থান রয়েছে তৃতীয় বিশ্বের যারা কখনোই সফলভাবে আলাদা কোনো ব্লক তৈরি করতে পারেনি।

কম্যুনিজমের পতন পরবর্তী বিশ্বে "তৃতীয় বিশ্ব" প্রত্যয়টি এখনো অর্থবহ। **প্রথমত** তৃতীয় বিশ্বের বিশিষ্টতা তথা স্বাতন্ত্র্য বা ব্যতিক্রম (exclusion), নির্ভরশীলতা (dependence) ও শোষণ (exploitation) এখনো বিদ্যমান এবং তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টির উদ্ভবকেন্দ্রিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখনো অনুন্ন দেশসমূহের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। **দ্বিতীয়ত** সাবেক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অধীনস্ত পূর্ব ইউরোপীয় বেশির ভাগ রাষ্ট্রই জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসিয়াল পরিচিতিতে আলাদা ক্যাটাগরি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলো এখনো দ্বিতীয় বিশ্ব হিসেবে বিবেচিত কারণ প্রথম বিশ্ব তাদেরকে সমপর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করছে এবং তারা নিজেরা (দ্বিতীয় বিশ্ব) তৃতীয় বিশ্বের কলঙ্ক গায়ে মাখতে আগ্রহী নয়।

মূলত ঔপনিবেশিক শক্তিই বর্তমান বিশ্বের বিভক্তির (প্রথম বিশ্ব, দ্বিতীয় বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্ব) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। প্রাচীন মহান সভ্যতাসমূহ (মিশরীয়, মেসোপটেমিয়ান, সিন্ধু, মায়া বা চীনা সভ্যতা) যে ভৌগোলিক এলাকাসমূহে জন্ম নিয়েছিল সেই অঞ্চলসমূহই আজ পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল তথা তৃতীয় বিশ্ব নামে অভিহিত। যদিও উন্নয়ন প্রত্যয়টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রত্যয় তবুও সমগ্র মানব ইতিহাসই হচ্ছে উন্নয়নের ইতিহাস। অন্যদিকে অনুন্নয়ন একটি আপেক্ষিক প্রত্যয় এবং এটি কোনোভাবেই অ-উন্নয়নকে বোঝায় না। অনুন্নত দেশসমূহ অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনুন্নত, কিন্তু কোনোভাবেই অ-উন্নত নয় এবং এই অনুন্নয়ন প্রক্রিয়া একদিনে শুরু হয়নি। মূলত উপনিবেশ স্থাপনের পর হতেই উপনিবেশসমূহের অনুন্নয়ন শুরু। এ কারণে একজন ক্যারিবীয় ইতিহাসবিদ আফ্রিকান ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর গ্রন্থের নাম দেন *How Europe Underdeveloped Africa* হামজা আলাভীর[২] মতে, তৃতীয় বিশ্ব 'Colonial Mode of Production' দ্বারা নির্ধারিত। যদিও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে স্বাধীনতা অর্জন করে এসব দেশ ঔপনিবেশিকতার প্রত্যক্ষ পক্ষপুট হতে মুক্তি অর্জন করে, কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে খুব বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এসব রাষ্ট্রের চরম বাস্তবতা হচ্ছে "নব্য ঔপনিবেশিক" অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা। এভাবে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহকে নতুন পরিচিতি গ্রহণ করতে হয়– "তৃতীয় বিশ্ব"। Peter Worsley এর ভাষায়:

> 'Development' only became a distinct field of study after 1945, with the emergence of an ever-increasing number of 'new nations' which soon came to constitute a 'Third World' alongside the First and Second.[3]

"একটি আত্মসচেতন রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয় ছিল শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়ার সর্বশেষ উৎপাদন, যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অর্ধ সহস্রাব্দ কাল পূর্বে"– পিটার ওর্সলে এভাবেই তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুদয়কে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ধারায় ব্যাখ্যা করেন।[৪] তৃতীয় বিশ্বকে আঁদ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক দেখেছেন লাতিন আমেরিকার দৃষ্টিতে, সামির আমিন দেখেছেন মুসলিম আফ্রিকার দৃষ্টিতে এবং অনুপম সেন দেখেছেন ঔপনিবেশিকতার বেড়াজালে শোষিত ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোতে তথা শিল্পোন্নত প্রথম বিশ্বের কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়ন অত্যন্ত জরুরি।

৩. তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতি

আপাত দৃষ্টিতে "তৃতীয় বিশ্ব" প্রত্যয়টিকে একটি নির্দোষ প্রত্যয় বলে মনে হলেও এর ভূ-রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেক গভীর ও ব্যাপক। ১৯৯৭ সনে বিশ্বে একটি সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে সম্পর্কিত ১৯০টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[৫] তন্মধ্যে ইউএনডিপি (United Nations Development Programme) তার মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে (১৯৯৭) বিশ্বের ১৭৯টি দেশের একটি বাস্তব তালিকা প্রণয়ন করে। যদিও কোনো কোনো সূচকে ২২৫টি রাষ্ট্রের কথা বলা হয়, তবুও মোনাকো, লেইসটেনস্টেন, ভ্যাটিকান সিটি, মাল্টা, কিরিবাতি, নাইরো ইত্যাদি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র ও কথিত সার্বভৌম বা পরাধীন রাষ্ট্রসমূহকে আমাদের বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই ১৭৯টি তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছে ২৯টি OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)-ভুক্ত রাষ্ট্র। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ২৩টি সাবেক শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক ব্লকের রাষ্ট্র তথা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ। এর বাইরে ১২৬টি অনুন্নত রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে তৃতীয় বৃত্ত, যা সহজ ভাষায় তৃতীয় বিশ্ব। একটি রাষ্ট্র তাইওয়ানের সার্বভৌমত্ব পরিচিতির কারণে তাকে আলাদাভাবে হিসেব করা হয়।[৬]

এই 'তৃতীয় বিশ্ব' প্রত্যয়টি ব্যবহারের পশ্চাতে রয়েছে জটিল ভূ-রাজনীতি। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই একটি নির্ধারিত র‍্যাংকিং দেওয়া হয়। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল হিসেবে জাতিসংঘ বা প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক শ্রেণীবিন্যস্ত কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই এককভাবে এই ক্যাটাগরি অতিক্রমের সুযোগ নেই। অর্থ্যাৎ আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির জটিল চক্রই স্থির করছে কোনো রাষ্ট্র কিভাবে স্বীকৃত বা শ্রেণীবিন্যস্ত হবে। বিগত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়নের ভূ-রাজনীতিই এই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেছে। Jacques B. Gelinas-এর ব্যাখ্যায় "Among the countries classified as underdeveloped fifty or thirty years ago, not one has succeeded in ridding itself of this label."[৭] বিগত অর্ধশতকের অধিক কাল ধরে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে আজকের অনুন্নয়ন মানে চিরন্তন অনুন্নয়ন। বিশ্বব্যাপী দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সাহায্য কর্মসূচি, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ঋণ, হাজার হাজার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শদাতাদের কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও নিখুঁততম উন্নয়ন কৌশল অবলম্বনের পরও বিগত অর্ধশতকের বেশি সময়ে অনুন্নত দেশসমূহ নিজেদেরকে 'তৃতীয় বিশ্ব' পরিচিতি হতে মুক্ত করতে পারেনি। বিশ্ব ভূ-রাজনীতির এই বাস্তবতা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে Schumpeter-এর বিশ্লেষণে। উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে সেখানে যদি আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা সম্ভব হয় তাহলেও আরো অতিরিক্ত ২০০ বছর লাগবে সমগ্র বিশ্বের উন্নয়নের জন্য।[৮] অর্থ্যাৎ তৃতীয় বিশ্বের কলঙ্কচিহ্ন মুছতে লাগবে অতিরিক্ত দুইশত বছর সময়। বর্তমান বিশ্ব ভূ-রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে Wallerstein তাই বলেছেন "National development is to-day an illusion, whatever the method advocated and used."[9]

"তৃতীয় বিশ্ব" পরিচিতির স্থায়িত্বের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুগত নীতিমালা অত্যন্ত সীমিত পরিসরে অনুসরণ করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিতির বা ক্যাটাগরি নির্ধারণের ভিত্তি হচ্ছে ভূ-রাজনীতি, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাথাপিছু জিএনপি ৮০৩০ ডলার (১৯৯৭ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী) এবং অন্য অনেক দেশ হতে উন্নত ও ব্যাপক শিল্পায়নের মাত্রা নিয়ে এখনো আর্জেন্টিনা অনুন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হচ্ছে এবং আরো দীর্ঘদিন একইভাবে পরিচিত হবে। অন্যদিকে পর্তুগাল মাথাপিছু জিএনপি'র

দিক দিয়ে অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ হতে পিছিয়ে থেকেও (৯৭৪০ ডলার) উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে যা নিশ্চিতভাবে পর্তুগালকে আরো উন্নত হতে সাহায্য করছে। তুরস্কের মাথাপিছু জিএনপি মাত্র ২৭৮০ ডলার কিন্তু ১ম বিশ্বের কথিত ২৯টি ধনী রাষ্ট্রের ক্লাবের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য সে অর্জন করেছে। ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক কারণসমূহ এই ক্রমোচ্চ বিন্যাসের (র‍্যাংকিং) ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়টি শুধুমাত্র সরলীকৃত আর্থ-সামাজিক বিষয় নয় বরং তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচ্য বিষয়। বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপির ১৯৯৭ সনের তথ্য অনুযায়ী ১৭৯টি রাষ্ট্রকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত বা শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়।[১০]

প্রথমচক্র: এই চক্রের রাষ্ট্রসমূহ ধনী জাতিসমূহের ক্লাব হিসেবে পরিচিত। পুঁজিবাদী বিশ্বের শিল্পোন্নত ২৯টি রাষ্ট্র 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা' (OECD) নামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধনীজাতি সমূহের এই ক্লাব গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে ওইসিডি অনন্য। বিশ্বব্যাংক যেমন সকল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানায়, বিপরীতে ওইসিডি সকলের অংশগ্রহণকে অনুমোদন করে না। ফলে এখানে নতুন জাতিসমূহকে গ্রহণ করা হয় কো-অপটেশান এর মাধ্যমে, ঐসকল দেশের জাতীয় আয়ের বস্তুনিষ্ঠ নীতিমালার ভিত্তিতে নয়। তাই এটা অনেকটা প্রাইভেট ক্লাবের চরিত্র অর্জন করেছে। এই নির্বাচিত ক্লাব-এর কেন্দ্রে রয়েছে মূল উত্তর আটল্যান্টিক জোটের ২০ সদস্য এবং পরবর্তীতে আরো চারটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্র (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড) এখানে যোগ দেয়। অর্থাৎ এই নির্বাচিত ক্লাবের কেন্দ্রে রয়েছে ২৪টি রাষ্ট্র। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয় বরং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামরিক স্বার্থ বিবেচনায় এদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে চয়ন করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের মে মাসে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র মেক্সিকোকে এই ক্লাবের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। এসময়ে NAFTA (North American Free Trade Agreement)-এর প্রতি শর্তহীন সমর্থন প্রদানের কারণে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট কার্লোস সেলিনাস ডি গোরটারি (Carlos Salinas de Gortari) মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কর্তৃক এই পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে মেক্সিকো তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহকে উন্নত বিশ্বে পদোন্নতি পাওয়ার পথ প্রদর্শন করে কৃতার্থ করেছে।[১১] পরবর্তী কালে এই পথ ধরে তিনটি প্রাক্তন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি এবং পোল্যান্ড ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে ওইসিডি-র সদস্যপদ অর্জন করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ কোরিয়াকে এই ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অত্যন্ত শিল্পোন্নত রাষ্ট্র ইসরায়েল এই ক্লাবের বাইরে থাকলেও Proxy-র মাধ্যমে ক্লাবের বিবিধ কাজে অংশগ্রহণ করে।[১২] ইসরায়েলের এই ক্লাবের সদস্য না হয়েও Proxy অংশগ্রহণ এবং নিজেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচয় দেওয়াও একটা ভূ-রাজনৈতিক কৌশল। ইসরায়েল নিজেকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্যের কিছু সুযোগ প্রাপ্তির অধিকার অর্জন করেছে এবং একইভাবে তিনটি বিশ্বের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) সর্বোচ্চ সুবিধা নিচ্ছে। ইসরায়েলকে অন্তর্ভুক্ত করলে প্রথম চক্রের রাষ্ট্র হয় ৩০টি। এখানে উল্লেখ্য যে তৃতীয় বিশ্বের দুটি নতুন সদস্য (মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়া) ওইসিডি-র অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের অফিসিয়াল মর্যাদা এখনো অনুন্নত রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় চক্র: এই চক্রের রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ এখনো জাতিসংঘের তালিকায় শিল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। প্রায়শ জিএনপি-র পতন সত্ত্বেও এদের কোনো রাষ্ট্রকেই অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বলে গণ্য করা হয় না। চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডকে ওইসিডি'র অন্তর্ভুক্ত ধরলে দ্বিতীয় চক্রের রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩টি।

তৃতীয় চক্র: এই চক্রের রাষ্ট্রসমূহ তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে পরিচিত। তৃতীয় বিশ্বের ১২৬টি রাষ্ট্রকে চারটি উপবিভাগে বিন্যস্ত করা যায়। এই উপবিভাগের ক্ষেত্রে শুধু মাথাপিছু জিএনপিই নয় বরং বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রসমূহ কিভাবে অর্থনৈতিক প্রযুক্তিগত ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে উন্নত বিশ্বের পদানত হয়ে থাকছে তা বিবেচনা করা হয়।[১৩]

ক) আটটি উচ্চ আয়ের তেল রপ্তানিকারক দেশ: এই রাষ্ট্রসমূহের মাথাপিছু জিএনপি ১০,৮৭৫ ডলার যা শিল্পোন্নত দেশসমূহের সমতুল্য । কিন্তু এসব দেশের অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে মাত্র একটি রপ্তানি পণ্যের (পেট্রোলিয়াম) উপর নির্ভরশীল।

খ) চারটি প্রকৃত উন্নয়নশীল রাষ্ট্র: চীন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান এই চারটি রাষ্ট্র প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। যদিও রাষ্ট্র চারটির অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি পরস্পর হতে পৃথক তবুও প্রচুর শ্রমশক্তি, নেতৃত্বে দূরদর্শিতা এবং স্বল্প ঋণগ্রস্ততা এসব রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে। দৃশ্যত স্বল্প মাথাপিছু জিএনপি হওয়া সত্ত্বেও চীনকে এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ নিচু ঋণের হার (জিএনপি'র ১৯ শতাংশ), মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উঁচু হার এবং সফল ভূমি সংস্কার প্রকল্প। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দিক দিয়ে চীন বিশ্বে প্রথম (জিএনপি-র ৪৪ শতাংশ)।[১৪] অনুন্নত এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে সিঙ্গাপুর উন্নত পুঁজিবাদের প্রতিভূ। এই নগর রাষ্ট্র মূলত একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। দক্ষিণ কোরিয়া সম্প্রতি ওইসিডি-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাইওয়ানের সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সকল যোগ্যতা থাকার পরও জাতিসংঘের স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। অফিসিয়ালি চীনের এই প্রদেশটি ভূ-রাজনৈতিক কারণে স্বীকৃতি না পেলেও ঈর্ষণীয় সঞ্চয়, স্বল্প ঋণভার এবং সফল ভূমি সংস্কারের কারণে দ্রুত উন্নয়ন করছে।

(গ) অসম উন্নয়নের রাষ্ট্রসমূহ: এই গ্রুপের ৬৯টি রাষ্ট্র অসম ও বিকৃত উন্নয়নের সকল লক্ষণই ধারণ করছে। এই লক্ষণসমূহ হচ্ছে– একটি বিদেশমুখী বা বিদেশ কেন্দ্রিক এবং বিচ্যুত (ডিসলোকেটেড) অর্থনীতি, দ্বৈত বা বিভক্ত সমাজ, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যাপক ঋণগ্রস্ততা, যা সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি সঞ্চয়নের সকল সম্ভাবনাকে তিরোহিত করছে। এমনকি এই গ্রুপের NIC (Newly Industrialized Countries) সমূহও সুস্থ সমন্বিত উন্নয়নের জন্য এখনো বিদেশি বিনিয়োগের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

(ঘ) স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ: LDC (Least Developed Countries)-এর তালিকাটি ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ প্রণয়ন করেছিল সে সকল রাষ্ট্রের জন্য যেখানে খুব নিচুঁ হারের মাথাপিছু জিএনপি (৭২৫ ডলারের কম), সাক্ষরতার নিম্ন হার এবং শিল্পোয়নের নিম্ন হার (জিএনপি'র ১০%-এর কম) কার্যকর রয়েছে। বিশ্বে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের সংখ্যা (এলডিসি) ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৭১ সালে এলডিসি ছিল ২৫, ১৯৮১ তে ৩১, ১৯৯৩-তে ৪৩ এবং ১৯৯৭তে ৪৬টি।[১৫] এই রাষ্ট্রসমূহ উন্নয়ন সাহায্য ও সকল ধরনের বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের প্রধান দাবিদার। বাংলাদেশ অন্যতম স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব ব্যবস্থায় তৃতীয় বিশ্বকে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ বস্তুগত নীতিমালা বা উপাদান ভিত্তিক তথা মাথাপিছু জিএনপি-ভিত্তিক নয়। বরং এখানে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নত ধনী দেশসমূহের স্বার্থ এবং রাজনৈতিক বিবেচনাই অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত সাহায্য/ঋণের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের উন্নয়ন অলীক স্বপ্ন, যার প্রমাণ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ঋণভারে জর্জরিত বিভিন্ন দেশ। ১৯৮৭ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে ঋণ পরিশোধ বাবদ মোট ৩০ বিলিয়ন বা ৩ হাজার কোটি ডলারের সম্পদ স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ উন্নয়নকামী দেশসমূহ বিভিন্ন উন্নত দেশ থেকে যে সম্পদ এইবছর ঋণ হিসেবে পেয়েছে সেই পরিমাণ সম্পদ এবং আরো অতিরিক্ত ৩০ বিলিয়ন ডলার তৃতীয় বিশ্ব থেকে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে চলে গেছে।[১৬] কেবল ঋণের সুদ আসল পারিশোধ করতেই নয়, নানা দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে তৃতীয় বিশ্ব থেকে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সম্পদ পাচার হয়। আর এই দৃশ্য-অদৃশ্য পথই হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতির বাস্তবতা। বিশ্বপুঁজির শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিশ্বে দৈত্যাকৃতির বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বকে তাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। আজকের বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের পুঁজি স্থানান্তর হয় বিভিন্ন প্রয়োজনে ও কারণে।[১৭] তৃতীয় বিশ্বের ভূ-রাজনীতির চরম বাস্তবতা হচ্ছে এই যে এখনো তৃতীয় বিশ্ব হতে উন্নত বিশ্বে সম্পদ স্থানান্তরিত হওয়া অব্যাহত রয়েছে, যদিও বাহ্যত তৃতীয় বিশ্বকে প্রথম বিশ্ব উন্নত হতে সাহায্য করছে বলে পরিদৃষ্ট হয়। সম্পদের অসম বণ্টন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে মোট ২২৫ জন ধনকুবেরের সম্পদের মূল্য সারা পৃথিবীর ৪৭ শতাংশ লোকের অর্থ্যাৎ প্রায় ২৮০ কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের বার্ষিক আয়ের সমান।[১৮]

৪. অনুন্নয়নের মাত্রা নিরূপণ: আধুনিকায়ন প্যারাডাইম

জাতিসংঘ এবং উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা সমূহের ন্যায় আমরাও সাধারণত কিছু লক্ষণের মাধ্যমে অনুন্নয়নকে চিহ্নিত করি। যেমন– অপুষ্টি, শিশু মৃত্যুহার, অশিক্ষা, মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনপি) ঋণগ্রস্ততার হার

ইত্যাদি। কিন্তু এই নির্ণায়কসমূহের প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এগুলো শুধুমাত্র গড় এবং স্বাভাবিকভাবেই এ সকল দেশের বিদ্যমান অনেক অসমাঞ্জস্যতা এই নির্ণায়ক সমূহের মাধ্যমে অপ্রকাশিত থেকে যায়। এই নির্ণায়ক সমূহ এসব দেশের সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সম্পদের পাহাড়কে আড়াল করে রাখে। অনেক ক্ষেত্রে এসব সম্পদশালী লোকেরা শিল্পোন্নত দেশ সমূহের সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী শ্রেণীর চেয়েও ভালো অবস্থানে থাকে। সবচেয়ে পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত নির্ণায়কটি হচ্ছে মাথাপিছু জিএনপি বা গড় জাতীয় আয়। কোনো দেশের জিএনপি নির্ণয় করা হয় কোনো নির্ধারিত বছরের বাজার মূল্যে উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবাকে যোগ করে। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনপি ৩১৪ মার্কিন ডলার[১৯] (১৯৯৯-২০০০সাল) বলতে বোঝায়, যদি বাংলাদেশের ১৯৯৯-২০০০ সালের জিএনপিকে (মোট জাতীয় উৎপাদন) দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হয় তবে প্রত্যেক নাগরিক ৩১৪ ডলার করে পাবে। এখানে দুই ধরনের মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রথমত জাতীয় আয় কখনোই সমানভাগে বিভক্ত হয় না এবং যদি হতো তাহলে নিশ্চয় ফলাফল এমন হতো না। দ্বিতীয়ত এখানে একদিকে দূষণ ও অতিমাত্রায় শোষণের ফলে স্থায়ী সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি ও মূল্য হ্রাস ঘটে তা বিবেচনা করা হয় না; অন্যদিকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং প্রাকৃতিক ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়সমূহ রেকর্ড করা হয়, যা জিএনপিকে প্রভাবিত করে। যদি ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সুহার্তো (যাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস (যাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার), জায়ায়ের প্রেসিডেন্ট মার্শাল মবুতু (যাঁর সম্পদের পরিমাণ ৫-৮ বিলিয়ন ডলার)[২০] বা হাইতির প্রেসিডেন্ট ডুভেলিয়ার প্রমুখের রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের ধারাকে বন্ধ করা যেত তবে এসকল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জিএনপি নিশ্চয়ই ভিন্ন হতো। তৃতীয়ত জিএনপি হতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না কারণ অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ চাষী ও প্রান্তিক নগরবাসী যে উৎপাদন ও ভোগ করে তা অফিসিয়াল বাজার অর্থনীতিতে বিবেচনা করা হয় না।

যাহোক অনুন্নয়ন প্রত্যয়টি এমন ধারণা দেয় যে এটা একটা মাত্রাগত সাধারণ বিষয় এবং পরিমাণগত উপাদানের মাধ্যমে এই মাত্রা নির্ণয়যোগ্য। এ বিষয়টি মনে রেখেই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা অনুন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের বর্ণনামূলক ও সংখ্যাগত পরিমাপের মাধ্যমে চিহ্নিত করায় একটি ধারণা জন্ম নেয় যে অনুন্নত দেশসমূহ হচ্ছে সাধারণ অর্থে পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্র। সত্যিকার অর্থে, অনুন্নয়ন প্রত্যয়টি চয়নের পূর্বে পাশ্চাত্য এভাবেই অনুন্নত রাষ্ট্র সমূহকে চিহ্নিত করত অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রসমূহ ছিল সময়, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে পেছনের সারিতে। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের তাত্ত্বিকরা ধারণা করেছেন যে, উন্নত দেশসমূহের প্রযুক্তি, জ্ঞান, প্রতিষ্ঠান ও পরিকল্পনা অনুন্নত দেশসমূহে সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব তথা অনুন্নত দেশসমূহ উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ট্যালকট পারসন্স নব্য বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদীতত্ত্ব প্রদান করে অনুন্নয়নকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টো (W.W. Rostow) Traditional society, preconditions for take-off, take-off, drive to maturity and high mass consumption—এই পাঁচটি স্তরের মাধ্যমে অনুন্নয়নের মাত্রাকে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিকায়ন তাত্ত্বিকরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিকল্পনার আলোকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের প্রশ্নটি বিবেচনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাত্রা নিরূপণ করতে যেয়ে কিছু সূচক ব্যবহার করা হয়– যেমন: নগরায়ণের মাত্রা, সাক্ষরতার হার, পত্রপত্রিকার সার্কুলেশন, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, স্বাধীন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যৌক্তিক প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ তথা সেক্যুলার ভাবধারা, সামাজিক গতিশীলতার মাত্রা, পেশাগত বিভিন্নতা, ট্রেড ইউনিয়ন এর উপস্থিতি, জাতীয় ঐক্য, পারিবারিক গঠন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি।[২১]

ট্যালকট পারসন্স, ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টো ছাড়াও ম্যারিয়ন লেভি (Marion Levy), নিল স্মেলসার (Neil Smelser), জেমস কোলম্যান (James coleman) প্রমুখ আধুনিকায়নের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করেন। এই পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রসমূহকে যেভাবে পরিমাণগত ও বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি হতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সমান্তরালে তৃতীয় বিশ্ব হতে উৎসারিত বিশ্লেষণ সমূহে অনুন্নয়নকে মাত্রাগত প্রশ্নে নয় বরং কাঠামোগত প্রশ্নে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একদিকে পরিসংখ্যানমূলক বা পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুন্নয়নের ফলাফলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যেখানে কারণসমূহের উপর খুব কমই তথ্য থাকে, অন্যদিকে কাঠামোগত

দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ম্যাকানিজমকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে, যার মাধ্যমে একটি উন্নত অর্থনীতি হতে অনুন্নত অর্থনীতিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কাঠামোগত ব্যাখ্যায় সেই ম্যাকানিজমসমূহকে দেখানো হয় যা অনুন্নত অর্থনীতিকে উন্নত অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

৫. অনুন্নয়নের মাত্রা নিরূপণ: নির্ভরশীলতা প্যারাডাইম

আর্জেন্টাইন পণ্ডিত রাউল প্রেবিশ (Raul Prebisch) আধুনিকায়নের বিকল্প তাত্ত্বিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বিশ্বকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখেছেন শিল্পায়িত কেন্দ্র ও অনুন্নত প্রান্ত তাঁর মতে প্রান্তের জন্য বাণিজ্য অবনতিশীল পরিস্থিতি হওয়ার কারণ হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শুধু শিল্প অগ্রসর দেশগুলোই উপকৃত হয়েছে এবং এর জন্য অন্তর্নিহিত কাঠামোগত সম্পর্কই দায়ী। প্রেবিশ দেখিয়েছেন যে অনুন্নয়ন মৌলিকভাবে একটি নির্ভরশীল ব্যবস্থা যা আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন হতে উদ্ভূত এবং প্রকারান্তরে উপনিবেশবাদেরই ফল। নির্ভরশীলতা ও অসম বাণিজ্যর কারণে অনুন্নত রাষ্ট্র সমূহ কাঁচামাল ও আধা-প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করে উচ্চমূল্য সংযোজিত তৈরি পণ্য আমদানি করতে বাধ্য হয়। এই অসম আন্তঃ-নির্ভরশীলতার ফলে অনুন্নত দেশের রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের চেয়ে কম হয়। ফলে জন্ম নেয় ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি। রাউল প্রেবিশ মনে করেন প্রান্তের পক্ষে পুঁজি সঞ্চয়ন ও কেন্দ্রের মত পুঁজিবাদের পুনরুৎপাদন সম্ভব হবে না। কেন্দ্র ও প্রান্তের সম্পর্কটি হচ্ছে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক। প্রেবিশের মতে,

> By dependence I mean the relations between centers and the periphery whereby a country is subjected to decisions taken in the centers, not only in economic matters, but also in matters of politics and strategy for domestic and foreign policies. The consequence is that due to exterior pressure the country cannot decide autonomously what it should do or cease doing"[22]

ব্রাজিলীয় অর্থনীতিবিদ চেলশো ফুর্তাদো (Celso Furtado) এবং তাঁর অনুসারীরা ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে এসব বাহ্যিক অনুন্নয়ন উপাদানসমূহ একটা দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'ব্যালেন্স অব পেমেন্টস' সমস্যার প্রতিও তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রপ্তানি কারকরা বিদেশি উৎপাদন ও ভোগের প্রয়োজন এবং চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। সবকিছু এমনভাবে ঘটে যেন এগুলো জাতীয় অর্থনীতির কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। মূল অর্থনৈতিক কাঠামো ধনিক শ্রেণীর ভোগের উদ্দেশ্য নিবেদিত থাকে। ফলশ্রুতিতে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বহুমুখী রপ্তানি পণ্যের ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে বিশ্বের দশম অর্থনৈতিক শক্তি (১৯৯৭ সনের হিসাব অনুযায়ী) হওয়ার পরও বিশ্বপ্রেক্ষাপটে ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতার মাত্রা খুবই বেশি। ব্রাজিলের ১০% ধনী জনগোষ্ঠী ৪৮% জাতীয় আয় ভোগ করে অন্যদিকে জনগোষ্ঠীর ৪০% বাস করে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে।[২৩]

চিলির অর্থনীতিবিদ অসভালদো সুনকেল (Osvaldo Sunkel) বৈদেশিক বাণিজ্য কাঠামোকে (যা কাঁচামাল রপ্তানি ও তৈরি পণ্য আমদানি করা বুঝাতো) অনুন্নত দেশের অস্থিরতা, স্থবিরতা, ক্রমাবনতিশীল বাণিজ্য সম্পর্ক ও অন্যান্য সমস্যার জন্য দায়ী করেন। তাঁর মতে,

> Dependency links the development of the international capitalist system to the processes of development and underdevelopment within a society.[24]

সুতরাং সুনকেল মনে করেন, বৈদেশিক প্রভাবকে বাহ্যিক ব্যাপার মনে না করে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করতে হবে এবং তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করতে হবে। সুনকেল জাতি-রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উপব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন একটি যুগপৎ প্রক্রিয়া যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনজনিত দুটি চেহারা নির্দেশ করে। রাউল প্রেবিশ, চেলশো ফুর্তাদো ও অসভালদো সুনকেল এরা তিনজনই বাইরের পুঁজির বিকৃত চরিত্রকে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ফুর্তাদো ও সুনকেল মনে করেন প্রান্তিক সমাজে পুঁজিবাদ পুনরুৎপাদিত হতে পারে না। প্রেবিশ আমদানি প্রতিস্থাপন ও শিল্পায়নের মাধ্যমে জাতীয় স্বতঃপ্রণোদিত পুঁজিবাদ বিকশিত হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন।

৭০ এর দশকে মিশরীয় অর্থনীতিবিদ সামির আমিন (Samir Amin) বিশ্বব্যাপী পুঁজির সঞ্চয়নের প্রেক্ষাপটে অনুন্নয়নকে পরীক্ষা করে তাঁর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে বিশ্বায়ন নতুন কোনো বিষয় নয়। আধুনিক যুগের সূচনাকাল হতে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি, বাণিজ্য, ফিন্যান্স, অর্থপ্রবাহ এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়ে আছে। সাম্প্রতিক কালে অবাধ প্রতিযোগিতা, বিনিয়োগ, ব্যাংক ঋণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রস্থিত উন্নত রাষ্ট্রসমূহ প্রান্তস্থিত অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহ হতে আরো অধিক হারে সম্পদ সঞ্চয়নের সুযোগ পাচ্ছে। এই কেন্দ্র-প্রান্ততত্ত্ব অনুন্নয়নের উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করছে। আমিনের ব্যাখ্যায় এই অসম উন্নয়নের মূল কারণ হিসেবে যা তুলে ধরা হয়েছে তা হলো কেন্দ্র ও প্রান্তের বিশেষীকরণের ধরন। আমিন দেখিয়েছেন কেন্দ্রে উচ্চ মজুরি এবং প্রান্তে নিম্ন মজুরি দুই অংশের মধ্যে অসম বিনিময় সম্পর্ককে জোরদার করে।

আঁদ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank) তাঁর আলোচনায় Metropolis-Satellite Scheme কে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করেন। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান কিভাবে মেট্রোপলিস-স্যাটেলাইট সম্পর্ক স্যাটেলাইটের উদ্বৃত্তকে শোষণ করছে। তিনি দেখিয়েছেন যে ষোলো শতকে পশ্চিম ইউরোপ কেন্দ্রিক সম্প্রসারণবাদী বাণিজ্য-সাম্রাজ্য বিকাশের ফলে লাতিন আমেরিকা বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যাবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদকে ফ্রাঙ্ক উৎপাদন সম্পর্ক হিসেবে নয় বরং বিনিময় সম্পর্কের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে সজ্ঞায়িত করেন। ফ্রাঙ্ক বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে একটি অখণ্ড সংবদ্ধ সত্তা হিসেবে মনে করেন।

ইমানুয়েল ওয়ালেস্টাইন (Immanuel Wallerstein) মনে করেন আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা পুঁজিবাদী। কারণ এটি একটি বিশ্ব অর্থনীতি এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয় তিনস্তরে গঠিত– কেন্দ্র, আধাপ্রান্ত ও প্রান্ত। এদের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তি হলো বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তি। এই সম্পর্কের ফলে প্রান্ত হতে কেন্দ্রে উদ্বৃত্ত পাচার হয় এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসমূহ শক্তিশালী হয়। ওয়ালেস্টাইনের World System তত্ত্ব বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনীতির ব্যাখ্যায় যথেষ্ট উপযোগ।

অনুপম সেন ঔপনিবেশিকতার পটভূমিতে ভারতবর্ষের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সেন দেখান যে, ঔপনিবেশিক যুগে ইংল্যান্ডের শিল্প পুঁজির কর্তৃত্বে এবং বণিক পুঁজির মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষ হতে যে বিপুল সম্পদের পাচার ঘটেছিল তাই ব্রিটিশ পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশ ও ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত অবনতির জন্য দায়ী। ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের স্বার্থে সৃষ্ট আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো উপনিবেশোত্তর ভারতবর্ষে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করছে।[২৫]

আধুনিকায়ন প্যারাডাইমের ব্যর্থতা থেকেই নির্ভরশীলতা তত্ত্বের জন্ম। নির্ভরশীলতা (Dependency) প্রত্যয়টি সাম্রাজ্যবাদ ধারণা দ্বারা সমর্থিত। আধুনিক বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবনে নির্ভরশীলতা প্রত্যয়টি এখনো যথেষ্ট উপযোগী। কারণ আধুনিকায়নের ধারণা যেখানে ইউরোপ ও আমেরিকান পুঁজিবাদী ধারার চিন্তা দ্বারা আপ্লুত সেখানে নির্ভরশীলতার ধারণা ল্যাটিন আমেরিকার উদার ইসিএলএ (Ecomomic Commission for Latin America) ও র‍্যাডিক্যাল নব্য মার্কসবাদী তত্ত্বসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। এখানে ঔপনিবেশিবতা ও নব্য ঔপনিবেশিকতার ভূমিকার মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের অবস্থান, ভূমিকা ও অনুন্নয়নের মাত্রাকে প্রত্যক্ষ করা হয়। পল ব্যারনের ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু হলে ও পরবর্তীতে ডস সান্তোস, ফালেতো (Faletto), ডাডলি সিয়ার্স, কার্দোসো প্রমূখ পন্ডিতরা নির্ভরশীলতার বহুমাত্রিক ও বিচিত্র ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। তবে নির্ভরশীলতা উত্তর চিন্তা ও তত্ত্বে ওয়ালেস্টাইনের ভূমিকাই সবচেয়ে উজ্জ্বল।

উপরের তাত্ত্বিক আলোচনাসমূহে দেখা যায় যে, ল্যাটিন আমেরিকা বা ভারতের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন অনুন্নয়নের গতিধারায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় আনতে হবে। বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রস্থিত শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার স্বার্থে অনুন্নত দেশসমূহকে তৃতীয় বিশ্ব অভিধায় অভিহিত করলেও "তৃতীয় বিশ্ব" শিরোনাম প্রদানের কোনো বস্তুনিষ্ঠ নীতিমালা এক্ষেত্রে কার্যকর নয়। উন্নয়নের ব্যাপক ডামাডোল সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী গড় জিএনপির দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, ১৯৫০ সনে গড় মাথাপিছু জিএনপির দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নত বিশ্বের অনুপাত ছিল ১ঃ৫, ১৯৮০ সালে ছিল ১ঃ৭.৫ এবং ১৯৯০ সালে ছিল ১ঃ৮.২। যদি আমরা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের (এলডিসি) সাথে শিল্পোন্নত দেশসমূহের তুলনা করি তবে দেখা যায় এই অনুপাত আরো বাড়ছে। অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ছিল ১ঃ১৯ এবং ১৯৯০ সালে ছিল ১ঃ৪৭।[২৬] বিশ্বব্যাপী অনুন্নত ও উন্নত দেশসমূহের মধ্যেকার বৈষম্য বৃদ্ধির এই অব্যাহত প্রবণতার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়ের কার্যকারিতা ও প্রয়োগযোগ্যতা এবং অনুন্নয়নের মাত্রা নিরূপণের মানদণ্ড বা নীতিমালা নতুনভাবে বিন্যাসের দাবি রাখে।

৬. বাংলাদেশের উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ

সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান (২০০২-২০০৩ সালের বাজেট ঘোষণার পূর্বে) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ আর এলডিসি-ভুক্ত দেশ নয় এবং এলডিসি'র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে দরিদ্র বিশ্বের নেতা হওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ঘোষণা অকার্যকর হয়ে গেল এবং তিনি এলডিসি সম্মেলনে যোগ দিলেন। নির্মম পরিহাস এই যে সাইফুর রহমান ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের অর্থমন্ত্রী এবং এই পূর্বনির্ধারিত স্ট্যাটাস পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা তাঁর নেই। বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ প্যারিসে প্রতিবছর মিলিত হয় এবং বাজেট পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে ও সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়। প্যারিস কনসোর্টিয়াম নামে পরিচিত এই সাহায্যদাতাদেরকে এখন বলা হয় বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের কনসোর্টিয়াম। যতই উন্নয়ন প্রসঙ্গ বলা হোক বা উন্নয়ন সহযোগী বলা হোক সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন আলোচনা করতে গেলে অনুন্নয়ন প্রসঙ্গটি আলোচনায় চলে আসে। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক সাহায্যের বিষয়টি একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই প্রতিবছর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকারকে কথিত উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিগত দিনের কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। উন্নয়ন সহযোগীদের সন্তুষ্টির উপরই নির্ভর করে সাহায্য প্রদানের পরিমাণ। কিন্তু এই সাহায্য গ্রহণের স্বার্থে এমন সব শর্তাবলী সরকারকে মেনে নিতে হয় যাদের বেশীরভাগই অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক। এখানেই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রসঙ্গটি চলে আসে। কেন্দ্রের শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, রাজনীতি ও সামরিক কৌশলের স্বার্থকে অব্যাহত ও অপ্রতিহত রাখার জন্যে অসম শর্তাদি প্রয়োগ করে, যা মেনে নিয়েই সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থের যোগান নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে ডব্লিউটিও-র শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশকে ভয়াবহ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলা ও আফগান যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক আবহ। বৈদেশিক সাহায্য প্রদানের শর্তসমূহ কঠোর হতে কঠোরতর হচ্ছে এবং ২০০২ সালের প্যারিস কনসোর্টিয়াম পরবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাই বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেন, "দাতা প্রতিনিধিরা আমাকে বলেছেন, বাবাজি দেশে গিয়ে গণতন্ত্র ঠিক করো, আইনশৃঙ্খলাকে উন্নতি করো, দুর্নীতি কমাও, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বাড়াও- তাহলে আমরা সহায়তা দেব।"[২৭] অতএব বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করে কোনো আলোচনাই অর্থবহ ও যৌক্তিক হবে না।

সমাজের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলে সেটা প্রতিফলিত হয় ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি, স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে। সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সর্বপ্রধান উৎস এবং চালিকাশক্তি হলো রাষ্ট্র। কিন্তু আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের অলঙ্ঘনীয় ভৌগোলিক রাজনৈতিক বিধি নিষেধের পরিপ্রেক্ষিতে এককভাবে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই তার সমস্যাসমূহ সমাধান করে উন্নয়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রসমূহের বৈশ্বিক গ্রন্থিবদ্ধতার এই বাধ্যবাধকতার সূত্র ধরেই বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহ 'স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র' (এলডিসি) নামের কলঙ্ক চিহ্ন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছে। সার্বিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রাপ্ত এবং প্রবল পরাক্রমশালী আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো জাতীয় পুঁজি সঞ্চয়ন বাংলাদেশে অনুপস্থিত। এর পাশাপাশি আমদানি নির্ভর ও ভোগ্যপণ্যমুখী রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে অতি মুনাফামুখী ব্যবসা-বাণিজ্যে পুজিঁ বিনিয়োগ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়, সরকারি পুঁজি-ঋণ আত্মসাৎ, বিদেশে পুঁজি পাচার, দুর্নীতির বিস্তার ইত্যাদি স্বভাবতই একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে। এভাবে আদিতে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা বা পরবর্তীতে জাপান ও সাম্প্রতিককালে পূর্ব এশিয়ার কতিপয় নতুন শিল্পায়নশীল দেশে যেভাবে পুঁজিবাদী উদ্যোক্তারা কৃচ্ছ্রতা, বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের সংগ্রামে নিজেদের শক্তি ও রাষ্ট্রের সহায়তা-পৃষ্ঠপোষকতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, বাংলাদেশের মতো সমাজে তার সুযোগ অন্তত এখনো অনুপস্থিত।[২৮] সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের প্রক্রিয়ায় এমনিতেই বাংলাদেশে

পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা বরাবরই ছিল রুদ্ধ এবং উপনিবেশ পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী সম্ভাবনার বিকৃত বিকাশ এই রুদ্ধ প্রক্রিয়াকে আরো স্থায়িত্ব দিয়েছে।

হাসানুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশের উৎপাদন কৌশলকে আধা সামন্তবাদী-আধা পুঁজিবাদী নামের এক সংকর এবং অচলায়তন উত্তরণশীল ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২৯] বাংলাদেশের বাস্তবতায় যে রাজনৈতিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব কার্যকর তার ব্যাখ্যায় চৌধুরী দেখান যে, এর এক প্রান্তে রয়েছে শক্তিশালী সামরিক-বেসামরিক আমলা গোষ্ঠীয় নিয়ন্ত্রণাধীন বহির্মুখী রাষ্ট্র, বৃহৎ দেশীয় দুর্বৃত্ত ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহক শক্তিসমূহের গ্রন্থিবদ্ধ ক্ষমতা কাঠামো, আর অন্য প্রান্তে রয়েছে দরিদ্র-নিঃস্ব, নিপীড়িত, নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পক্ষের পেটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহের অবস্থান। কিন্তু শেষোক্ত শক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিজেদের অবস্থানকে স্থায়ী বা পাকাপোক্ত করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রথমোক্ত শক্তি তার ক্ষমতাকে সংহত করে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় বৈদেশিক ঋণ-সাহায্য নির্ভর অর্থনীতিকে সচল রাখতে যেয়ে যাবতীয় প্রতিকূল শর্ত মেনে নিতে হচ্ছে সরকারকে। কৃষিখাতে ঋণ, ভর্তুকি, বাজারজাতকরণ হতে শুরু করে অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরে দাতা তথা উন্নয়ন সহযোগী ছদ্মাবরণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরামর্শ ও নির্দেশ মানতে গিয়ে এক পরনির্ভর অর্থনীতি ও পরজীবী চরিত্রের প্রশাসন যন্ত্রের জন্ম হয়েছে। বিদেশি ঋণ সাহায্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ব্যবসায়ী, এনজিও নেতৃত্ব ও রাজনীতিকদের পারস্পরিক যোগাসাজসে জাতীয় সম্পদ চুরি, অপচয় ও দুর্নীতির এক শক্তিশালী বৃত্ত তৈরি হয়েছে এবং এই বৃত্ত জাতির আত্ম-নির্ভর বিকাশের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। চোরাচালান, বিদুৎ-গ্যাস-পানি-টেলিফোন খাতে কথিত সিস্টেমলস (সহজ কথায় চুরি) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (সহজ কথায় টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস) ইত্যাদি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। মানবিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র দেখা যায় যখন "ছয়টি ভারতীয় গরুর বিনিময়ে একজন বাংলাদেশী নারী ভারতে পাচার হয় এবং অনুরূপভাবে অসংখ্য বাংলাদেশী নারী ভারত হয়ে অন্যান্য দেশের পতিতালয়গুলিতে গিয়ে পৌঁছায়"।[৩৮] বাংলাদেশের এই কালো অর্থনীতির প্রকৃত আয়তন পরিমাপ করতে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরাও অপারগ। দুর্নীতির মাত্রা নিরূপণের কোনো গ্রহণযোগ্য objective index নেই তবুও বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিল্প কারখানা, প্রাইভেটাইজেশন, ব্যাংক বীমা ও উপজেলা পরিষদ খাতে প্রাক্কলিত হিসাবে দুর্নীতির পরিমাণ ৫৪,৩৫৯ কোটি টাকা (১৯৯৪ সাল পর্যন্ত)।[৩৯] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে ১৯৮৪-৮৫ সাল থেকে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে বাংলাদেশের মোট উন্নয়ন বাজেট ছিল ৫১,১৩৯.৪৬ কোটি টাকা। যদি আমরা দেশের সার্বিক দুর্নীতিকে অত্যন্ত রক্ষণশীলভাবে ও হিসেব করি তাহলে বিগত ২৩ বছরে (১৯৭১-১৯৯৪) যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে তা বাংলাদেশের ১০ বছরের সমগ্র উন্নয়ন ব্যয়ের সমান।[৪০] দুর্নীতি, চোরাচালান, কালো অর্থনীতি, পরনির্ভর রাজনীতি, পরজীবী চরিত্রের আমলাতন্ত্র, স্বাধীন বুর্জোয়ার অনুপস্থিতি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পুঁজির আগ্রাসন এবং দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব বাংলাদেশের অনুন্নয়নকে দীর্ঘায়িত করছে।

বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ, আমলাতন্ত্র, ব্যবসায়ী ও তথাকথিত শিল্পপতিরা বিদেশী ঋণ সাহায্যের প্রধান ফলভোগী। রাষ্ট্রানুকূল্যে এই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিপুল ঋণ গ্রহণ করে, আত্মসাৎ করে এবং পাচার করে এবং আমলা ও রাজনীতিকরা এই অবৈধ বিত্তের একটা বড় ভাগ বিভিন্ন উপায়ে কুক্ষিগত করে। রাষ্ট্রানুকূল্যে এই বিকৃত উন্নয়নকে অনুপম সেন চিহ্নিত করেছেন উঞ্ছ উন্নয়ন হিসেবে। অনুপম সেনের ভাষায় " ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসনের সূচনা হওয়ার পর সামরিক শাসকরা রাষ্ট্রখাতের ভূমিকা কমিয়ে ব্যক্তিখাতে শিল্পায়নের নামে রাষ্ট্রযন্ত্র বা রাষ্ট্রক্ষমতার নৈকট্য ধন্য কতিপয় ব্যক্তিকে, প্রায় হাজার পাঁচেক ব্যক্তিকে ... রাষ্ট্রানুকূল্যে, রাষ্ট্রের অর্থে ব্যক্তিবিত্তের যে অমেয় ভাণ্ডার সৃষ্টির এবং নির্বিঘ্নে অবাধ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তার ফলে বাংলাদেশ উঞ্ছ উন্নয়নের যে নিগড়ে বদ্ধ হলো, তার থেকে কবে কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে তার মুক্তি ঘটবে তা বলা সুকঠিন"।[৪১]

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ সহ আন্তর্জাতিক লগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরামর্শ হচ্ছে– বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার । কিন্তু বাংলাদেশের ১৯৯৮সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যা পরবর্তী বিপর্যয় মোকাবেলায় এনজিওদের চরম ব্যর্থতা এবং বিপরীত দিকে যাবতীয় ত্রুটি সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সাফল্য 'উন্নয়ন সহযোগী'-দের পরামর্শকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির অতি উৎসাহী সমর্থকরা, যারা রাষ্ট্রের

ভূমিকাকে সীমিত রাখতে আগ্রহী, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত উন্নয়নের পেছনে পুঁজির কেন্দ্রের রাষ্ট্র (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান) সমুহ হতে বৃহৎ পুঁজির অবাধ ও অব্যাহত প্রবাহের সাফল্যকে বিবেচনা করতে নারাজ। বাংলাদেশে যেহেতু এধরণের অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পুঁজির অবাধ প্রবাহের উৎস নেই সেহেতু রাষ্ট্রকেই উন্নয়নের মূল দায়িত্ব নিতে হবে কারণ বিশ্বের সর্বত্র সর্বকালে যে কোনো দুর্যোগ মুহূর্তে রাষ্ট্রকেই মূল দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টু-ইন টাওয়ারে হামলা পরবর্তী পরিস্থিতি বা এনরন কোম্পানির পতন বা তার পূর্বে পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক মন্দা বা বাংলাদেশের ১৯৯৮ সালের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা সর্বত্রই রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল মুখ্য। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। তবে রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বদলাতে হবে এবং রাষ্ট্র বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করবে এটা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.উপসংহার

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষভাবে স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমুহকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সাথে এসব রাষ্ট্রকে যেভাবে সম্পর্কিত করা হয় তা প্রাচীন ফ্রান্সের বর্হির্ভূত শ্রেণী ও প্রাচীন ভারতের অস্পৃশ্য জাতিবর্ণের সাথে উচ্চ শ্রেণী/জাতিবর্ণের সম্পর্কেরই আধুনিক রূপ মাত্র। এই সম্পর্কই নির্ধারণ করছে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন-অনুন্নয়ন প্রক্রিয়াকে। বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের চরম স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নয়ন প্রসঙ্গটির ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় উন্নত-অনুন্নত দেশের সম্পর্ক স্থির করছে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে। বিশ্ব পুঁজিবাদের অমোঘ নিয়মের অধীনে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ধ্রুপদী পথে কৃষিতে ও শিল্পে সার্বিক অর্থে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব। অনুপম সেনের ভাষায় "পুঁজিবাদ আক্রান্ত অপরিকল্পিত অনিয়ন্ত্রিত নব্য ঔপনিবেশিক বাজার অর্থনীতির পথ অনুসরণ করে ধ্রুপদী ধণতন্ত্রে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য কটা অসম্ভব স্বর্ণমৃগের সন্ধানে বৃথাই ঘুরে মরা। এই পথ আমাদের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উঞ্ছবৃত্তিতে ঠেলে দিতে অর্থাৎ 'লুম্পেন প্রলেতারিয়েতে' পরিণত করতে বাধ্য"।[৩৪]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্ব পরিচিতি অনুন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে প্রায়ই অবমাননাকর বলে পরিগণিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আইনের শাসন ইত্যাদি নিয়ে উন্নত বিশ্ব যতটা সোচ্চার নিজের দেশের প্রেক্ষিতে তা কার্যকর নয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করার মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চললেও তৃতীয় বিশ্বের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিবাদ কার্যকর হয় না। অথচ ভূ-রাজনৈতিকভাবে সুদৃঢ় অবস্থানে থাকার কারণে উন্নত বিশ্ব প্রতিনিয়ত কারণে অকারণে অযাচিত পরামর্শ ও উপদেশ (প্রকৃত অর্থে নির্দেশ) দিয়ে যাচ্ছে অনুন্নত বিশ্বকে। উন্নত বিশ্বের দেওয়া এই কলঙ্ক তিলক ধারণ করে যতদিন অনুন্নত বিশ্ব উন্নয়নের পথে ছুটবে ততদিন উন্নয়ন থাকবে সুদূরপরাহত, কারণ নিজস্ব অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামরিক স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই তৃতীয় বিশ্ব প্রত্যয়ের উদ্ভব, প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটছে। মনে রাখতে হবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পশ্চাতে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ, আনুকূল্য ও প্রণোদনা এবং আন্তর্জাতিক পুঁজির মুরুব্বিদের নানাবিধ সাহায্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির অতি-উৎসাহী সমর্থক হয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা, ক্ষমতা ও পরিধিকে সংকুচিত করা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুভফলপ্রদ হবে না। ইতোমধ্যেই নব্বইয়ের দশকে দ্রুততার সাথে বাংলাদেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং প্রতিযোগিতায় যোগ্য হওয়ার পূর্বেই বাংলাদেশের শিল্পখাতকে অসম আন্তর্জাতিক পুঁজির সাথে প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়ার বিরূপ ফলাফল সার্বিক অর্থনীতিতে অনুভূত হচ্ছে। বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের মত দুর্বল অর্থনীতি ভিত্তিক রাষ্ট্রকে ধনতান্ত্রিক পথেই চলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুরুব্বিদের সাথে বোঝাপড়ায় আরো কুশলী হতে হবে এবং চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রের ন্যায় স্বতন্ত্র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সুনির্দিষ্ট, গতিশীল ও দৃঢ় করতে হবে। একই সাথে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত হতে আহরিত উদ্বৃত্তকে (কৃচ্ছতাসাধন ও দুর্নীতি রোধের মাধ্যমে) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অপ্রচলিত ও প্রবল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি নয় এমন শিল্পে বিনিয়োগ করতে হবে। কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানের পথে যাবতীয় বাধাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে হবে, যা পরে বিনিয়োগ, পুনর্বিনিয়োগ করে পুঁজির সঞ্চয়ন করতে হবে। এখানে রাষ্ট্রকেই মুখ্য ভূমিকা

পালন করতে হবে, নতুবা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে সুদূর পরাহত। এভাবেই তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে নিজস্ব স্বতন্ত্র উন্নয়ন পন্থা নির্ধারণ করতে হবে, রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করতে হবে, জনগণের প্রকৃত প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্রকে ভূমিকা পালন করতে হবে আর তাহলেই উন্নয়নের পথে দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ Jacques B. Gelinas. *Freedom from Debt* (Dhaka: UPL. 1998). p. 18.
২ See Hamza Alavi. '*India and the Colonial Mode of Production*' in R. Miliband and J.Saville (eds). *The Socialist Register* (New York: Monthly Review Press. 1975).
৩ Peter Worsley. *The Three Worlds: Culture and World Development* (London: Weidenfeld and Nicolson. 1984). p. 17.
৪ Worsley. Ibid. p. 22.
৫ Gelinas. Ibid. p. 24.
৬ Gelinas. Ibid. p. 24.
৭ Gelinas.Ibid. p. 23.
৮ Immanuel Wallerstein. '*Development: Lodestar or Illusion*' in Leslie Sklair (ed.). *Capitalism and Development* (London and NewYork: Routledge. 1994). p. 19.
৯ Wallerstein. Ibid. p. 19.
১০ UNDP. *Human Development Report, 1997* and World Bank. *World Development Indicators,1997.*
১১ Gelinas. Ibid. p. 24.
১২ Gelinas. Ibid. p. 25.
১৩ Gelinas. Ibid. p. 25.
১৪ Gelinas. Ibid. p. 26.
১৫ UNDP. *Human Development Report, 1997.*
১৬ অনুপম সেন, *বাংলাদেশ:রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকা: অবসর, ১৯৯৯), পৃ. ৮৯।
১৭ সেন (১৯৯৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।
১৮ সেন (১৯৯৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
১৯ BBS. *Statistical Pocketbook of Bangladesh-2000,* p. 6.
২০ Gelinus. Ibid. p. 26.
২১ AMM Hoogvett. *The Sociology of Developing Societies* (London: Macmillan. 1976). p. 61.
২২ মুহাম্মদ হাসান ইমাম (সম্পাদিত), *উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* (ঢাকা: প্রাঙ্মুখ, ১৯৯৮), পৃ. ২৪২।
২৩ UNDP. *Human Development Report 1997.*
২৪ ইমাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।
২৫ Anupam Sen. *The state, industrialization and class formations in India* (London: Routledge &Kegan Paul. 1982).
২৬ Gelinas. Ibid. p. 21.
২৭ *দৈনিক প্রথম আলো*, ০১ এপ্রিল, ২০০২, পৃ. ১।
২৮ হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *সমাজ ও উন্নয়ন: তুলনামূলক সংবীক্ষণ* (চট্টগ্রাম: দি তাজ লাইব্রেরী, ২০০০), পৃ. ৩৪৮।
২৯ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।
৩০ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।
৩১ ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু, *রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দুর্নীতি ও অনুন্নয়ন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা: উন্নয়ন বিতর্ক, জুন ১৯৯৮), পৃ. ২৫।
৩২ কুণ্ডু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
৩৩ সেন (১৯৯৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
৩৪ সেন (১৯৯৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

ISSN 1561-798X
আইবিএসস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ

মোঃ খাদেমুল ইসলাম*

Abstract: In the 19th fifties and sixties there was a firm belief that the exposure of mass media can rapid national development. Third World nations were trying to expand their own mass media and started disseminate information relevant to development to people according such belief and development expert's advice. Development related messages are disseminating to people by mass media in order to development in Bangladesh. What role mass media are playing regarding the development of Bangladesh is the main focus of this paper.

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমকে আরো কার্যকর করার জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে গণমাধ্যমের যথাযথ ভূমিকা পালন বিশেষ গুরুত্ববহ। আমাদের দেশে নগরায়ন অত্যন্ত সীমিত, মোট জনসংখ্যার ৭৬.৬১ শতাংশ গ্রামে এবং ২৩.৩৯ শতাংশ শহরে বাস করে।[১] মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৩৭০ মার্কিন ডলার। শিক্ষিতের হার ৫৬ শতাংশ।[২] বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এ দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষিখাতে নিয়োজিত।[৩] ফলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রসার তত ব্যাপক নয়। তা সত্ত্বেও গণমাধ্যমের যেটুকু বিকাশ এখানে ঘটেছে তা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে মোট ২১৮টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দৈনিক পত্রিকার প্রচার সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ।[৪] প্রতি হাজার লোকের জন্য ৫০টি রেডিও সেট এবং ৬টি টিভি সেট আছে।[৫] দেশের ৮০ ভাগ লোক এখন টেলিভিশনের দর্শক এবং দেশের ৮৫ ভাগ এলাকা টেলিভিশন সম্প্রচার নেটওয়ার্ক এবং রিলে স্টেশনের আওতায়। বাংলাদেশ বেতার ৭টি সম্প্রচার কেন্দ্র, ১৬টি ট্রান্সমিটার এবং ২টি রিলে স্টেসনের সাহায্যে দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার ৯০ শতাংশকে সম্প্রচারের আওতায় এনেছে।[৬] গণমাধ্যমের বিকাশ ও প্রসার এ দেশের উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা: তাত্ত্বিক ভিত্তি

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যবহার সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ১৯৫০ সাল থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। এ রকম চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠার পিছনে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো: (১) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন; (২) উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত গবেষণা; এবং (৩) ইউনেস্কো কর্তৃক গৃহীত এ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ।

(১) জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপ এবং সোভিয়েত ব্লকের মধ্যে 'বাফার' হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য ১৯৫৪ সালে বান্দুংয়ে নেহেরু, নাসের, সুকর্নো, চৌএন লাইয়ের নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যোগাযোগ প্রযুক্তি ও তথ্য বিনিময়ের সকল

---

* সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বৃদ্ধির সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ তথ্যের প্রভাব ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো লক্ষ করে যে, শিল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের যাবতীয় যোগাযোগ সামর্থ্য ও সুবিধার অধিকারী করেছে। উন্নত দেশগুলোর কয়েকটি বিশাল সংস্থা বিশ্বের দৈনিক সংবাদপত্রের মোট মুদ্রণের ৮০ ভাগ, টিভি সম্প্রচারের ৭০ ভাগ, বেতার সম্প্রচারের ৬৬ ভাগ, চলচ্চিত্র উৎপাদনের অর্ধেক, যোগাযোগ উপগ্রহের ৮০০টি নিয়ন্ত্রণ করে।[৭] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এপি ও ইউপিআই ফ্রান্সের এএফপি এবং ব্রিটেনের রয়টার–এই চারটি সংবাদসংস্থা প্রতিদিন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ৩২.৯ মিলিয়ন শব্দের সংবাদ প্রেরণ করে।[৮] ফলে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনভুক্ত দেশগুলো উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিকভাবে তারা স্বাধীনতা অর্জন করলেও পাশ্চাত্যের তথ্য ও সাংস্কৃতিক পণ্যের অবাধ প্রবাহের ফলে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়, ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা অবক্ষয়ের সম্মুখীন। উন্নয়নশীল বিশ্ব অভিযোগ করে যে, পাশ্চাত্যের বার্তা সংস্থাগুলি তথ্যের একচেটিয়া জোগানদার হওয়ায় প্রায়ই তারা তাদের ধ্যান-ধারণার বিকৃতি ঘটায়। উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়ন প্রয়াস, জীবন-ধারা, সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্যের চাইতে নেতিবাচক তথ্যের প্রচার বেশি করে, ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৃতীয় বিশ্বের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর ধারণা জন্মায় যে, তাদের সম্পর্কে এই ধরনের নেতিবাচক প্রচার তাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর এই ধরনের মতামত পাশ্চাত্যের কিছু কিছু লেখকও সমর্থন করেন। যেমন: শিলার[৯], হেস্টার[১০] প্রভৃতি লেখক। ১৯৭০ সালে লুসাকায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের তৃতীয় সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় ঔপনিবেশিক অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলো এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আরো সরাসরি ও দ্রুত তথ্যের লেনদেন হতে পারে এবং ঔপনিবেশিক যুগের ক্ষতিকর জের দূর করার জন্য আত্মনির্ভর নীতিমালার অঙ্গাঙ্গি অংশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে জাতীয় গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়, "এটা স্বীকৃত সত্য যে সাম্রাজ্যবাদের তৎপরতা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত নেই, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত এবং এইভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আদর্শগত আধিপত্য," "উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চাপানো এই আমদানীকৃত সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক বিযুক্তি মোকাবিলার জন্য জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির মূল্যবোধের অনুসরণের মধ্য দিয়েই দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবে"।[১১]

এই সম্মেলনেই গৃহীত হয় নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ঘোষণা। আলজিয়ার্স সম্মেলনের সিদ্ধান্তের জের হিসেবে ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন। ১৯৭৬ সালে বিশ্বের যোগাযোগ সমস্যা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে ইউনেস্কো এক আন্তর্জাতিক কমিশন (ম্যাকব্রাইড কমিশন নামে খ্যাত) গঠন করে। কমিশন তথ্যের ভারসাম্যহীন প্রবাহের জন্য যোগাযোগ ক্ষেত্রে কয়েকটি দেশের আধিপত্যকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এটা দূর করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং সম্মিলিত প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে। কমিশন যোগাযোগ সমস্যা সমধানের জন্য ৮২টি সুপারিশ পেশ করে। সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি সুপারিশ ছিল : জাতীয় যোগাযোগ নীতি প্রণয়ন, বাণিজ্যিক ও লাভজনক সম্প্রচারের চেয়ে অলাভজনক সম্প্রচারকে গুরুত্ব প্রদান এবং জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যবহার।[১২]

বস্তুত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর 'নতুন বিশ্ব তথ্য ব্যবস্থা' (New World Information Order) দাবির মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, সেটা হলো জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যবহার প্রয়োজন এবং যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পূর্বশর্ত হলো একটি পরিকল্পিত যোগাযোগ কৌশল গ্রহণ। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ উন্নয়নে গণমাধ্যমের ব্যবহার শুরু করে।

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল: উনিশশ পঞ্চাশ সাল থেকে গবেষক এবং পণ্ডিতগণ তাঁদের গবেষণা ও রচনায় বলতে থাকেন যে, গণমাধ্যম জাতীয় উন্নয়নে সহায়ক। তাঁরা ১৯৫০ সাল থেকে উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর কোরিলেশনাল স্টাডি করেছেন। এসব গবেষণায় গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ড্যানিয়েল লার্নার ১৯৫৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে উন্নয়নের

ঐতিহাসিক প্যাটার্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতার কথা বলেছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা যা উন্নয়নের আবশ্যক উপাদান তা বাড়াতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গণমাধ্যম এই মানসিক গতিশীলতা বাড়ায়। এ কারণে গণমাধ্যমকে বলা হয়েছে মবিলিটি মাল্টিপ্লায়ার এমনকি ম্যাজিক মাল্টিপ্লায়ার।[১৩] ১৯৬৪ সালে উইলবার শ্রাম জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে *Mass Media and National Development* শীর্ষক গ্রন্থে গণমাধ্যমকে 'Great multipliers' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, "*Media, the great multipliers, are a nation's best hope of filling in some of its informational lags, and keeping (so far as information can help to keep) its timetables for national development. Therefore, a developing country needs to look hard and carefully at the use it is making of these tools of modern communication.*"[১৪] ১৯৬৬ সালে ওয়াই. ভি. এল. রাও ভারতের দুটি গ্রামের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখতে পান, উন্নয়নকে তরান্বিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। তিনি গণমাধ্যমকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চালিকা শক্তি (Prime mover) হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[১৫] ১৯৬৯ সালে রজার্স কলাম্বিয়া, ভারত, কেনিয়া এবং ব্রাজিলের কৃষকদের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখতে পান জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি দাবি করেন, "*a small but growing body of research in less developed nations . . . . indicates the crucial, integral role of mass media modernisation.*"[১৬] তিনি উল্লেখ করেন, উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ গণমাধ্যমকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করছে না। তিনি বলেন, "*National development planners have ... tended to neglet the potential of the mass media, even though these communication channels may well be one of the sharpest tools in the developer's kit. Few developing coumries have given much emphasis to mass communication in the past decade.*"[১৭]

এসব গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গণমাধ্যম ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা ১৯৬৪ সালে হাওয়াইয়ে এক সম্মেলনে প্রথম স্থির করেন দ্রুত গণমাধ্যম বৃদ্ধি উন্নয়নের সহায়ক এবং এ কারণে সব উন্নয়নকামী দেশেরই উচিত দ্রুত গণমাধ্যমকে বিস্তৃত করা। উন্নয়নকামী দেশসমূহের শাসককুল অতি আগ্রহের সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং নিজ নিজ দেশের গণমাধ্যমকে দ্রুত বিস্তৃত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। বিশেষজ্ঞদের এ পরামর্শ জাতিসংঘও অনুমোদন করেছিল।[১৮]

ইউনেস্কোর উদ্যোগ

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। ইউনেস্কো তার সূচনালগ্ন থেকেই ঘোষণা করেছিল 'তথ্যের অবাধ প্রবাহের' আদর্শ। ষাটের দশকে ইউনেস্কো ফোরামে প্রথম আন্তর্জাতিক তথ্য প্রবাহে ভারসাম্যহীনতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে গণমাধ্যম কি ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিষয়ে ইউনেস্কো অনুসন্ধান শুরু করে। ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার উন্নয়নে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সিদ্ধান্তে বলা হয় : "*Information media have an important part to play in education and in economic and social progress generally and that new techniques of communication offer special opportunities for acceleration of the education process.*"[১৯] জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ইউনেস্কো বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নমূলক কিছু প্রজেক্ট হাতে নেয়। যেমন : 'media use in education and development' সংক্রান্ত ভারত, ঘানা এবং কোস্টারিকায় ইউনেস্কো প্রজেক্ট শুরু করে। এই সমস্ত প্রজেক্টের ফলাফল মূল্যায়ন করে দেখা যায়, তথ্যের প্রসার ঘটানো এবং জনগণকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২০] তখন থেকেই ইউনেস্কোর উদ্যোগে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যবহার শুরু হয়।

বাংলাদেশের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৯৫০-এর দশক থেকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ব্যবহার শুরু হয়। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারও গণমাধ্যমকে দ্রুত বিস্তৃত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি যে হারে ঘটেছে, উন্নয়ন সে হারে হয়নি। যেমন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাংলাদেশের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত পিএইচ-ডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন।[১১] দত্তের গবেষণার ব্যাপ্তি ছিল ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। তিনি তাঁর গবেষণায় জাতীয় উন্নয়নকে স্পষ্ট করে এমন আটটি সর্বস্বীকৃত সূচক বৃদ্ধির সঙ্গে গণমাধ্যম বৃদ্ধির দুটি সূচকের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদনের নির্দেশক, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা, নগরে বসবাসকারীর সংখ্যা, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা, সামগ্রিক উৎপাদনের নির্দেশক, হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা এসব সূচকের সঙ্গে সংবাদপত্র ও রেডিও সেট বৃদ্ধির সূচকসমূহের তুলনা করেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখতে পান জাতীয় উন্নয়নের সূচকসমূহ ও গণমাধ্যম বিস্তৃতির সূচকসমূহের হ্রাসবৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কহীন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গণমাধ্যমের বিস্তৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ১৭ মে ২০০০ তারিখে দৈনিক সংবাদে 'জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের পঞ্চাশ বছর : বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধে ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের উন্নয়নের সঙ্গে গণমাধ্যমের বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে দেখা যায় , গত বিশ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় গুণ। কৃষি উৎপাদন নির্দেশক ১৯৭০-এ ১০০ স্থির করলে দেখা যায় ১৯৯৮-এ দাঁড়িয়েছে ১১১-তে। কুড়ি বছর আগে সেটি ছিল ১০৪। স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কুড়ি বছরে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। নগরবাসীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় পঁচিশ ভাগ। বিদ্যুৎ -শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা গত আট বছরে বেড়েছে প্রায় শতকরা আঠারো ভাগ, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১৯৮৮ -তে ছিল ২.৫, সেটি ১৯৯৬-এ দাঁড়িয়েছে ৫.৬-এ। দেখা যাচ্ছে, জাতীয় উন্নয়নের সব সূচকেরই বৃদ্ধি ঘটেছে। সর্বক্ষেত্রে এক হারে নয়, তবুও বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে। পক্ষান্তরে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা কুড়ি বছরে প্রায় দ্বিগুণ (একশত ভাগ বৃদ্ধি) হলেও মুদ্রিত কপির সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ। রেডিও সেটের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় চার গুণ। টেলিভিশন সেটের সংখ্যা বেড়েছে গত দশ বছরে প্রায় দশ গুণ। অথচ জাতীয় উপার্জন গত দশ বছরে ১৯৬ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮০ ডলার শতকরা তেতাল্লিশ ভাগ (দেড় গুণও নয়)।

উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ থেকে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, গণমাধ্যমের বিস্তৃতির হারের তুলনায় জাতীয় উন্নয়নের সূচকসমূহের অগ্রগতির হার অনেক কম। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) জরিপে দেখা যাচ্ছে, মানব উন্নয়ন সূচকে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৭, আর ১৯৯৭ সালে সেখান থেকে আরও তিন স্থান নিচে নেমে বাংলাদেশের 'এইচডিআই' র‍্যাংক হয়েছে ১৫০। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি আপাত দৃষ্টিতে ব্যাপক হলেও উন্নয়ন তেমন ঘটেনি।

বাংলাদেশের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা কার্যকর না হওয়ার কারণ

যদিও সাধারণভাবে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, গণমাধ্যম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু প্রায়ই গণমাধ্যমকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে উন্নয়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উচ্চাশা পোষণ করা হলেও বাস্তবে দেখা যায় উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা যতটা প্রত্যাশা করা হয়েছেল ঠিক ততটা নয়। এর পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : গণমাধ্যমের নগরকেন্দ্রিকতা, গ্রামীণ জনগণের সীমিত গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ, গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে উন্নয়নমুখী বিষয়ের অপ্রতুলতা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান ও সংবাদকে যথাযথ গুরুত্বসহকারে গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ না করা, আধুনিক গণমাধ্যমের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণের পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতো কারণও বিদ্যমান।

(১) **বাংলাদেশের গণমাধ্যম নগরকেন্দ্রিক**: Asian Media Information and Communication Center (AMIC)-এর রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলাদেশে টেলিভিশনের গ্রাহক সংখ্যা ০.৭ শতাংশ,

রেডিও এবং সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ এবং ০.০৬ শতাংশ। গ্রাহকদের ৮০ শতাংশ হলো শহর এলাকার।[২২] বাংলাদেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত (বিটিভি) ২টি টিভি স্টেশন (ঢাকা এবং চট্টগ্রামে) এবং তিনটি বেসরকারি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (একুশে টেলিভিশন [বর্তমানে বন্ধ–নি.স.], চ্যানেল আই এবং এটিএন বাংলা) আছে। বিটিভির আওতা একেবারে গ্রাম পর্যন্ত পৌছালেও অন্যান্য চ্যানেলগুলো শহর ও শহরতলী পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছে। বাংলাদেশে ৭টি রেডিও স্টেশন আছে। এগুলি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং রংপুরের মতো বড় শহরে অবস্থিত। আর এসব গণমাধ্যম সরকার অথবা শহরের ধনী শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু গ্রামীণ মানুষের উপযোগী হয় না তা Beltran কর্তৃক ল্যাটিন আমেরিকার গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।[২৩] বাংলাদেশের গণমাধ্যম মুখ্যত নাগরিক জীবনের প্রয়োজন মেটায়। বাংলাদেশের গণমাধ্যমে গ্রামীণ বিষয়কে খুব কম প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ১৯৮১ সালে গ্রামীণ সংবাদ ছিল মোট সংবাদের ১৫.০২ শতাংশ, ১৯৮৭ সালে ২০.৬৪ শতাংশ এবং ১৯৯২ সালে ২১.৬৭ শতাংশ।[২৪] আর যেটুকু গ্রামীণ সংবাদ প্রকাশিত হয় সেটুকুও তত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয় না। বেশির ভাগ গ্রামীণ সংবাদই এক-কলাম শিরোনামে (৭৫.৯১ শতাংশ) প্রকাশ করা হয়। যে সংবাদটি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটির শিরোনামের কলাম-সংখ্যা তত বেশি হয়। ঢাকার দৈনিকগুলোতে শতকরা ৮২ ভাগ গ্রামীণ সংবাদের জন্য বরাদ্দ থাকে মধ্যবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো যায় প্রথম পাতায়। তারপরের গুরুত্ব শেষ পাতায়। মধ্যবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের গুরুত্ব মাঝামাঝি ধরনের। ঢাকার দৈনিকগুলো গ্রামীণ সংবাদকে প্রায়শ মাত্র এক অনুচ্ছেদের মধ্যে সীমিত রাখে।[২৫] এ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক গ্রামে বাস করলেও গণমাধ্যমগুলো শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামীণ বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয় না, ফলে বাংলাদেশের গণমাধ্যম গ্রামীণ তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(২) **গ্রামীণ জনগণের সীমিত গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ** : সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে, যেমন–গণমাধ্যমের বিস্তার সমানভাবে ঘটেনি। একই কারণে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরেও গণমাধ্যমের অসম বিকাশ বিদ্যমান। বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহ নগরকেন্দ্রিক এবং ধনী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় গ্রামীণ লোকজনের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ কম। আবার গ্রামীণ জনগণের মধ্যে শিক্ষিত, সচ্ছল লোকজনের যেটুকু গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে , অশিক্ষিত, ভূমিহীনদের সে সুযোগও নেই। উন্নত গ্রামগুলিতে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৫ ভাগ রেডিওর উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পায়। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৮৮.৯ ভাগ, স্কুল পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৯৫.২ ভাগ, কলেজ পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৯৫.৮ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ। অনুন্নত গ্রামে অশিক্ষিত লোকদের শতকরা ৬৭.২ ভাগ রেডিওর উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পায়। শিক্ষিতদের বেলায় এই হার হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগ, স্কুল পর্যায়ে শিক্ষিতদের বেলায় শতকরা ৭৮.১ ভাগ এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা ৯২.৩ ভাগ।[২৬]

সচ্ছল গ্রামীণ জনগণ, ভূমিহীনদের চেয়ে গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ বেশি পায়। উন্নত গ্রামগুলিতে ভূমিহীনরা রেডিওর উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পায় শতকরা ৫৭.৯ ভাগ, আধ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ক্ষেত্রে ৭৭.৭ ভাগ, আধ একরের উর্ধ্বে এবং আড়াই একর পর্যন্ত জমির মালিকদের বেলায় ৮৬.৬ ভাগ, আড়াই একরের উর্ধ্বে এবং সাড়ে সাত একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ক্ষেত্রে ৯২.৪ ভাগ এবং সাড়ে সাত একরের উর্ধ্বে জমির মালিকদের ক্ষেত্রে ৯৬.৭ ভাগ। অনুন্নত পাড়াগাঁয়ে এর শতকরা হার হচ্ছে যথাক্রমে ৬৪.৭, ৬০.৮, ৭০.১, ৭১.১ এবং ৮০।[২৭] বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নয়নমূলক বার্তা যাদের কাছে পৌছার কথা, তারা কোনো বার্তা পায় না, বরং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কাছে এসব বার্তা পৌছায়।[২৮] Shingi এবং Mody তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, যাদের অন্যান্য উৎস থেকে

উন্নয়নমূলক বার্তা পাওয়ার বেশি সুযোগ রয়েছে, তাদেরই আবার গণমাধ্যম দেখার সুযোগ বেশি রয়েছে।[২৯] গ্রামীণ জনগণের মধ্যে যাদের অন্যান্য উৎস থেকে উন্নয়নমূলক বার্তা পাওয়ার সুযোগ কম, তাদের গণমাধ্যম ব্যবহারেরও সুযোগ কম। ফলে গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নিকট উন্নয়নমূলক তথ্যের অভাব দেখা দেয়।[৩০] ফলে উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা ততখানি কার্যকর হচ্ছে না।

(৩) **গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে উন্নয়নমূলক বিষয়ের অপ্রতুলতা:** উন্নয়নের পুরাতন ধারায় বা মডেলে[৩১] গণমাধ্যম যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু তত গুরুত্ব পায়নি। উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন পাশ্চাত্যের জীবনধারা প্রদর্শিত হলে, গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে অনুন্নত দেশের জনসাধারণ হয়ত উদ্বুদ্ধ হবে এবং উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল অধিকাংশ উন্নয়নকামী দেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটলেও জাতীয় উন্নয়নে তার কোনো স্পষ্ট অবদান বা প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল না। ফলে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা ১৯৭৪ সালে হাওয়াইতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সম্মেলনে তাঁরা শুধু গণমাধ্যমের বিস্তার নয় বরং গণমাধ্যমে কি প্রচার বা প্রকাশ করা হচ্ছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গণমাধ্যমে উন্নয়ন সম্পর্কিত তথ্য রাজনীতিসহ অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক কম।[৩২] উদাহরণস্বরূপ ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারত সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকার উন্নতি সাধন। এ লক্ষ্যে ভারত সরকার গণমাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার করে। কিন্তু ভারতের রেডিও অনুষ্ঠানের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, রেডিওতে প্রচারিত উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান হচ্ছে সমস্ত অনুষ্ঠানের ৫.৮ শতাংশ, গানের অনুষ্ঠান ৪০ শতাংশ, এবং সংবাদ ২৪.৮ শতাংশ।[৩৩]

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের গণমাধ্যমের মতো বাংলাদেশের গণমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উন্নয়নমূলক বিষয়ের চেয়ে বিনোদনমূলক বিষয়, রাজনীতি, সন্ত্রাস, যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিজস্ব সমীক্ষায় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভাজনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিটিভিতে প্রচারিত সমস্ত অনুষ্ঠানের শতকরা ৫.৪০ ভাগ হলো উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান। [সারণি ১ দ্রষ্টব্য

সারণি ১

বিটিভিতে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শতকরা হার

অনুষ্ঠানের নাম	শতকরা হার
ধর্মীয়	৬.২৫
শিক্ষামূলক	৪.৬০
শিশুতোষ	৬.৭০
নাটক	৬.৩০
সংগীত	৭.০০
নৃত্য	৪.০০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১.৬৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার	৪.৭৭
ম্যাগাজিন	২.৮৫
উন্নয়ন	৫.৪০
খেলাধুলা	৬.৩৫
সংবাদ ও সাম্প্রতিক বিষয়	১৫.৮০
ঘোষণা ও শ্লোগান	২.৩৩
বাণিজ্যিক	৫.০০
বিদেশি ছবি ও ভিডিও টেপ	২১.০০
মোট	১০০.০০

উৎস : আলী রীয়াজ, "বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আধেয় (১৯৬৬-৮১)", *যোগাযোগ পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়রি ১৯৯১, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫২।

বিটিভিতে উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বেশি প্রচার করা হয়, এ কথার সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয় সারণি ২ থেকে।

সারণি ২

বিটিভিতে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শতকরা হার

সাল	বিনোদনমূলক %	শিক্ষামূলক %	তথ্যমূলক %	মোট
১৯৬৬	৫৬.০২	২৫.৫৬	১৭.৪৪	১০০
১৯৭০	৫৬.১১	১৪.৬৩	২৫.০৬	১০০
১৯৭৩	৬১.২০	১৮.৬৮	১৮.৬১	১০০
১৯৭৪	৫৯.৭৪	১৫.৫৮	২১.১২	১০০
১৯৭৫	৫৯.৮৯	১৯.৫৯	১৭.৮৯	১০০
১৯৭৬	৫৭.৯৭	২২.৯৫	১৪.৯৮	১০০
১৯৭৮	৫১.৫২	২৫.২০	২২.৪৮	১০০
১৯৮১	৫৩.৮৯	২৭.৫০	১৫.০৩	১০০

উৎস : আলী রীয়াজ, "বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আধেয় (১৯৬৬-৮১)", *যোগাযোগ পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯১, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৩।

রেডিও দামে সস্তা, সহজে বহনযোগ্য এবং বিদ্যুৎ ছাড়াও ব্যাটারির সাহায্যে চালানো যায়। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের চাইতে আমাদের দেশে রেডিওর শ্রোতা বেশি বলে এটি উন্নয়নমূলক বার্তা জনগণের নিকট পৌছে দিয়ে উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু রেডিওতে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তাদের বেশির ভাগই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান খুব কম প্রচার করা হয়। যেমন : জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। যা বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হিসেবে বিবেচিত। অথচ রেডিওতে সম্প্রচারিত মোট সময়ের মাত্র ৫ শতাংশ জনসংখ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।[৩৪]

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর দিকে চোখ বুলালে দেখা যায় সংবাদপত্র উন্নয়নমূলক সংবাদের চেয়ে বরং রাজনীতি, সরকার, অপরাধ এবং দুর্নীতি বিষয়ক সংবাদ বেশি ছাপে। যেমন উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত হলো পরিবেশ সংরক্ষণ। অথচ বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদ মোট সংবাদের ১.৪১ শতাংশ মাত্র।[৩৫] ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ অবজারভার-এ "প্রায় ৪০ ভাগ খবর ছিলো সরকার ও রাজনীতি বিষয়ক। দৈনিক ইত্তেফাকে এ জাতীয় সংবাদ সামান্য কম হলেও সব রকম খবরের সিংহভাগ জুড়েই ছিল সরকার ও রাজনীতির খবর।[৩৬] বর্তমানে সরকার এবং রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ কিছুটা কম প্রকাশিত হলেও অপরাধ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ক সংবাদ বিষয়তালিকার শীর্ষস্থানে চলে এসেছে। অতএব, এ কথা বলা যায়, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু উন্নয়নমুখী নয়। এদেশের গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু সিংহভাগ বিনোদনধর্মী বিষয় এবং রাজনৈতিক ও সরকারি কার্যক্রমের বিবরণ, যা গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা তেমন আশাব্যঞ্জক নয়।

(৪) **উন্নয়নমূলক বিষয়কে গুরুত্বসহকারে গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ না করা:** এমনিতেই গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুতে উন্নয়নধর্মী বিষয় কম। তার উপর উন্নয়নধর্মী বিষয় যেটুকু প্রচার বা প্রকাশ করা হয় সেটুকুও তত গুরুত্বসহ প্রচার বা প্রকাশ করা হয় না। যেমন : পিআইবি পরিচালিত সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, ঢাকার ১০টি দৈনিকে পরিবেশ বিষয়ক মোট সংবাদ ছাপা হয়েছে ৪৫১টি। মধ্যবর্তী পাতায় (এ পাতার গুরুত্ব মাঝামাঝি ধরনের) প্রকাশিত হয়েছে সবচাইতে বেশি ২৬৩টি সংবাদ। প্রথম পাতায় (এ পাতার গুরুত্ব সবচাইতে বেশি) প্রকাশিত হয়েছে সবচাইতে কম ৫২টি সংবাদ। তাছাড়া পরিবেশ বিষয়ক সংবাদগুলোর বেশির ভাগই এক কলামে এবং উপরিতল প্রতিবেদন (surface reporting)। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সংবাদগুলোকে তুলে ধরা হয়নি।[৩৭] আবার বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই

আলোচনাধর্মী এবং এসব অনুষ্ঠানকে 'প্রাইম টাইমে' (সাধারণত রাত ৮ টা থেকে ১০ টা) প্রচার করা হয় না।[৩৮] ফলে মানুষ উন্নয়নধর্মী বিষয়গুলোকে দেখেনা বা পড়ে না।

(৫) **একমুখী যোগাযোগ:** সাধারণভাবে মনে করা হয় উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য জনগণের নিকট পৌছালেই উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের গবেষণায় দেখা যায়, উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য অনেক সময়ে দর্শক-শ্রোতার বোধগম্য হয় না।[৩৯] কিন্তু যোগাযোগ একমুখী হওয়ায় অর্থ্যাৎ 'ফিডব্যাক' দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় যোগাযোগ কার্যকর হয় না।

(৬) **আধুনিক গণমাধ্যমের উপর অধিক নির্ভরশীলতা:** জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো গণমাধ্যমের সাহায্য যে কোনো উন্নয়নমূলক বার্তা দ্রুত দেশের ব্যাপক এলাকায় বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ফলে উন্নয়নমূলক বার্তা জনগণের নিকট পৌছানোর জন্য আধুনিক গণমাধ্যমের উপর অধিক নির্ভর করা হয়। কিন্তু একটি দেশে বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও ধর্মের লোক বাস করে। গণমাধ্যমের সাহায্যে তাদের সবার উপযোগী বার্তা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা তত ফলপ্রসূ হয় না।

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা মূল্যায়ন

বর্তমানে গণমাধ্যম ও উন্নয়ন বিষয়ক যেসব গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো থেকে দেখা যায়, গণমাধ্যম উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা তো পালন করেই না এমনকি উন্নয়নবার্তার প্রধান উৎসও গণমাধ্যম নয়। ১৯৮৭ সালে Hartman এবং তাঁর সহকর্মীরা উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা সংক্রান্ত ভারতের কয়েকটি গ্রামের উপর একটি গবেষণা চালান। সে গবেষণা থেকে দেখা যায়, স্বাস্থ্য এবং কৃষি বিষয়ক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের চেয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ অধিক কার্যকর।[৪০] আফ্রিকায় পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক গণমাধ্যমের চেয়ে পারস্পরিক গ্রামীণ মাধ্যম উন্নয়নে অধিক কার্যকর।[৪১] আসলে জাতীয় উন্নয়নের জন্য উন্নয়নকামী দেশসমূহে যে সামাজিক পরিবর্তন দরকার তা গণমাধ্যমের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়। গণমাধ্যমের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাবিষয়ক গবেষণায় বার বার দেখা গেছে, গণমাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত সাধারণ তথ্য প্রবাহ কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনে না। নানা রকম মধ্যবর্তী কারণ এই প্রভাব বলয় বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে। ওইসব তথ্যাদি বরং প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে জীবিতই রাখে।[৪২] ছোট ছোট পরিবর্তনের ঢেউ গণমাধ্যম আনতেই পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা তার নেই। গণমাধ্যম মানুষের সামনে নতুন মত ও পথ তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মানুষ সেই মত গ্রহণ করবে কিনা সেই পথ অনুসরণ করবে কিনা এ বিষয়ে নির্দেশনার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ গণমাধ্যমের দিকে মুখ ফেরায় না—মুখ ফেরায় ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে। আর তাই উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা প্রধান নয় বরং সহায়ক।

উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা কার্যকর করার উপায়

(১) বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহ শহরকেন্দ্রিক। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেন তারাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শহুরে এবং অভিজাত শ্রেণীর হওয়ায় গ্রামীণ শ্রোতা-দর্শকদের সাথে তাদের সমানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলে যোগাযোগ তেমন ফলপ্রসূ হয় না। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে যদি গ্রামীণ লোকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যায়, তাহলে নিজেদের পরিচিত লোকের উপস্থিতি দেখে গ্রামীণ দর্শক-শ্রোতাদের এক আপন অধিকারজাত অনুভূতিতে প্রণোদিত করে। এর ফলে উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের দর্শক-শ্রোতা বাড়বে।

(২) তথ্য গ্রহণের মাধ্যমসমূহ সহজলভ্য হলেই জনগণ ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমের সংস্পর্শে আসতে পারে এবং উন্নয়নের নতুন কলাকৌশল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। আফ্রিকায় দেখা গেছে গ্রামীণ লোকজনের মধ্যে উন্নয়নমূলক বার্তা ছড়ানোর ক্ষেত্রে রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া লাইবেরিয়া, শ্রীলংকা, ভারত, ডমিনিকা প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর এবং জ্যামাইকার উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, উন্নয়নমূলক বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মাধ্যম এবং রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪৩] বাংলাদেশেও গ্রামীণ জনগণের

মধ্যে উন্নয়নমূলক বার্তা ছড়ানোর ক্ষেত্রে রেডিওই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত গণমাধ্যম। কিন্তু রেডিও এখনও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের নাগালের বাইরে। তাই চাষীদেরকে দলবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে রেডিও শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৩) গণমাধ্যমের উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের ফলপ্রসূতা আনুষঙ্গিক উন্নয়ন উপকরণাদির সহজ ও সময়োপযোগী সরবরাহের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আনুষঙ্গিক বিষয়াদির নিশ্চয়তা বিধান না করে গণমাধ্যমে উন্নয়নমূলক তথ্য প্রচার করলে সে বার্তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। গণমাধ্যম সার, উন্নত বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষকের দ্বার প্রান্তে পৌছে দিতে পারে না। এগুলোর প্রয়োজন এবং ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কেই শুধু জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। অতএব, গণমাধ্যমে প্রচারিত উন্নয়নমূলক বার্তাকে ফলপ্রসূ করার জন্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) উন্নয়নে গণমাধ্যমের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানমালার উপর। অনুষ্ঠানমালার প্রতি দর্শক-শ্রোতার আগ্রহই হচ্ছে ফলপ্রসূ উন্নয়ন যোগাযোগের পূর্বশর্ত। কোনো অনুষ্ঠানে বিপুল দর্শক-শ্রোতার সমাগমের প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে আকর্ষণীয় পরিবেশনা। মতামত যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রেডিওতে প্রচারিত গতানুগতিক ছকে বাঁধা উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে অন্তরঙ্গ কথোপকথন জাতীয় অনুষ্ঠানই বেশি জনপ্রিয়।[৪৪] গ্রাম্য আসর জাতীয় অন্তরঙ্গ আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশিত উন্নয়নমূলক তথ্য শ্রোতার আগ্রহ বাড়াতে পারে। উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানকে দর্শক-শ্রোতার নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য নামী-দামি ব্যক্তি যেমন : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, খেলোয়াড়, সিনেমার নায়ক-নায়িকা, বিজ্ঞানী, ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করানো যেতে পারে।

(৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দর্শক-শ্রোতার উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান দেখার/শোনার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বাছাই প্রবণতা (Selectivity) কাজ করে। সাধারণত উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের চেয়ে বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতারা বেশি দেখে/শোনে।[৪৫] তাই বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান যেমন : নাটক, গান প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক বার্তাকে প্রচার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ এশিয়ার বিখ্যাত পপ সংগীত শিল্পী ক্রিস ভিলোনকো'র (Cris Villonco) পরিবেশ বিষয়ক গানের কথা উল্লেখ করা যায়। তার গান ফিলিপাইনে পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৪৬]

(৬) উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের অর্থ এবং মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাষা এবং বাচনভঙ্গির ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভাষার প্রকৃতি ও বাচনভঙ্গি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অপ্রচলিত ও অস্থানীয় ভাষা ব্যবহারের ফলে গণমাধ্যমে পরিবেশিত উন্নয়নমূলক তথ্য দর্শক-শ্রোতার বোধগম্য হয় না, অথবা কিছুটা বোধগম্য হলেও তার ধারণ ক্ষমতা থাকে না। যে ধরনের বা অঞ্চলের দর্শক-শ্রোতার জন্য গণমাধ্যমে উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে, তাতে যদি তাদের আঞ্চলিক ভাষা এবং বাচনভঙ্গির ব্যবহার করা হয় তাহলে তা সহজবোধ্য ও বোধগম্য হতে পারে।

(৭) বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উন্নয়নমূলক যেসব সংবাদ ছাপা/প্রচার করা হয় তাদের বেশির ভাগই সাদামাটা প্রকৃতির। কিন্তু শুধু সাদামাটা প্রকৃতির (surface reporting) সংবাদে পাঠক-দর্শক-শ্রোতা এখন আর পুরোপুরি তৃপ্ত নয়। উন্নয়নের সমস্যার প্রকৃতি, নানা দিক, প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন। এসব কারণে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রয়োজন অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন করার মতো সাংবাদিকের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের নামে যা প্রকাশ করা হয় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত। তাই উন্নয়ন বিষয়ে সাংবাদিকরা যাতে যথার্থ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন লিখতে পারে তার জন্য কর্মশালা, ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৮) আমাদের দেশের গণমাধ্যমে উন্নয়নমূলক সংবাদ, অনুষ্ঠান এখনও তেমন গুরুত্ব অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু উন্নয়ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে হলে, উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ বাড়াতে হলে এ বিষয়ক সংবাদ, অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে।

(৯) উন্নয়নমূলক বার্তা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আধুনিক গণমাধ্যমের উপর অধিক নির্ভর করা হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি এবং ধর্মের লোকের কাছে গণমাধ্যমে ফলপ্রসূভাবে বার্তা পৌছাতে পারে না। তাই আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা লোকজ মাধ্যম ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৪৭] বিশেষজ্ঞরা লোকজ মাধ্যম ব্যবহারের যেসব সুবিধা তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক) গ্রামীণ লোকজন আধুনিক গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, সিনেমা) চেয়ে লোকজ মাধ্যমগুলিকে বিশ্বাস করে বেশি।

খ) লোকজ মাধ্যম গ্রামীণ সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ) সমাজের দরিদ্রতম লোকজনের সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি ব্যবহারের সুযোগ খুব কম থাকলেও লোকজ মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

ঘ) লোকজ মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে অর্থ্যাৎ এখানে দর্শক-শ্রোতা সক্রিয় (Active) কিন্তু আধুনিক গণমাধ্যমে তারা নিষ্ক্রিয় (Passive)।[৪৮]

তাই উন্নয়নমূলক বার্তাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট ফলপ্রসূভাবে পৌছানোর জন্য আধুনিক গণমাধ্যমের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম, যেমন : জারি গান, যাত্রা, কবি গান, সারি গান প্রভৃতিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে একথা বলা যায় যে, গণমাধ্যম এককভাবে কখনোই কোনো উন্নয়ন সাধন করতে পারে না। গণমাধ্যম উন্নয়নমূলক তথ্য জনগণের নিকট পৌছে দিয়ে তাদেরকে উন্নয়নের পথ দেখিয়ে দিতে পারে, উন্নয়ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। অর্থ্যাৎ জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যম প্রধান ভূমিকা পালন না করলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যনির্দেশ

১ *The Preliminary Report of the Fourth Population Census-2001*, Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh Sccretariat, Dhaka.

২ ibid.

৩ হক,মাহবুব উল, *দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন* ১৯৯৭, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,ঢাকা, পৃ. ৪৭।

৪ *ডিএফপি রিপোর্ট* ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ৫।

৫ *The State of the World's Children 2001*, UNICEF, p. 78 and 90.

৬ *The Fifth Five Year Plan 1997-2000*, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, March 1998, p.531.

৭ হক, মফিদুল, ' তথ্য জগতের প্রতিকৃতি', *সাপ্তাহিক একতা*, ঢাকা, ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃ. ৭ ।

৮ Sussman, Leonard R, *'The New World Information Order and Freedom of the Press* : Louisiana State University Hitesman Lecture Series, Spring. 1982.

৯ Schiller, Herbert, *Communication and Cultural Domination*, New York, International Arts and Sciences Press. 1978.

১০ Hester, Al. 'The Collection and Flow of World News' in *Global Journalism*, edited by John Merrill. New York, Longman. 1990.

১১ রোজমেরী রাইটার, *হুজ নিউজ?* লন্ডন ১৯৭৮, পৃ. ৯৩।

১২ Mac Bride Commission, *Many Voices, One World*. Paris : UNIESCO. 1980.

১৩ Lerner, Daniel, *The Passing of Traditional Society : Modernizing The Middle East*, New York, Free Press, 1958.

১৪ Schramm, Wilbur, *Mass Media and National Development*. Standford : Standford University Press. 1964.

১৫ Rao, Y. V. Lakshmana, *Communication and Development : A Study of Two Indian Villages*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1966.

১৬ Rogers, Everette M, *Modernisation Among Peasants : The Impact of Communication*, New York : Holt, Rinehard and Winston. 1969.

১৭ ibid.

১৮ দত্ত, জোতিপ্রকাশ, 'জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের পঞ্চাশ বছর: বাংলাদেশ', *দৈনিক সংবাদ*, মে ১৭, ২০০০, পৃ. ২।

১৯ Schramm, Wilbur, *Mass Media and National Development*. Stanford : Stanford University Press. 1964.

২০ Hornik, Robert C, *Development Communication*. New York : Longman. 1988.

২১ দত্ত, জোতিপ্রকাশ, 'জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের পঞ্চাশ বছর: বাংলাদেশ', *দৈনিক সংবাদ*, মে ১৭, ২০০০, পৃ. ২।

২২ *Media Asia*, an Asian Mass Communication Quarterly, Vol.30, Number 6, November-December 2000, AMIC, Singapore, p. 17.

২৩ Beltran, Luis Ramiro, S. 'Alien Premises, Objects, and Methods in Latin American Communication Research'. In E. M. Rogers (ed.), *Communication and* Development: Critical Perspectives, pp. 15-42. Beverly Hills : Sage Publications. 1976, pp. 15-21.

২৪ মোসলেম, সীমা, "জাতীয় দৈনিকে মফস্বলের খবর", *নিরীক্ষা*, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ১৯-.২ এবং মে-জুন ১৯৯২, পৃ. ৩৬-৩৯, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৫ গায়েন, কাবেরী ও সেলিম রেজা, "সংবাদপত্রে গ্রাম : ঢাকার দৈনিকে গ্রামীণ সংবাদের আঙ্গিক-উপস্থাপন", *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, চতুর্থ সংখ্যা ১৯৯৬, পৃ. ১৪২-১৪৫, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২৬ কবির, জাহান্‌গীর, উন্নয়নমূলক গণযোগাযোগ ও মানবীয় সম্পর্ক, *নিরীক্ষা*, জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩০, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২৭ পূর্বোক্ত।

২৮ Lenglet, Frans. 'The Ivory Coast : Who Benefits from Education/Information in Rural Television?' In Emile G. McAnany (ed.). *Communications in the Rural Third World*, pp. 49, 70. New York : Praegar. 1980.

২৯ Shingi, Prakash M. and Bella Mody. 'The Communication Effects Gap'. In E. M. Rogers (ed.), *Communication and Development : Critical Perspectives*, pp. 79-98, Beverly Hills : Sage Publications. 1976.

৩০ Khan, A. W. 'Role of Radio in Development Communication : A Country Cousin Syndrome'. In K. E. Eapen (ed.), *The Role of Radio in Growth and Development*, pp. 29-36, Bangalore. 1987.

৩১ উন্নয়নের পুরাতন মডেল পঞ্চাশের দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই মডেলের মূল উপাদান গুলো হচ্ছে শিল্পায়ন, নগরায়ন, পুঁজিঘন প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাক্ষরতা, গণমাধ্যমের প্রসার ও সংখ্যায়ন। Alviln Y. *Social change and Development*, London, Sage, 1990.

৩২ S. M. Barghauti, 'The Role of Communication in Jordan's *Rural Development', Journalism* 51 : pp. 418-424, 1974.

৩৩ Government of India, *A Reference Mannual*. New Delhi : Ministry of Information and Broadcasting. 1979.

৩৪ ইসলাম, খাদেমুল 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেডিওর ভূমিকা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' *সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল*, ৫ম সংখ্যা, ১৯৯৮, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১২।

৩৫ হক, কামরুল ও শামীমা চৌধুরী, 'পরিবেশ সচেতনতায় সংবাদপত্রের ভূমিকা' বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮ (অপ্রকাশিত)।

৩৬ দত্ত, জোতিপ্রকাশ, 'জাতীয় উন্নয়নে গণমাধ্যমের পঞ্চাশ বছর: বাংলাদেশ', *দৈনিক সংবাদ*, মে ১৭, ২০০০, পৃ. ২।

৩৭ হক, কামরুল ও শামীমা চৌধুরী, "পরিবেশ সচেতনতায় সংবাদপত্রের ভূমিকা," বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮ (অপ্রকাশিত)।

৩৮ ইসলাম, খাদেমুল, "বাংলাদেশ টেলিভিশনে জনসংখ্যা বিষয়ক অনুষ্ঠান ঃ আধেয় ও দর্শক বিশ্লেষণ," গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫ (অপ্রকাশিত)।

৩৯ W. Schramm, *Mass Media and National Development*, Paris, UNESCO, 1964.

৪০ Hartman, Paul. et.al. *The Mass Media and Village Life : An Indian Study*, London, Sage. 1989.

৪১ Ugboajah, Frank, "Communication as Technology in Rural Development", *Africa Media Review, 1* (1) : pp. 1 - 19. 1986.

৪২ Joseph T. Klapper, *The Effects of Mass Communication*, Free Press, New York, 1960

৪৩ Fisher, Harold. "Community Radio as a Tool for Development". *Media Development*, 4, pp. 19-23, 1990.

৪৪ কবির, জাহান্‌গীর "উন্নয়নমূলক গণযোগাযোগ ও মানবীয় সম্পর্ক", *নিরীক্ষা*, জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃ. ৩২, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৪৫ Rogers, Everett M. *Modernisation Among Peasants*. New York : Holt, Rinehart and Winston. 1969.

৪৬ *Time*, vol. 155, No. 16A, April-May 2000, p. 91.

৪৭ Jussawalla, M. and D. L. Hughes, "The Information economy and indigenous communications". in G. Wang and W. 1984.

৪৮ Dissayanake, W. "New Wine in old bottles : Can folk media convey modern messages?" *Journal Communication*, 27, pp. 122-124. 1977.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

বরেন্দ্র অঞ্চলের বিন্‌ধ জাতিগোষ্ঠী : সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয় উদ্‌ঘাটন

মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী*

Abstract: The aim of the present article is to decipher the identity and to describe the culture pattern of the *Bindh*, a least known ethnic group of North-western Bangladesh. Actually the *Bindh* is a disappearing community today. They migrated from the Bindhya hill range of the western coast of India to this reason. Over the century, after settlement in this region, the *Bindh* gave up the hunting-gathering economy and adopted proto-agrarian life style. They are Austro-Mundari speaking animist people. They have got traditional *Parha* organization headed by a *Moral*. They have got a two-tier political organization and the *Moral* is the chief of that. This is an urgent aspect to be studied by the social scientist today.

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল রাষ্ট্র। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে এই দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিচিত্র জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে। এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ অনেক আদিম জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে (Majumder, 1943:557)। ফলে এ দেশে এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে (Maloney, 1977:1-34)। এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর বসতি। সে জন্য আজও বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী (Ethnic group) বসবাস করে । বরেন্দ্র অঞ্চল তথা দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় বিন্‌ধ নামক একটি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। তবে বিন্‌ধরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম এবং বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মতো বিন্‌ধরাও চিরাচরিত ধারায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বর্তমানে এই সম্প্রদায়টি বিলুপ্তির পথে। তাই তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ। এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জাতিতাত্ত্বিক সাহিত্যে বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। ক্লাসিক্যাল লেখাসমূহে (Dalton 1872, Risey 1891) কিছু তথ্য থাকলেও উত্তরকালে এদের প্রতি গবেষক পণ্ডিতদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। বিশেষভাবে বাংলাদেশে এ যাবৎকাল বিন্‌ধরা অপরিচিত ও উপেক্ষিতই থেকেছে। আর এভাবে এরা হারিয়ে যেতে বসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এদের চিহ্নিতকরণ ও পরিচয় বিশ্লেষণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশে একটি বিস্মৃতপ্রায় অথবা অচেনা জাতিগোষ্ঠী বিন্‌ধরা সম্ভবত পশ্চিম ভারতের মূল জনস্রোত থেকে বহু পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ইদানীং বাংলাদেশের জনবিন্যাসের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে বিন্‌ধ সম্প্রদায়ের আপন ঐতিহ্যগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা সাম্প্রতিককালে কতটুকু ক্রিয়াশীল রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হওয়াই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বিন্‌ধ জাতিগোষ্ঠীর জৈবিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করা । এছাড়া তাদের রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণের দিকসমূহ বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

*ড. মো. আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দোগাছী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত গবেষণার একটি মৌল কৌশলই হচ্ছে ক্ষেত্র অনুসন্ধান বা মাঠ পর্যায়ের তথ্য আহরণ। কেননা উক্ত গবেষণা কৌশলের মাধ্যমেই কোনো একটি জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনযাপন প্রণালীর অবিকৃত-অকৃত্রিম এবং আনকোরা (First hand) তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যই এ ধরনের গবেষণার জন্য মুখ্য উপাদান। অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি গৌণ বলে বিবেচিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মূলত প্রাথমিক উপাত্ত ভিত্তিক (Primary data)। ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কৌশল অবলম্বনে এ তথ্যসমূহ সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কৌশলেও মাঠ পর্যায় থেকে আনকোরা তথ্য আহরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহীর অন্তর্গত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি প্রত্যন্ত পল্লিতে বসবাসকারী বিন্ধ জাতিগোষ্ঠীর উপর অনুসন্ধান চালানো হয়। এই এলাকাটি সদর থানার গোবরাতলা ইউনিয়নের অন্তর্গত সর্জন গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। মহানন্দা নদীর তীরে এ পল্লিটি ছোট-বড় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ঝোপঝাড়ে সমাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে উত্তাপ যেমন বেড়ে যায়, তেমনি শীতকালে শীতের প্রকোপও বেশি থাকে। শহর থেকে এখানে যাতায়াত করা বেশ কষ্টসাধ্য। কৃষিকর্ম ও মৎস্য শিকার বিন্ধদের মূল উপজীবিকা। তাদের জীবনের সর্বত্র প্রাচীন জীবনধারার ছাপ সুস্পষ্ট। শহরের সাথে এদের যোগাযোগ ও পরিচয় খুবই সামান্য। এর প্রধান কারণ যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা ।

আলোচ্য পল্লিটির চারপাশে হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস রয়েছে। তাই বর্তমান গ্রামটি কোনো একটি বিচ্ছিন্ন বসতি বা সম্প্রদায় নয়, বরং সমজাতীয় ও ভিন্নধর্মী জনগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে পরস্পর অবস্থিত একটি নিবিড় বসতি হিসেবে বিদ্যমান।

বিন্ধদের উদ্ভব ও জাতিগত পরিচিতি

'বিন্ধ' নামের উৎপত্তি ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মধ্যে এখনো যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। উনিশ শতকে ইউরোপীয় গবেষক-প্রশাসক ও খ্রিস্ট ধর্মযাজকগণ এবং পরবর্তীকালে দেশীয় গবেষকগণ বিন্ধদের যথার্থ পরিচয় ও আদি উৎস ভূমি, প্রাচীন বিচরণক্ষেত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অন্যান্য দিকসহ 'বিন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, অনেকে বিন্ধদেরকে Bind, Bin, Bhind and Bhindu বলে অভিহিত করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসক-গবেষক রিজলি বিন্ধদের নামকরণের কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি তাঁর *The Tribes and Castes of Bengal* নামক গ্রন্থে উক্ত জনগোষ্ঠীটিকে 'Bin' বলে উল্লেখ করেছেন (Risley.1891:131-133)।

এছাড়া, আঞ্চলিক লোক কাহিনী, ও আলকাপ* গানের মধ্যে বিন্ধদেরকে 'বিন্দাই'নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিন্ধদের নামকরণ নিয়ে স্থানীয় (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) পর্যায়ে কতক প্রাচীন ধারণা প্রচলিত। কথিত আছে, বিন্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁশ দিয়া সুন্দর করে "বীণা" বা "বিন" অর্থাৎ বাঁশি তৈরি করতে পারে (অনেকে তা দিয়ে সুমধুর সুরে বাজাতে পারে), এ কারণে তাদের নাম হয়েছে বিন বা বিন্ধ।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য

এ কথা অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বিন্ধরা মধ্য পশ্চিম ভারতের বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলের একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী । বিন্ধ্য পর্বতের প্রাচীন বাসিন্দা হিসেবে এ অঞ্চলেব বসতি স্থাপনের পর তাদের নাম পরিচয় হয়ে ওঠে 'বিন্ধ'। সম্ভবত উচ্চারণ বিভ্রাটের কারণে বিন্ধ্য শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে যায়। কালক্রমে বিন্ধ্য→বিন্ধ→

---

* আলকাপ হচ্ছে চাঁপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলের এক ধরনের লোকসংগীত। এই গানের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া স্থানীয় বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরা হয়। এছাড়া, এলাকার পুরনো জোতদার-জমিদারদের নানা ঘটনার স্মৃতিচারণ করা হয়। একাধিক কারণে বিন্ধ জনগোষ্ঠীর কথা এই আলকাপ গানে উল্লেখ করা হয়। কেননা তাদের আহার বিহার ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে ।

বিনদ বা বিন ইত্যাদি রূপ লাভ করে। এদের দৈহিক গড়ন, ভাষা ও জীবনধারাও এ রকম ধারণার পক্ষেই সমর্থন দেয়। ভারতের মধ্য বা পূর্বাঞ্চলের অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাথে এদের যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি মিলও রয়েছে প্রচুর। তবে পশ্চিম ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্বতচারী অনেক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাদের দৈহিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বিন্‌ধরা স্পষ্টত অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ। বিন্‌ধদের দৈহিক গঠনের সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের কোনো কোনো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষভাবে সাঁওতাল, কোচ, মুণ্ডাদের সাথে। বিন্‌ধরা দৈহিক উচ্চতায় মাঝারি ধরনের, দেহের গড়ন সুঠাম, মুখমণ্ডল লম্বাটে। চিবুক ছোট। গায়ের রং কয়লার মতো কালো। মাথা গোলাকার, চুল কালো ও কোঁকড়ানোর প্রবণতা রয়েছে। মুখে দাড়ি-গোঁফ রয়েছে। নাসার প্রান্তভাগ প্রসারিত এবং নাসামূল অবদমিত, কর্ণদ্বয় বৃহৎ ও ঝুলন্ত । চক্ষুদ্বয় ক্ষুদ্রাকৃতির এবং চোখের মণি কালো রঙের। প্রাত্যহিক জীবনে নানা আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস এবং মন-মানসিকতার দিক থেকেও অস্ট্রিক জাতিভুক্ত মানুষদের সাথে বেশ মিল রয়েছে। বিন্‌ধরা বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মতো নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে বসবাস করতে ভালবাসে। আপন সমাজ বা গোষ্ঠীর বাইরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্যদের সাথে তাদের যোগাযোগ খুবই সামান্য। তাই অন্যান্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মতো তাদের মধ্যেও অন্তর্মুখিনতা বিদ্যমান এবং জনমিশ্রণের (Racial admixture) সুযোগ সামান্য।

অন্যদিকে, E.T. Dalton তাঁর *Tribal History of Eastern India* (1872) নামক গ্রন্থে বিন্‌ধদের গোত্র বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিন্‌ধরা একাধিক উপগোত্রে বিভক্ত। তিনি বিন্‌ধদের মধ্য ভারতে বসবাসকারী বৃহৎ গোন্দ (Gond) উপজাতির একটি শাখা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের অনেক উপগোত্র রয়েছে। তন্মধ্যে বিন্‌ধ একটি। এ ক্ষেত্রে ডালটনের মত হলো এই যে, গোন্দ বা বিন্‌ধ যে-যার পূর্ব পুরুষ বা উপগোত্র হোক না কেন, উভয় জনগোষ্ঠী যে মধ্য বা পশ্চিম ভারতের প্রাচীন একটি জনগোষ্ঠী এ কথা অনস্বীকার্য (Dalton, 1872: 278)।

অন্য একটি প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিন্‌ধ ও নুনিয়ারা (Nunias) প্রাচীনকালে সবাই 'বিন্‌ধ' নামে পরিচিত হতো। বর্তমানে নুনিয়ারা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হলেও তারা মূলত বিন্‌ধদের একটি শাখা মাত্র। Sree Sherring এর মতে-বিন্‌ধরা নুনিয়াদের একটি শাখা। আবার অন্যদের মতে নুনিয়ারাই বিন্‌ধদের একটি উপগোত্র । তবে রিজলির মতে,

> It seems not improbable that the Binds may be a true aboriginal tribe, and the Nunias, a functional group, differentiated by taking to the manufacture of earth-salt. (Risley, 1891:131)

'বিন্‌ধ' নামক এ জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও তাদের অতীত পরিচয় সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। তাদের মধ্যে জীবিত প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই সব প্রাচীন লোককাহিনী বলে থাকেন। তাদের আদি বাসস্থান বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলে এ রকম একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। যেমন, একজন পথিক বিন্ধ্য পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে অদূরে বাঁশির সুর শুনতে পায়। পথিকের ধারণা যে, ঐ বাঁশির সুর যেন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত একটি বাঁশ ঝাড় থেকে আসছে। আগন্তুক শুনতে পায় যে, কেউ যেন ঐ বাঁশ ঝাড়ে খুব জোরে জোরে বাঁশ কাটছে। বিন্‌ধরা মনে করে যে, ঐ বাঁশের ভিতর থেকেই একজন মানুষ জন্ম নেয়। আর ঐ মানুষটিই বিন্‌ধদের পূর্বপুরুষ (Ancestor)। এ কারণে বিন্‌ধরা বাঁশের বাঁশি বাজাতে বিশেষ পারদর্শী। এ সব পৌরাণিক কাহিনী তাদের মর্ম মূলে ঠাঁই পেয়েছে।

অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এসব পৌরাণিক কাহিনী, গোত্র বিভাজন, খাদ্য, পেশা এবং নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্য দিয়ে বিনধ্‌দের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। বিন্‌ধদের অবিরাম স্থানান্তরগমনের (Migration) এ প্রবণতা ও তার বিবরণ তাদের স্মৃতিপটে ঝাপসা কল্পকথা হিসেবে টিকে রয়েছে । তাই তাদের উদ্ভবের ও প্রাচীন সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ হয়তো আর কোনোভাবেই জানা সম্ভব হবে না।

গোত্র বিভাজন

গোত্র বা টোটেম ভিত্তিক সমাজবিন্যাস বিন্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। ঐতিহ্যগত অনেক রীতিনীতি ও প্রথা-প্রতিষ্ঠান বিন্ধ সমাজ থেকে ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলেও টোটেমের ধারণা সুস্পষ্টভাবে টিকে আছে। তাই সমাজ সংগঠনের অন্যতম নির্ধারক হিসেবে টোটেমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বিন্ধের ভিতর বিদ্যমান একাধিক টোটেমের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে তিওর ও চতরি (Tiour & Chatri) অন্যতম। রিজলি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে খরিয়াত (Khariát) এবং গোন্দ নামে দু'টো উপবর্ণের (Sub castes) কথা উল্লেখ করেন। ধারণা করা যায়, বর্তমানেও বিন্ধদের ভেতর তিওর ও চতরি নামে যে দুটো টোটেম ভিত্তিক গোত্র রয়েছে। বিভিন্ন নথি-পত্রের তথ্য এবং স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের ভাষ্য অনুযায়ী বিন্ধরা তিনটি উপগোত্রে বিভক্ত । যথা জাতাউৎ বিন (Jutaut Binds) নুন বিন (Nun Binds) এবং বিন (Bin)। আসলে বিন্ধদের গোত্র বিভাজন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুবই দুষ্কর। দেড় শতকেরও বেশি সময় পূর্বে বিন্ধদের উপর প্রথম তথ্য অনুসন্ধান করা হলেও বিন্ধদের গোত্র বিভাজনের বিষয়টি বলতে গেলে এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, যদিও বিন্ধরা একাধিক গোত্রে বিভক্ত তবু তাদের ভেতর বহির্বিবাহ রীতি (Exogamy) বিদ্যমান নেই।

ভাষা

বিন্ধদের নিজস্ব বর্ণমালা বা ভাষার লিখিত রূপ নাই। তাই তাদেরকে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের ভাষায় অনক্ষর সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী বলা যায় । তবে রিজলি ও ডালটন উভয়ই বলেন যে, বিন্ধরা ভারতের বিহার ও ছোট নাগপুর এলাকায় বসবাস করার সময়ে যে ভাষায় কথা বলতো, তা প্রাচীন মুণ্ডারি ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত। এ সম্পর্কে রিজলি আরো বলেন যে, গোন্দ ও খারয়তরা যে ভাষা ব্যবহার করতো তার সাথে সাঁওতালি ভাষার অনেক ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। সাঁওতালরাও অস্ট্রোমুণ্ডারি ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানের বিন্ধদের পূর্বপুরুষরাও ঐ ভাষায় কথা বলতো। এ কথা ঠিক যে, বর্ণমালা না থাকলেও বিন্ধদের নিজস্ব কথ্য ভাষা রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ভাষার লিখিত রূপ নেই কথ্য রূপ আছে। বরেন্দ্র ভূমিতে বসতি স্থাপনের সময়ে বিন্ধদের সমসাময়িক যে সব জনগোষ্ঠী এসে ছিল তাদের ধারণা যে, বিন্ধরা এক সময়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু বর্তমানে তা বিলুপ্তপ্রায় । বর্তমানে বিন্ধরা বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের দাবি করলেও এর পিছনে বাস্তব কোনো প্রমাণ নেই । যা হোক, বিন্ধরা যে বহু পূর্বেই তাদের নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেলেছে তা ডালটনের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়। তিনি বলেন: "They have lost all trace of their original language" (Dalton, 1872: 272)। এখন বাংলাদেশের বিন্ধরা কথা বলার সময় বাংলা ও হিন্দি শব্দ মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করে থাকে। তবে তারা মূলত অস্ট্রো-মুণ্ডারি ভাষা পরিবারের কোনো হারানো শাখার মানুষ এতে সন্দেহ নেই।

পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, বিন্ধদের দৈনন্দিন জীবনে যুগপৎ সংগ্রামশীলতা ও সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাথে তাদের সংগ্রাম অবিরাম। এরা প্রকৃতির কোলেই মানুষ, প্রকৃতির মতোই এদের অন্তর সরলতায় পরিপূর্ণ। সেজন্য সরলতা ও সততাকে তাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা যায়। বিন্ধরা খুবই পরিশ্রমী। নারী-পুরুষ সারাদিন মাঠে-ময়দানে কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত। ইদানীং মৎস্য শিকার তাদের জীবন ধারণের অন্যতম অবলম্বন। তাই অধিকাংশ সময়ে তারা বিলে-ঝিলে ও নদীতে মাছ ধরে অতিবাহিত করে থাকে।

বিন্ধরা আনন্দ উল্লাস প্রিয় জনগোষ্ঠী। তারা নৃত্যগীত ও ঘরে তৈরি মদ্য প্রিয় একটি গোষ্ঠী। তারা খুবই অতিথিপরায়ণ। বিন্ধদের মধ্যে এখনো ব্যক্তিগত উপলব্ধির চেয়ে সমষ্টিগত চেতনাই প্রবল। তারা অতীত ও বর্তমানের জোতদার, মহাজন, দালাল, সরকারি কর্মকর্তা, প্রশাসনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার ছিল এবং বর্তমানে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অবজ্ঞা প্রভৃতির সঙ্গে নিত্য পরিচিত। তবু তারা সাধারণত কারো সাথে সহজে বিবাদ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, অতিথিপরায়ণতা তাদের জাতিগত চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। এরূপ কঠোরতা ও কোমলতা তাদের জাতিগত চরিত্রে মিলেমিশে এক অনুপম রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে

ক্রমশ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে তাদের সমাজ ও কর্মজীবনে নতুন ধারার সূচনা হয়েছে।

বিন্‌ধদের জীবনযাত্রার

কোনো মানবগোষ্ঠীর পরিচিতি শুধু তার ধর্ম-কর্ম, আস্থা-বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কর্মে ও আচার-আচরণে যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিবাহ, আমোদ-প্রমোদ, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

অর্থনীতি

প্রাকৃতিকভাবে বিন্‌রা ছিল শিকারি ও যাযাবর জনগোষ্ঠী। যখন তারা এ দিকে আগমন করে ও বসতি গড়ে তুলতে থাকে তখন তারা অনেকাংশে আহরণ-শিকার অর্থনীতির (Hunting and gathering economy) দশায় বিদ্যমান ছিল। বিন্‌ধরা পরবর্তী কালে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও চারপাশের সামাজিক পরিস্থিতির রূপান্তরের ফলে তাদের প্রাচীন সংগ্রাহক ও শিকারি জীবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ক্রমশ এরা প্রতিবেশী কৃষি জনগোষ্ঠীর অনুকরণে জীবনধারাকে বদলাতে শুরু করে। এখন বিন্‌ধরা অনেকটা কৃষিজীবী ধাঁচে জীবনযাপন করে থাকে। তবে এখনো তাদের জীবনধারা মূলত জীবন-ধারণ অর্থনীতি ভিত্তিক (Subsistance economy)। এ ছাড়া এরা ইদানীং মৎস্যজীবী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং স্থানীয় জলাশয় থেকে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরে জীবিকার্জন করছে। উল্লেখ্য, অতীতে বিন্‌ধরা মাটি কাটা, লবণ তৈরি এবং পালকি বহনের কাজও করতো। বাংলাদেশের বিন্‌ধরা, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, সকলেই ভূমিহীন। তবে অনেকেরই নিজস্ব ক্ষুদ্রায়তন বাস্তুভিটা আছে।

খাদ্যাভ্যাস

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অতীতে পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করার সময়ে বিন্‌ধরা আহরণ ও শিকার ভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবনযাপন করত। এমনকি, বরেন্দ্র অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পরেও তাদের প্রাচীন অর্থনৈতিক জীবনধারা কতকাংশে অক্ষুণ্ন ছিল । তখন এই অঞ্চলে বন-জঙ্গল ও ছোট বড় জলাশয় ছিল অনেক। এই বন বাদাড়ে ফলমূল, লতা-পাতা ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ এবং নানা রকম বন্য প্রাণী পাওয়া যেতো, যা তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকার অপরিহার্য অংশ ছিল । তবে ভাত-মাছ ও শাক-সবজিই বিন্‌ধদের এখন প্রধান খাদ্য। তাছাড়া, গম, যব, মটর ও কালাইয়ের রুটি তারা পছন্দ করে। এ ছাড়াও তারা খাদ্য হিসেবে শূকর, ইঁদুর, কচ্ছপ, কাঁকড়া ও খরগোশের মাংস ভক্ষণ করে। তারা শুকনো চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও দুধ-দৈ পছন্দ করে এবং এসব তৈরিও করতে পারে। তবে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য, যেমন—বিড়ি, হুকা ও তামাকের পাতা নিয়মিত ব্যবহার করে। নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের মদ/চুয়ানি (Indigenous drinks) বিন্‌ধরা পান করে থাকে। অনেক মহিলাও এ সব পান ও নেশা করে । তারা খুব পান-সুপারি প্রিয়। এটি তাদের একটি প্রাচীন অস্ট্রিক বৈশিষ্ট্য।

পোশাক পরিচ্ছদ

বিন্‌ধদের পোশাক পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ। অতীতে পুরুষরা লেংটি পরতো। মেয়েরা ঘাগড়া ও ছোট একখণ্ড কাপড় বুকে জড়িয়ে থাকতো। এখন বিন্‌ধরা অধিকাংশ সময়ে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও গামছা ব্যবহার করে। অন্যদিকে, মেয়েরা শাড়ি, পেটিকোট ও ব্লাউজ ব্যবহার করে থাকে। কমবয়সী ছেলেরা হাফ প্যান্ট, শার্ট এবং মেয়েরা সালোয়ার, কামিজ, ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার করে। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে কিংবা শহরে গেলে অনেকেই শার্ট-প্যান্ট, জুতা পরিধান করে থাকে।

বিন্‌ধ মেয়েরা খুব সৌন্দর্য প্রিয়। বিভিন্ন উৎসবে তারা সাজগোজ করে থাকে। যেমন, সুন্দর ও উঁচু করে মাথায় খোপা বাঁধে এবং নানা রংঙের ফুল ও ফিতা দিয়ে মাথাকে সাজায়। এছাড়া, তাদের চুড়ি, নাকফুল, মালা বা হাসলি ব্যবহার করতে দেখা যায় ।

বাড়ি-ঘর ও আসবাব পত্র

বিন্‌ধদের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ছোট ছোট। বাড়ি তৈরির জন্য তারা খড়, পাতা, মাটি ও বাঁশ ব্যবহার করে থাকে। দুই/একটি পরিবারের ঘরের ছাদ টিন বা টালির হলেও বেড়া বাঁশের তৈরি। বেশির ভাগ ঘরের বারান্দা রয়েছে। রান্নাঘর নেই বললেই চলে। অধিকাংশ পরিবার উঠানের ফাঁকা জায়গায় রান্না করে । তবে বর্ষা মৌসুমে ঘরের বারান্দা রান্না ঘর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। বিন্‌ধরা ঘর-বাড়ি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। বিভিন্ন উৎসবে তারা বাড়ি-ঘর আলপনা দিয়ে সাজায়।

রান্নার জন্য বিন্‌ধরা যে চুলো ব্যবহার করে তাতে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তারা একমুখ চুলার চেয়ে দুই মুখ বিশিষ্ট চুলা বেশি ব্যবহার করে থাকে। আসবাব পত্রের মধ্যে তারা বাঁশ, কাঠ ও পাটের রশি দিয়ে তৈরি খাটিয়া ব্যবহার করে। এছাড়া, তাদের পিড়ি, টুল এবং খড়ের মোড়া ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিন্‌ধরা মাটির হাড়িসহ বিভিন্ন ধাতব বাসন-পত্র ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, দৈনন্দিন কাজের জন্য তারা কোদাল, নিড়ানি, ঝাড়ু, টুকরি, দা, বটি, হাসুয়া, ডালা, কুলাসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার জাল, ফাঁদ ও নৌকা ব্যবহার করে । কৃষি কাজের জন্য প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বিন্‌ধদেরকেও নানা ধরনের কৃষি কাজের হাতিয়ার ব্যবহার করতে দেখা যায়। পূর্বে বিন্‌ধরা পশু-পাখি শিকার করলেও সম্প্রতি শিকার করার প্রবণতা কমে আসছে। ফলে শিকারের উপকরণ খুব কম লোকেরই দেখা যায়।

পারিবারিক উৎসব

বিন্‌ধরা উৎসব প্রিয় জাতি। তারা বর্ষচক্রব্যাপী বিভিন্ন ধরনের উৎসব পালন করে থাকে। তন্মধ্যে জীবনের ক্রান্তিকাল ভিত্তিক অনুষ্ঠান, যেমন—জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক উৎসবই (Rites de passage) প্রধান। সব অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও বিবাহ ও পালা পার্বণ যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা সহকারে সম্পন্ন হয় ।

জন্মোৎসব

পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর বিন্‌ধরা অন্য জনগোষ্ঠীর মতোই আনন্দ প্রকাশ করে। এ সময়ে আঁতুড় ঘর জাল দিয়ে ঘিরে দেয় এবং ঘরের দরজায় নিম, জিগ্‌নি বা জিগা গাছের শাখা পুঁতে দিয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এর ফলে প্রসূতি কিংবা নবজাতকের উপর অপদেবতার কোনো অশুভ নজর (Evil eye) পড়বে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বাঁশের চটা (বাঁশের গায়ের পাতলা সবুজ অংশ) দিয়ে শিশুর নাড়ি কাটা হয়। শিশুর নাড়ি কাটার কাজটি ধাই (মুচি/চর্মকার মহিলা) করে। অতীতে তাদের সমাজের বয়স্কা মহিলারা শিশুর নাড়ি কাটার কাজটি করতো। সম্প্রতি শিশুর নাড়ি কর্তনের কাজটি ব্লেড দ্বারা করে থাকে। তবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নাড়ি কাটার সময় ধাই বাঁশের চটা হাতে রাখে। শিশুর নাড়ির কর্তিত অংশ নদী বা জলাশয়ে ফেলে দেয়। তাদের বিশ্বাস ঐ নদীর স্রোত যতদিন প্রবাহিত হবে ততোদিন ঐ শিশুটি জীবিত থাকবে এবং শিশুর স্বভাব চরিত্র নদী বা জলাশয়ের পানির মতই স্বচ্ছ হবে। শিশু জন্ম গ্রহণের পর সপ্তম দিবসে মাথার চুল কামানো হয়। ঐ রাতকে বিন্‌ধরা 'সাটিয়া' রাত বলে। তারা 'সাটিয়া' পালন উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করে। শিশুটি যদি ছেলে হয় তবে ঐ দিন টাকি মাছ ও বিভিন্ন ধরনের সবজি দিয়ে তরকারি রান্না করা হয়। তাছাড়া, তারা ঐ মাছ ও সবজির কিছু অংশ রান্নার আগে নবজাতকের গায়ের নিচে রাখে। তাদের বিশ্বাস, এতে শিশুটি ভবিষ্যতে একজন ভাল সবজি চাষি ও মৎস্য শিকারি হবে। অন্যদিকে, মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে শুধু সবজি রান্না করা হয় ও গায়ের নীচে কাচাঁ সবজি রাখা হয়। তাদের ধারণা, ঐ মেয়ে শিশুটি বড় হলে একজন ভাল সবজি চাষি ও সবজি ক্ষেত পরিচর্যাকারী হতে পারবে। এসব রীতি তাদের প্রাচীন আহরণ ও শিকার অর্থনীতির সাক্ষ্য বহন করে। নবজাতকের সপ্তম দিবসে চুল কামানো না গেলে তিন মাস, সাত মাস, নয় মাস পর্যন্ত দেরি করা যেতে পারে। নবজাতকের চুল কামানো না হওয়া পর্যন্ত নাম রাখাও নিষেধ (Taboo)। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতির অশুচিতা দূর হয়। ইদানীং অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে তাদের এ সব আনুষ্ঠানিকতা ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

বিবাহ সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান

সাধারণত সকল সমাজেই বিবাহকে ব্যক্তি জীবনের কল্যাণকর দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিন্‌ধ সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। বিন্‌ধ জনগোষ্ঠী বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্তঃবৈবাহিক দল (Endogamous group)। বিন্‌ধদের ভেতর অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিন্‌ধ সমাজে নারীর সতীত্বের উপর অতিশয় গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা তাদের ধর্মীয় বিধান। বিয়ের ব্যাপারে প্রথমে বর ও কনের অভিভাবকের মধ্যে কথা হয়। বিয়ের আলাপ-আলোচনার প্রথম পর্যায়টি শেষ হবার পর পাড়ার মোড়লের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। যদি বর ও কন্যা উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ সম্পর্কিত কোনো অসুবিধা না থাকে, তখন মোড়ল বিয়ের দিন ও শুভক্ষণ ঠিক করে দেয়। বিয়ে ঠিক হবার পর নির্ধারিত তারিখে বরযাত্রী মেয়ের বাপের বাড়িতে হাজির হয়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বরপক্ষ কন্যার বাড়ির উঠানে অপেক্ষা করে। উল্লেখ্য, বিন্‌ধদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বর ও পাত্রীর বিয়ে প্রথমে বর পক্ষের আনা সিঁদুরের কৌটার সাথে বিয়ে হয়। এটাকে তারা 'কৌটা বিয়ে' বলে। এ আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর পাড়ার অধিকাংশ সমগোত্রীয় লোকের উপস্থিতিতে বিয়ের বাকি কাজ সম্পন্ন হয়। বিন্‌ধ সমাজে বাল্য ও বহু বিবাহের প্রথা চালু আছে। একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হয়। যদি কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়, তবে ঐ স্বামী/ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে যে, তার প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা।

উল্লেখ্য, যদিও এ ধরনের প্রথা বিন্‌ধ সমাজে এক সময় খুব চালু ছিল, বর্তমানে তারা এ সব রীতিনীতিকে আর অনুসরণ করে চলে না।

বিন্‌ধদের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। একজন বিধবা তার মৃত স্বামীর ছোট ভাই বা রক্ত সম্পর্কের (মামাতো, ফুফাতো, খালাতো) জ্ঞাতিভাইকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। তবে কখনই মৃত স্বামীর বড় ভাই কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিভাইকে (মামাতো, খালাতো ভাই) বিয়ে করা যাবে না। লক্ষণীয় যে, তাদের প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের (সাঁওতাল, কোচ, মালো, মালপাহাড়ি ইত্যাদি) মধ্যে মৃত স্বামীর ছোট কিংবা বড় ভাইকে বিয়ে করা যেতে পারে। রিজলি বিন্‌ধদের বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বলেন:

> A widow is allowed to marry again by the sagai form, but is expected to marry her deceased husband's younger brother or younger cousin... Under no circumstances may she marry her late husband's elder brother or elder cousin" (Risley, 1891: 131).

বর্তমান বাস্তব অবস্থার সাথে রিজলির বক্তব্যের বেশ মিল আছে। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে এরূপ বিধান থাকার জন্য অনেক বিধবা দ্বিতীয় বিয়ে না করেই জীবনযাপন করে।

বিন্‌ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও বিধবা বিবাহের রেওয়াজ থাকলেও সমাজ ও ধর্ম বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) অনুমোদন করে না। কেউ যদি সগোত্রের বাইরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে একঘরে করে রাখা হয়। সমাজে সে অধঃপতিত বলে গণ্য হয়।

বিয়ের সময় বিন্‌ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বরকে উপঢৌকন হিসেবে নগদ অর্থ, নতুন কাপড়, রান্নার জন্য বাসনপত্র, কাঁথা-বালিশ ও পান-সুপারি দেওয়া হয়। আবার অনেক সময়ে বর পক্ষও নববধূকে কিছু নতুন উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্য সহকারে বরণ করে থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠান

বিন্‌ধ সমাজে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে জরুরি ভিত্তিতে পাড়ার মোড়লকে খবর দেওয়া হয়। সংবাদ পাওয়া মাত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশীরা সবাই সমবেত হয়। বিন্‌ধরা নতুন কাপড় দিয়ে মৃতদেহ মুড়িয়ে দেয় এবং নানা ধরনের লতা-পাতা, শাক-সবজি এ সময়ে মৃত ব্যক্তির নিকট হাজির করে। এছাড়া, মৃতব্যক্তির কাছে ছোট মাটির পাত্রে সরিষার তৈল ও নতুন কাপড় দিয়ে সলতে (ফিতা) তৈরি করে

আগুন ধরিয়ে দিতে দেখা যায়। তাদের বিশ্বাস, এই প্রদীপ মৃত ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্তার নিকট যেতে পথ দেখাতে সাহায্য করবে (ভোদন, ২৭.০২.০১)। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিন্ধরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ কিংবা দাহ উভয়ই করে থাকে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কবরস্থান নেই। ফলে দূরে নদীর পাড়ে কিংবা জলাশয়ের ধারে তারা মৃতদেহ কবর দেয়। মৃতদেহ সমাহিত করে সবাই স্নান সেরে বাড়ি ফেরে। উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ (যদি কিছু থাকে) মরণোত্তর আচার অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয় না।

সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান

বিন্ধ সম্প্রদায় বর্ষচক্রব্যাপী নানা ধরনের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। তাদের উৎসবের প্রাণ হলো পানাহার ও নৃত্যগীত। অঞ্চল ভেদে উৎসবাদির একটু হেরফের পরিলক্ষিত হলেও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ইদানীং হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, যেমন শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও গঙ্গা পূজায় তারা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করে। বিন্ধদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও বার্ষিক উৎসবাদির সাথে হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও বিন্ধরা মূলত সর্বপ্রাণবাদী। কিন্তু সম্প্রতি তারা হিন্দুদের অনুকরণে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। তবে এখনো বিন্ধরা হিন্দুদের এসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে না। মূলত বিন্ধরা সর্বপ্রাণবাদী এবং নানা অদৃশ্য ভূত প্রেত ও প্রাণীর প্রতি ভক্তি ও ভয় পোষণ করে থাকে। বাংলা বৎসরের শুরু থেকেই বিন্ধদের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার অথবা শুক্রবার দেবতার উদ্দেশ্যে পাঁঠা বলি দিয়ে থাকে। এ উপলক্ষে দুধ ও চাউলের পায়েস তৈরি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে। এ সবের কিছু অংশ তারা দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে থাকে। শ্রাবণ মাসে পিঠা তৈরি করে কাল্পনিক দেব-দেবীর উদ্দেশে ভোগ দেয়। নারী পুরুষ সবাই এ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারলেও বিধবাদের জন্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

ভাদ্র মাসে শরৎকালীন উৎসবে বিন্ধরা কলার গাছের বাকল দিয়ে নৌকা তৈরি করে এবং এ নৌকায় বিভিন্ন ফলমূল, শাক-সবজি, সিদুঁরের টিপ ও মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কার্তিক মাসে লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশে জমির চার কোণায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখে বিন্ধরা 'তেয়ারি' উৎসব পালন করে থাকে। ঐ দিন গবাদি পশুকে তারা গোসল করায় । এ সময়ে গরু-মহিষের শিং ও কপালে তৈল ও সিঁদুর লাগিয়ে দেয়। তাছাড়া, এসব পশুর গলায় ধান-দূর্বা ঘাস বেঁধে দিতে দেখা যায়। চৈত্র হচ্ছে বাংলা সনের শেষ মাস। এই মাসের শেষ শুক্রবার অথবা সোমবার দিবাগত রাত্রে পাড়ার সবাই কারো বাড়ির উঠানে গান-বাজনার উৎসবে মিলিত হয়। উল্লেখ্য, ঐ অনুষ্ঠানে তাদের পুরোহিত কাশী বাবা ও তাদের ধর্মীয়/পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বিন্ধ সমাজে সারা বছর ধরে নানা উৎসব পালিত হয়। শত কষ্ট-ক্লেশের মধ্যেও তারা সামাজিক উৎসবগুলো পালন করে থাকে ; সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত উৎসবাদির পেছনে প্রবল ধর্মীয় অনুভূতিই কাজ করে থাকে।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা

পৃথিবীর অসংখ্য আদিম জনগোষ্ঠীর মতো বিন্ধরাও প্রকৃতি-পূজারী এবং সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। মূলত তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি ধর্মীয় ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা কতিপয় অদৃশ্য ও অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বিধির মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এক জটিল আধাত্ম ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে।

বিন্ধদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা। আগে উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড়, পাথর, জলাশয়, নদী, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ভূমি (শস্যক্ষেত্র), নানা ধরনের প্রাণী ও অনুরূপ নানা প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে কতক অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় সত্তার উৎসমূল হিসেবে তারা শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকে। এছাড়া, তারা বহু অশরীরী অথচ অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন ভূত-প্রেতকে ভয় ও ভক্তি করে। বিন্ধরা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে

ও পাটকাঠির মাথায় আগুন ধরিয়ে উপাসনা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, এই আগুন সৃষ্টিকর্তার এক ধরনের শক্তি, যা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ধরনের উপদ্রবের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করবে। ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, বিহার) কোনো কোনো এলাকার নিচু বর্ণের জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে বিন্ধদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিন্ধদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ যেমন একদিকে পার্থিব জীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে আয়োজিত হয়, তেমনি অন্যভাবে বলা যায়, তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থা ধর্মবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণ

বিন্ধদের রাজনৈতিক সংগঠন ও আচরণ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিন্ধদের রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রে রয়েছে জ্ঞাতিগোষ্ঠী সম্পর্ক এরা প্রধানত জ্ঞাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বসতি গড়ে তোলে। সেজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ও রাজনৈতিক আচরণ একই বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। বিন্ধ সমাজে দুই স্তর বিশিষ্ট নেতৃত্বের ধারা পরিলক্ষিত হয়। মোড়ল হচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। মোড়ল সমাজের শীর্ষ ব্যক্তি বা গোত্রপতি তিনি সমাজের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে সমাজের নেতৃত্ব দান করেন। বিবাহ, মৃত্যু, বিবাদ, মীমাংসা সব কিছুতে মোড়লই গোত্রের নির্ধারক। দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে ছোটকা মোড়ল ও সাধি মোড়ল। ছোটকা মোড়ল সমাজের দ্বিতীয় নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি এবং স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ছোটকা মোড়ল পাড়ার ছোট খাট বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা করে থাকেন। তিনি মূল মোড়লের একজন সহযোগী হিসেবেও কাজ করেন। মূল মোড়ল নিজ সমাজের মধ্যে নেতৃত্ব দান করেন এবং প্রতিবেশী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বয়কারী বা যোগসূত্র স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করেন। বিন্ধদের সাথে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব বিরোধ হলে সেক্ষেত্রে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রেও ছোটকা মোড়ল তাকে সহযোগিতা করেন। সাধি মোড়ল মূলত বিন্ধ সম্প্রদায়ের পুরোহিত বা ধর্মীয় নেতা। তিনি বিভিন্ন উৎসবাদিতে পৌরোহিত্য করেন। তার নেতৃত্বেই বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত/ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সম্প্রদায়ের কারো উপর ভূত-প্রেতের আছর হলে কিংবা রোগ বালাই হলে তাবিজ কবজ প্রদান করেন। ভূত পেত্নী বিতাড়নের জন্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন। বিন্ধরা ক্রমশ বাংলাদেশের মূল রাজনৈতিক ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কিংবা স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের সাথে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। মোড়ল তার নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে মুখপাত্র হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকেন। মোড়ল আপন সম্প্রদায়ের জন্ম, বিবাহ ও বিবাদ মীমাংসায় প্রধান ব্যক্তি। মোড়লের পদটি একটি পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে অর্জিত হয়। অর্থাৎ একজন মোড়লের মৃত্যুর পর তার পুত্রই মোড়লের দায়িত্ব লাভ করে। বিন্ধরা ক্রমশই জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে। পরিলক্ষিত হয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন নির্বাচনে তাদের অনেকেই ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যায়। তবে এক্ষেত্রে তারা মোড়লের নির্দেশ মোতাবেক ভোট দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এটা তাদের গোত্র ভিত্তিক প্রাচীন জীবনধারার পরিচায়ক।

উপসংহার

বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র জাতি বিন্ধদের পূর্বপুরুষরা ভারতের বিন্ধ্য পর্বতাঞ্চলের অধিবাসী ছিল। তাদের ভাষা ও আচার ঐতিহ্যে আজও এর প্রমাণ মেলে। আশেপাশের বসবাসকারী অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মতো বিন্ধরা আহরণ ও শিকারি জীবন পরিত্যাগ করে কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

বিন্ধরা বাংলাদেশে কয়েক শতক ধরে বসবাস করলেও এদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংখ্যা স্বল্পতা এর অন্যতম কারণ। স্থানীয় জনগণও তাদের সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোচ প্রভৃতি গোষ্ঠীর সাথে একাকার করে দেখতে অভ্যস্ত। কঠোর জীবন সংগ্রামের কারণে বিন্ধরা তাদের স্বকীয়তাকে কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। বরং তাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ ঢাকা পড়ে গেছে। জৈবিক

উত্তরাধিকার ও জীবনযাপন রীতিসহ বহু ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও কালের প্রবাহে পারিপার্শ্বিক সমাজ সমূহের অদৃশ্য চাপের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে। এরা এখন একটি দ্রুত বিলিয়মান সম্প্রদায়। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে যাবার পূর্বেই তাদের সমাজ-সংস্কৃতি তথা সমগ্র জীবনধারা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

তথ্যনির্দেশ

Dalton, E.T. *Tribal History of Eastern India*. Delhi, Cosmo Publication, 1973.

_____ .*Descreptive Ethnology of Bengal*. Calcutta,Office of the Superintendent of government printing, 1872.

Majumder, R.C. *The History of Bengal*. Vol-1, Dacca, Dacca University, 1943.

Maloney, C. "Bangladesh and its People in Prehistory`` *I.B.S. Journal*, Vol-ll, 1977.

Risley, Sir. H.H .*The Tribes and Castes of Bengal*. Calcutta, 1891.

সাক্ষাৎকার

সন্তু মোড়ল (৭৫), বিন্ধ নেতা, তাঁর নিকট থেকে বিন্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়।

ভোদন বিন্ধ (৬৫), পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি, তিনি ধর্মীয় ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

ধানকল চাতালে কর্মরত শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন ও জীবিকা

রেজা হাসান মাহমুদ*
রায়হানা আখতার জাহান†

Abstract: There are so many husking mills in Bangladesh. These are situated mainly at the suburban areas. Most of the workers of the husking mills are women. The works of the husking mills are very hard as well as risky. They also work in unhygienic environment. They are not permanent workers. In this article the authors tried to analyze the socio-economic conditions, mode of works and job-satisfaction of the women workers of the husking mills.

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলারা সাধারণত কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে অভ্যস্ত নন। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা সম্পূর্ণরূপে স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্যের আয়ের ওপর নির্ভরশীল এবং গৃহস্থালি ও সন্তান পালনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। যে সমস্ত এলাকায় (বিশেষ করে শহরতলি অঞ্চলে) কিছু কলকারখানা রয়েছে, তার আশেপাশের দরিদ্র শ্রেণীর মহিলারা এ ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। জীবন ও জীবিকার তাগিদে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়া বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ নতুন প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নামমাত্র মজুরিতে দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তাহীনতা, নিয়োগকর্তার সন্তুষ্টি ইত্যাদির মধ্যেই তাদের কর্মজীবন অতিবাহিত করতে হয়। জীবন ও জীবিকার এই অসহায় চিত্রই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য ।

বাংলাদেশে মহিলাদের অর্থনৈতিক কর্মহার দক্ষিণ এশিয়ার গড়পড়তা হারের চেয়ে দুই গুণেরও বেশি। শ্রম শক্তিতে মহিলাদের অনুপাত বেশি হওয়া সত্ত্বেও মোট অর্জিত আয়ে মহিলাদের হিস্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশ।[১] এদেশে চরম দরিদ্র জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫২%, স্বাস্থ্য সেবায় প্রবেশগম্যতা নেই শতকরা ৫৫ ভাগ লোকের। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর ৭৫%।[২] এ দেশে একজন মেয়ে জীবন শুরু করে সুবিধাহীনতার মধ্যে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে-শিশুর জন্ম পরিবারে আনন্দের সাড়া সৃষ্টি করে না।[৩] পরিবারে মেয়েরা রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা এবং গোটা পরিবারকে ভালবাসা দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। এ দেশের অনেক পরিবারেরই যথেষ্ট সম্পদ নেই বলে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও বাইরের কাজে অংশগহণ করতে বাধ্য হতে হয়।[৪] পরিবারে মহিলাদের উল্লিখিত উপার্জনই পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ, বিশেষ করে, খাওয়ার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।[৫]

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত ধানকল চাতালে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত মহিলাদের জীবন ও জীবিকার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ধানকলগুলোতে মেয়েদের কাজ প্রধানত বয়লারে ধান সেদ্ধ করা ও শুকানো । এ কাজে ৪/৫ জন মহিলার একটি দল সাধারণত ৩/৪ দিন কাজ করে ১০০ মন ধানের জন্য মজুরি

* রেজা হাসান মাহমুদ, ইনস্ট্রাক্টর, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
† রায়হানা আখতার জাহান, প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ

হিসেবে পান নগদ ৩৫০ টাকা এবং ২০ কেজি চাউল। এভাবে একজন মহিলা দৈনিক গড়ে প্রায় ১৫ থেকে ২০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৪৫০ থেকে ৬০০ টাকা আয় করতে পারেন। লক্ষণীয় যে বাংলাদেশে সরকারি শিল্প কলকারখানায় কর্মরত একজন অদক্ষ শ্রমিক যার ব্যয়কে ধরা হয় "জীবনের জন্য ন্যূনতম", তাঁর শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য মাসে ৬৩৪ টাকা প্রয়োজন বলা হয়েছে।[৬]

নারী জাগরণের এই যুগে এ দেশের শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ, কাজের পরিবেশ, তাদের পরিবার ও জীবন-যাপন প্রণালী, মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পর্যালোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য কুষ্টিয়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত জগতি ইউনিয়নের ধানখলা বা চাতালসমূহের মোট ১২০ জন মহিলা শ্রমিককে উদ্দেশ্যমূলকভাবে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে কাজ ও কাজের পরিবেশ, তাঁদের পারিবারিক জীবন, মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি প্রভৃতি অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

একজন মানুষ কতোটা গরিব তা বোঝার জন্য তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বলতে অর্থের অপর্যাপ্ততার চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়।[৮] দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলে তাই থাকতে হবে প্রতারণামুক্ত ও অমানবিক পরিবেশমুক্ত কাজের সুযোগ।[৯] আলোচ্য প্রবন্ধে এসব দিক সর্তকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যনির্ভর এই গবেষণার জন্য জরিপ পদ্ধতি অনুসরণে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সরাসরি গবেষণা এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক পটভূমি

কুষ্টিয়া সদর থানার অন্তর্গত জগতি ইউনিয়নে ছোট-বড় প্রায় ৩০০টি ধানখলা (চাতাল) গড়ে উঠেছে। গড়ে প্রতিটি ধানখলায় ২০ জন শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা। কমবেশি বছরের সব সময়ে এ কাজ চালু থাকে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা এখানে কাজে আসেন। শ্রমজীবী এই মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, কাজে আসার ইতিহাস এবং কাজের পরিবেশ তুলে ধরা হলো।

শ্রমজীবী মহিলাদের জীবন ও জীবিকার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যালোচনায় উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে যে বিভিন্ন ধরনের চলক সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উত্তরদাতার বয়স, অভিজ্ঞতা, ধর্ম ইত্যাদি অন্যতম। নিম্নের সারণিতে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।

সারণি ১

শ্রমজীবী মহিলাদের বয়স,অভিজ্ঞতা ও ধর্ম

বয়স	উত্তরদাতা N=১২০
৩০ বছর পর্যন্ত	৪০%
৩১ হতে ৪৫	৪৫%
৪৬ হতে উর্ধ্বে	১৫%
মোট	১০০%
অভিজ্ঞতা	
২ বছর পর্যন্ত	৫৫%
৩ হতে ৫ বছর	৪০%
৬ থেকে উর্ধ্বে	৫%
মোট	১০০%
ধর্ম	
মুসলমান	৯৫%
হিন্দু	৫%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশির ভাগ উত্তরদাতার বয়স ৩১ থেকে ৪৫ বৎসরের মধ্যে (৫৫%), ৩০ বৎসরের কম বয়সী মহিলা রয়েছে ৪০% । কমপক্ষে ২ বৎসর ধরে কাজ করছেন এমন শতকরা ৫৫ ভাগ, ৪০% মহিলা ৩ থেকে ৫ বৎসর ধরে কাজ করছেন । কর্মরত মহিলাদের শতকরা ৯৫ ভাগই মুসলমান

(সারণি ১)। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সাধারণত ২০ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহিতা মহিলাদের সন্তান হওয়ার পর সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। তখন শুধুমাত্র স্বামীর রোজগারে সুষ্ঠুভাবে সংসারের ব্যয়নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। তখন সংসারের ব্যয়নির্বাহে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীও রোজগারের পথ খুঁজতে থাকেন।

শ্রমজীবী মহিলাদের একটা বড় অংশ বিবাহিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আবার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন অনেকের স্বামী আয় করতে অক্ষম। শ্রমজীবীরা প্রায় সবাই তার পরিবারের প্রধান আর পরিবারের সদস্যরা হলো তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। নিচের সারণিতে শ্রমজীবী মহিলাদের এ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২

শ্রমজীবী মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা ও পরিবার সম্পর্কিত তথ্য

বৈবাহিক অবস্থা	**উত্তরদাতা N=১২০**
অবিবাহিতা	১০%
বিবাহিতা এবং স্বামীর সঙ্গে বাস করেন	২৫%
বিবাহিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই	৪৫%
তালাকপ্রাপ্তা	-
বিধবা	২০%
মোট	১০০%
যদি স্বামীর সঙ্গে বাস করেন সেক্ষেত্রে	**উত্তরদাতা N=৩০**
স্বামী আয় করতে সক্ষম	৮০%
স্বামী আয় করতে অক্ষম	২০%
মোট	১০০%
অপনার বিয়ে কি রেজিস্ট্রি হয়েছিল ?	**উত্তরদাতা N=১২০**
হাঁ	৮৫%
না	১৫%
মোট	১০০%
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	
১ জন	২৯%
২ জন	১০%
৩ জন	৪৫%
৪ জন	১১%
৫ জন	৫%
মোট	১০০%
পরিবারের প্রধান কে	
নিজে	৭১%
স্বামী	২৫%
অন্যান্য	৪%
মোট	১০০%

উৎস:মাঠ জরিপ।

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪৫ জন মহিলা বিবাহিতা কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বিধবা শতকরা ২০ জন, অবিবাহিতা শতকরা ১০ জন, আর স্বামীর সঙ্গে বাস করেন শতকরা মাত্র ২৫ জন। স্বামীর সঙ্গে বাস করেন এরূপ মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগের স্বামী আয় করতে অক্ষম। পরিবারের সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ, চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা

শতকরা ১১ ভাগ। শতকরা ৭১ ভাগ মহিলা নিজেই তার পরিবারের প্রধান (সারণি ২)। অবিবাহিতা মহিলাদের পিতৃপরিবারে দৈন্যের কারণেই মূলত তাঁরা এ ধরনের উপার্জনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এতে একদিকে যেমন তাঁরা পিতার পরিবারে আর্থিক সহায়তা করতে পারেন, অপরদিকে নিজেকে স্বাবলম্বী করারও এটা একটা প্রয়াস। বিবাহিতা মহিলারাও তাদের স্বামীর পরিবারের সচ্ছলতার জন্য ধানকলে কাজ করে থাকেন। তাছাড়া অনেক বিবাহিতা মহিলার স্বামী যে কোনো কারণে অক্ষম। তাঁরা পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য উপার্জনমূলক কাজ করতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে অক্ষম স্বামীর পরিবারের হাল স্ত্রীকেই ধরতে হয়। বিধবা মহিলাদের অবস্থা তো আরও করুণ। সন্তানের তথা নিজের যাবতীয় ব্যয়ভার বাধ্য হয়ে তাঁকেই বহন করতে হয়। সুতারাং বাধ্য হয়েই তাঁরা এ ধরনের উপার্জনমূলক কাজে যোগ দেন। অনেক বিবাহিতা মহিলা তাঁর স্বামীর সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে জীবন-জীবিকার তাগিদে ধানকলে শ্রমিকের কাজ করেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো কর্মজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষমতায়ন যথেষ্ট ত্বরান্বিত করে।

চাতালের কষ্টকর কাজে সহায়-সম্পদহীন মহিলারা তাঁদের নিজের বা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এসে থাকেন। কাজে এসে কেউ কেউ সামান্য কিছু সম্পদ ক্রয় বা সঞ্চয় করছেন। নিচের সারণিতে শ্রমজীবী উত্তরদাতাদের এ ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলি পাওয়া যাবে।

সারণি ৩

শ্রমজীবী মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সর্ম্পকিত তথ্য

নিজের / স্বামীর কোনো ঘর-বাড়ি আছে?	**উত্তরদাতা N=১২০**
হাঁ	৪৫%
না	৫৫%
মোট	১০০%
আপনার কোনো চাষাবাদযোগ্য জমি আছে?	
হাঁ	২৫%
না	৭৫%
মোট	১০০%
আপনি ছাড়া পরিবারে অন্য কেউ আয় করে ?	
হাঁ	২০%
না	৮০%
মোট	১০০%
বসত জমি / চাষাবাদযোগ্য জমি/ঘরেরটিন/তৈজসপত্র/ গয়নাপত্র/ টিভি/গরু-ছাগল/খাট-চৌকি ইত্যাদি	
ক্রয় করেছেন	৪০%
বিক্রয় করেছেন	১০%
ক্রয়/বিক্রয় করেন নাই	৫০%
মোট	১০০%
এখানে কাজ করে কি কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছেন ?	
হাঁ	৮০%
না	২০%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে, শতকরা ৫৫ ভাগ মহিলার নিজের বা স্বামীর কোনো ঘরবাড়ি নেই। শতকরা ২৫ ভাগের কোনো চাষাবাদযোগ্য জমি নেই । শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। গত এক বছরে শতকরা ১০ জন শ্রমজীবী মহিলা চিকিৎসা, মেয়ের বিয়ে প্রভৃতি কারণে যেটুকু সম্পত্তি ছিল (বসতভিটা, চাষাবাদযোগ্য জমি প্রভৃতি) তা বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। শতকরা ৮০ জন

উত্তরদাতা কিছু সঞ্চয়ের কথা বলেছেন (সারণি ৩)। কঠোর পরিশ্রম এবং নিম্নমানের জীবন যাপন করে তাঁরা তাঁদের কর্মকালীন জীবনে ২ থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মহিলাদের ধানকল চাতালে কাজের নিয়োগ মৌখিক। তাঁদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে কথা বলার মতো কোনো ইউনিয়ন বা সমিতি নেই। নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর দেশে বন্ধুর মাধ্যমে এখানে কাজে আসেন। নিম্নের সারণিতে তাঁদের কাজ ও কাজের পরিবেশ বিষয়ে তথ্যাবলি পাওয়া যাবে।

সারণি ৪

শ্রমজীবী মহিলাদের কাজ ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্য

কিভাবে এই কাজে এসেছেন?	উত্তরদাতা N=১২০
স্বামীর মাধ্যমে	১৮
বন্ধুর মাধ্যমে	৭৯.৫০
আত্মীয়ের মাধ্যমে	১২.৫০
মোট	১০০%
কাজটি কি বাড়ি থেকে করতে পারেন?	
হাঁ	৮৯
না	১১
মোট	১০০%
আপনার কাজের নিয়োগ কেমন?	
মৌখিক	১০০%
আপনি কি মনে করেন নিয়োগকর্তা আপনাকে যে কোনো সময়ে ছাঁটাই করতে পারেন?	
হাঁ	৮৬
না	১৪
মোট	১০০%
আপনার কাজের পরিবেশে কি আপনি সন্তুষ্ট?	
হাঁ	১৫
না	৮৫
মোট	১০০%
আপনাদের কোনো শ্রমিক-সংঘ বা ইউনিয়ন আছে?	
না	১০০%

উৎস:মাঠ জরিপ।

বয়লারে ধান সেদ্ধ করার জন্য সাধারণত রাত্রি ১/২ টার সময়ে একজন মহিলা উঠে ধানের তুস ছিটিয়ে পানি বাষ্প শুরু করেন। ধান সেদ্ধ করা এবং শুকানোর কাজে ৪/৫ জন মহিলার একটি দলের ৩/৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। তেলের ব্যারেল কেটে তৈরি করা হয় ধান সেদ্ধ করার বয়লার, সেফটি ভাল্‌ভের কাজ চলে পলিথিন বেঁধে। প্রতি বছরই দু-একটি বয়লার-দুর্ঘটনা ঘটে। তুস ছিটিয়ে ধান সেদ্ধ করা, রোদে ধান শুকানো এসব কাজ অস্বাস্থ্যকর এবং এ কাজগুলো তাপ, ধুলা-ময়লাযুক্ত পরিবেশের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হয়। প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলাই এ ধরনের পরিবেশের জন্য অসন্তুষ্ট, অন্যান্যরা মনে করেন এই কাজের পরিবেশ এর চেয়ে আর ভালো আর কি হতে পারে? শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ মহিলাই জানেন না কাজের পরিবেশ বিষয়ে আইন আছে। এঁদের কোনো ইউনিয়ন বা সমিতি নেই। বেশির ভাগ মহিলাই বন্ধু বা কোনো পরিচিতা কর্মজীবী মহিলার মাধ্যমে ধানকলে শ্রমিকের কাজ করতে এসেছেন, মৌখিক চুক্তিতে এদের কাজ। শতকরা ৮৯ ভাগ মহিলাই ধানখলাতে অবস্থানপূর্বক কাজ করেন (সারণি ৪)। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ধানকলে শ্রমিকের কাজ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। আর তাঁদের কাজটিও মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

কোনো বিষয়েই এঁদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। যেহেতু তাঁদের কোনো ইউনিয়ন বা সমিতি নেই, সুতরাং সামগ্রিকভাবে তাঁরা কোনো দাবি-দাওয়াও উত্থাপন করতে পারেন না। ফলে মালিককে সন্তুষ্টির জন্য হাজারো সমস্যার মধ্যেই বাধ্য হয়ে তাঁদের কাজ করতে হয়। কারণ এ কাজটাই তাঁদের সংসারে ব্যয় নির্বাহের একমাত্র উপায়।

উত্তরদাতাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি

জীবনমান সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি দেখা প্রয়োজন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার প্রয়োজন উত্তরদাতারা কিভাবে পূরণ করছেন সে বিষয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো। শ্রমজীবী মহিলাদের খাদ্য গ্রহণের কোনো সময়সূচি নেই এবং তাঁদের গৃহীত খাদ্য মোটেই পুষ্টিমানসম্পন্ন নয়। নিচের সারণিতে এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫

শ্রমজীবী মহিলাদের খাদ্য গ্রহণের প্রকৃতি

প্রতিদিন কয় বার রান্না করেন?	উত্তরদাতা N=১২০
একবার	৫%
দুইবার	৮০%
তিনবার	১৫%
মোট	১০০%
গত সপ্তাহে কয়দিন মাছ / মাংস / ডিম / ডাল খেয়েছেন?	
কোনোদিন নয়	৪০%
একদিন	১৫%
দুইদিন	৪০%
তিনদিন	৫%
মোট	১০০%

উৎস : মাঠ জরিপ।

সাধারণত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শ্রমজীবী মহিলারা ২ থেকে ৩ জন এক সঙ্গে রান্না করে খান। ধানখলা থেকেই তাঁরা পারিশ্রমিক হিসেবে চাল পান বলে মূলত এরা ভাত এবং আলু, ডাল ও বিভিন্ন রকম সবজি খেয়ে থাকেন। রান্নার তেল মোটামুটি ২৫০ গ্রাম হলেই সপ্তাহ চলে যায়। মাছ ও মাংস সাধারণত এঁরা কম খান। এর ফলে তাঁরা কিছু সঞ্চয় করতে পারেন এবং সংসারেও সহায়তা করতে পারেন। লক্ষ করা গেছে, শতকরা ৮০ জন কর্মজীবী মহিলা দুই বেলা রান্না করেন। সপ্তাহে মাছ / মাংস / ডিম খাননি এরূপ কর্মজীবী মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ (সারণি ৫)।

চাতালে কর্মরত মহিলাদের বস্ত্র চাহিদা পূরণের প্রকৃতি অতি সাধারণ। তাঁদের জীবনে তেমন কোনো শখ বা বিলাসিতা নেই। নিম্নের সারণিতে এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য প্রদান করা হলো।

সারণি ৬

শ্রমজীবী মহিলাদের বস্ত্র চাহিদা পূরণের প্রকৃতি

আপনার কয়টি শাড়ি আছে?	উত্তরদাতা N=১২০
দুইটি	২০%
তিনটি	৬৫%
চারটি বা বেশি	১৫%
মোট	১০০%
আপনার কোনো (সোনা / রুপা) গহনা আছে?	
আছে	১২%
নাই	৮৮%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে বাধ্য হয়ে সরে আসা দরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা বা স্বামী উপার্জনে অক্ষম এ ধরনের মহিলাদের জীবনে তেমন শখ বা বিলাসিতা না থাকারই কথা। গবেষণায় লক্ষ করা গেছে, শতকরা ২০ ভাগ মহিলার মাত্র দুটি শাড়ি, শতকরা ৬৫ ভাগ মহিলার তিনটি আর মাত্র ১৫ ভাগ মহিলার চারটি বা তার বেশি শাড়ি আছে। শতকরা ৮৮ ভাগ মহিলারই সোনা বা রুপার কোনো গহনা নেই (সারণি ৬)। উল্লেখ্য, শ্রমজীবী মহিলাদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার চাহিদাই মুখ্য। তাছাড়া বলতে গেলে সর্বক্ষণই তাঁদের কাজ করতে হয়। সুতরাং একদিকে যেমন বিলাসিতা করার সময় তাঁদের নেই, অন্যদিকে বিলাসিতা করার মতো আর্থিক ক্ষমতাও তাঁদের নেই বললেই চলে।

ধানকল চাতালে থেকে কাজ করার জন্য চাতাল মালিক সাধারণত আবসনের ব্যবস্থা করে থাকেন। ছোট্ট টিনের ঘরে গণ-বিছানার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমজীবী মহিলাদের আবাসন সুবিধার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৭
শ্রমজীবী মহিলাদের বাসস্থানের প্রকৃতি

আপনি কিসের উপর ঘুমান?	উত্তরদাতা N=১২০
পাটি	৯%
কাঁথা	৮৭%
তোশক	৪ %
মোট	১০০%
আপনার ঘরে কি চৌকি আছে?	
হাঁ	৯৬%
না	৪ %
মোট	১০০%
ঘরের ছাদ কিসের?	
পাকা	০%
টিন	৯৪%
অন্যান্য	৬%
মোট	১০০%
পানীয় জলের জন্য কি টিউবওয়েল আছে?	
হাঁ	১০০%
না	০%
মোট	১০০%
সেনেটারি পায়খানা আছে কি	
হাঁ	৯%
না	৯১%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

গবেষণা এলাকার ধানকলের আধিকাংশ মালিকেরই শ্রমিকদের থাকার জন্য টিনের চালা ঘর রয়েছে। এসব ঘর ধান-চালের গুদাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এখানে ধানকলের মহিলা শ্রমিকেরা ঢালা বিছানায় শয়ন করেন। শতকরা ৯ ভাগ শ্রমিক পাটিতে ঘুমান। এঁরা মূলত অতিশয় দরিদ্র। তবে ৯১% মহিলা কাঁথা বিছিয়ে ঘুমান। সবাই টিউবওয়েলের পানি পান করলেও মাত্র ৯% মহিলা সেনেটারি পায়খানা ব্যবহারের সুবিধা পান (সারণি ৭)। কারণ গবেষণাভুক্ত অধিকাংশ ধানকলেই শ্রমিকদের জন্য সেনেটারি পায়খানার ব্যবস্থা নেই। আর থাকলেও সেগুলো শ্রমিকেরা ব্যবহার করার সুযোগ পান না। তাঁদের জন্য সাধারণত কাঁচা পায়খানার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে শ্রমজীবী মহিলা ও তাঁদের সন্তানের শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাবলি নিম্নের সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

সারণি ৮

শ্রমজীবী মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

আপনি কি পড়তে পারেন?	উত্তরদাতা N=১২০
হাঁ	২৫%
না	৭৫%
মোট	১০০%
অর্থের অভাবে কি আপনার সন্তানের শিক্ষা বন্ধ করেছেন?	উত্তরদাতা N=৭২
হাঁ	৫৮%
না	৪২%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

শ্রমজীবী মহিলাদের শতকরা ২৫ ভাগই লেখাপড়া জানেন না। তাঁদের সন্তানদের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যে লক্ষ করা গেছে যে এই শ্রেণীর মোট ৭২ জন উত্তরদাতার লেখাপড়া করার মতো সন্তান রয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা ৫৮ ভাগ মহিলা শ্রমিক অর্থের অভাবের তাঁদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন (সারণি ৮)। অনেকেই আবার সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে না পারার কারণে তাঁদের লেখাপড়া করাতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন। কারণ নানান অসুবিধার জন্য সন্তানকে নিজের কাছে রাখার সুযোগ নেই। বাধ্য হয়ে, দেশে নানী, দাদী বা খালার কাছে তাদের রাখতে হয়। ফলে তাদের লেখাপড়ার খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় না। এঁদের ছেলে-মেয়েরা সাধারণত তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই লেখাপড়া বাদ দিয়ে দেয় এবং উপার্জনমূলক কোনো কাজে নিয়োজিত হয়।

শ্রমজীবী মহিলারা নানান ধরনের অসুখ-বিসুখে ভোগে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যথাযথ চিকিৎসা করান না। জটিলতা বাড়লে কোনো সম্পদ বিক্রয় করে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করেন। শ্রমজীবী মহিলাদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি ৯

শ্রমজীবী মহিলাদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের প্রকৃতি

আপনি আপনার / পরিবারের চিকিৎসার জন্য সাধারণত কোথায় যান?	উত্তরদাতা N=১২০
গ্রাম্য কবিরাজ	০%
হোমিও ডাক্তার	১০%
গ্রাম্য ডাক্তার	৮৫%
প্রাইভেট ক্লিনিক	৫%
সরকারি হাসপাতাল	০%
মোট	১০০%
আপনার কি মনে হয় আপনার বর্তমান শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই কাজই মূলত দায়ী?	
হাঁ	৯৫%
না	৫%
মোট	১০০%

উৎস: মাঠ জরিপ।

শ্রমজীবী মহিলারা প্রায় সবাই চোখজ্বালা, কাশি, গায়ে ব্যথা, পেটে গ্যাস, বুকে ব্যথা প্রভৃতি রোগের কথা বলেছেন। খুব বড় রকম সমস্যা হলে চিকিৎসার জন্য ক্লিনিকে যান। সাধারণ প্রয়োজনে গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে (৮৫%) ঔষধ খেয়ে থাকেন। কুষ্টিয়া শহরের সরকারি হাসপাতালে কেউ চিকিৎসার জন্য যান না (সারণি ৯)। এখানে একটি বিষয়ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো এঁরা কাজ না করলে কোনো পারিশ্রমিক পান না। সুতরং অসুখ-বিসুখ হওয়া সত্ত্বেও এঁরা সাধারণত কাজ কামাই করেন না। তবে একেবারে কাতর হয়ে পড়লে বাধ্য হয়েই কোনো না কোনো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হয়।

ফলাফল পর্যালোচনা

জগতি ইউনিয়নে ধানকল চাতাল ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। দেখা গেছে জমির মালিক মিল এবং চাতাল তৈরি করে তা ব্যাপারীদের (ব্যবসায়ীদের) ব্যবসার জন্য চুক্তিতে ভাড়া দেন। মহিলারা চাতালে এসব ব্যাপারীদের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। ব্যাপারীরা পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায় করেন। ব্যাপারীদের বন্ধক রাখার মতো কোনো স্থায়ী সম্পদ থাকে না বলে তাঁদের ব্যবসার প্রয়োজনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিতে পারেন না। নগদ অর্থের প্রয়োজনে তাঁরা মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ হার সুদে ঋণ নিয়ে থাকেন। চাতাল ব্যবসায়ে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। দেখা গেছে, মিল মালিকের প্রচেষ্টা ও জামানতের মাধ্যমে ৬/৭ জন ব্যবসায়ী কিছু অর্থ নগদ ঋণ হিসেবে নিতে পেরেছেন। এই এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হলেও ৫ মাইল এলাকার মধ্যে কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জগতি ইউনিয়নের খাজানগরে অবস্থিত চাতালসমূহে নদী ভাঙন এলাকার অনেক নারী-পুরুষ কাজ করে। শ্রমজীবী মহিলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে, প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতার নিজে বা স্বামীর কোনো বসতভিটা নেই। চাষাবাদযোগ্য সামান্য কিছু জমি আছে, এরূপ উত্তরদাতা খুবই কম। বেশির ভাগ উত্তরদাতা বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা। তাঁদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য হলো প্রধানত তিন থেকে চার বা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট, তিনিই একমাত্র উপার্জনকারিণী এবং তিনিই পরিবার প্রধান। নিজ সন্তান ছাড়াও বৃদ্ধ পিতামাতার দায়িত্ব নিয়েছেন অনেকে। এখানে কর্মরত মহিলারা নিজ গ্রামে, সমাজে এমনকি নিজ পরিবারে পর্যন্ত অবহেলিত। যার ফলে এখানে কর্মরত অনেক মহিলাই দুই/তিন বছরে এক দিনের জন্যও নিজ গ্রামে যাননি।

উত্তরদাতার একটা বড় অংশ সঞ্চয় করার কথা জানিয়েছেন। লক্ষণীয় যে প্রায় ৫০% উত্তরদাতা বলেছেন এখানে কাজে লাগার পর তারা কেউ কোনো জমিজমা, ঘরের টিন, তৈজসপত্র, গহনা, গরু-ছাগল ইত্যাদি বিক্রয় করেননি। আসলে স্বামীসহ কাজ করেন এমন উত্তরদাতা ছাড়া অর্থাৎ বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, স্বামী উপার্জন করতে অক্ষম এবং অবিবাহিতা মহিলারা নিজের জীবন সম্পর্কে চরম হতাশায় নিমজ্জিত। লক্ষ করা গেছে যে প্রতিদিন দুই বেলা রান্না করে এমন উত্তরদাতার সংখ্যা খুবই কম। অনেকেই সপ্তাহে একদিনও মাছ-মাংস খান না। আবার অনেকেই শাক-সবজি রান্নায় পরিমিত পরিমাণ তেল পর্যন্ত দেন না। তাঁদের বস্ত্র চাহিদার প্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, কোনো রকমে পরার মতো তাদের দুটি বা তিনটি শাড়ি রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কোনো সোনা/রুপার গহনা বা সাজগোজ করার সৌখিন জিনিসপত্র চোখে পড়েনি। এখানে তাঁদের পরিবার পরিজনহীন অসহায় অবস্থায় থাকতে হয়। অল্প আয়ের এই শ্রমজীবী মহিলারা পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজেরা মানবেতর জীবন যাপন করেন।

শ্রমজীবী মহিলাদের রোজগার নিয়মিত নয় বরং নিশ্চয়তাহীন। নিম্ন আয়ের এই মহিলাদের অনেকেই বলেছেন অর্থের অভাবে তাঁর সন্তানের লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়েছে। অনেকে আবার বলেছেন নানী/দাদী/খালার কাছে সন্তান রেখে তাদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা ঠিকমতো লেখাপড়া করে না। আসলে তাঁদের সন্তানেরা সমাজে ছিন্নমূলের মতো বেড়ে ওঠে। অনেকেই আবার ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষের আগেই কোনো কাজে লাগিয়ে দেন।

চাতালের কাজে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে এ কাজে আসা প্রায় সব মেয়েই অল্প বয়সী। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাতের বেলায় বয়লারে ধান সেদ্ধ করা, সারা দিন প্রখর রোদে ধান শুকানো এবং

অবশেষে তা বস্তায় ভর্তি করার মতো শ্রমসাধ্য কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করছেন, এমন উত্তরদাতার সংখ্যা খুবই কম। খাদ্য গ্রহণ, কাজের সময়, বিশ্রাম কোনো কিছুরই নির্ধারিত সময় নেই। এই কাজে আসার পর অনেক ধরনের শারীরিক সমস্যার কথাও বলেছেন অনেকে। অসুস্থ হলে গ্রাম্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের আয় এতোই কম যে, তা দিয়ে অন্যান্য চাহিদা মেটানোর পর অসুস্থ অবস্থায় যথাযথ চিকিৎসা করানো সম্ভব হয় না।

চাতালে কর্মরত মহিলাদের নানান প্রতিকূলতার মধ্যে কর্মস্থলে অবস্থান করতে হয়। সাধারণত মিল মালিকের তৈরি করা চাতালের পাশে ছোট্ট টিনের চালাঘরে এক সঙ্গে চার/পাঁচ জনকে গণবিছানায় ঘুমাতে হয়। মধ্যরাতে তাঁদের মধ্যে একজনকে উঠে বয়লারে পানি গরম করতে হয়, স্টিম তৈরি হলে বাকিরা ওঠেন। তারপর সারাদিন ধরে চলে ধান শুকানোর কাজ। পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি তাঁদের কাজ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে এ সমস্ত মেয়েরা অনেক সময়ে পুরুষ শ্রমিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপারী, চাতাল মালিক এমন কি এলাকার বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হন। দেখা গেছে অনেক পুরুষ শ্রমিক একই সাথে তিন/চারটি বিয়ে করেছেন। আবার আগের স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করেছেন অথবা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন, এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে। এসব কারণে তাঁরা সমাজে আরও মর্যাদাহীন হয়ে পড়েন।

অনেকটা ভাসমান এই মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। জানা গেছে, এক সময়ে দুটি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা চাতালে কর্মরত মহিলাদের নিয়ে সমিতি গঠন করে ঋণ কার্যক্রম চালু করে। কিন্তু ১৯৯৯ সালে যশোর, ঝিনেদা, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর এলাকায় হঠাৎ বন্যায় ধান সংগ্রহ বন্ধ হয়ে পড়লে ঐ সমস্ত এলাকার ধানের উপর নির্ভরশীল খাজানগরের চাতাল ব্যবসায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে সমিতির অনেক মহিলা সদস্য অন্যত্র চলে গেলে সংস্থা দুটির আর্থিক ক্ষতি হয়। অবশ্য কিছু উত্তরদাতা সংস্থার কাছে সঞ্চিত টাকা ফেরত পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। চাতালে কর্মরত মহিলাদের সহায়তা বিষয়ে বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা বলেন, তাঁরা কোনো বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করেন না। সুতরাং হাঁস-মুরগি বা গবাদিপশু পালনে তাঁদের ঋণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁদের পক্ষে এসব করাও সম্ভব নয়। কারণ চাতালের কাজের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই।

ধানকল চাতাল ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন হাট থেকে ধান ক্রয়, ধান সেদ্ধ করা, শুকানো, ধান মেসিনে ভাঙানো, বিভিন্ন এলাকায় চাল পাঠানো ইত্যাদি। সব কাজই শ্রমিকদের দ্বারা করানো হয়। চাতালে কর্মরত বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকগণ একদিকে যেমন ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অপরদিকে তাঁরা বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। শ্রম আইন ও সংবিধানে নিপীড়নমূলক শ্রম/প্রতারণামূলক শ্রমের ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও এ দেশে শ্রম বাজারে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদার চেয়ে ব্যাপক জোগান শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটা বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সুপারিশসমূহ

জীবনযুদ্ধে বিপন্ন শ্রমজীবী মহিলাদের কল্যাণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং নিয়োগকর্তার অনেক কিছুই করণীয় রয়েছে। এঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। চাতালে কর্মরতা মহিলাদের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনাপূর্বক তাঁদের কল্যাণের জন্য কিছু সুপারিশ করা করা হলো:

- ধানকল মালিক, ব্যাপারী ও শ্রমিকদের সুবিধার জন্য খাজানগর এলাকায় একটি ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা প্রয়োজন।
- বয়লার নির্মাণ ও স্থাপনের ব্যাপারে ধানকল চাতাল মালিকগণের একটা নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি যাতে অগ্রাধিকার পায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকা উচিত।

- চাতালে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগ মৌখিক। কাজ করতে করতে অসুস্থ হলে অথবা বয়লার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচলিত শ্রম ও শিল্প আইনে এদের সাহায্য করার সুযোগ নেই। এজন্য তাদের কল্যাণ তহবিল থাকা উচিত। শ্রমিকরাও তাঁদের হয়রানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমিতি গঠন করতে পারে।
- চাতালে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের স্থায়ীভাবে কাজে রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের পারিশ্রমিক, কাজের শর্ত ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারের শ্রম কল্যাণ বিভাগের সুস্পষ্ট ভূমিকা রাখা দরকার। শ্রমজীবী কল্যাণ সমিতি গঠনেও সহায়তা করতে হবে। কর্মস্থলে মহিলা শ্রমিক যেন সম্মানের সাথে কাজ করতে পারেন, সে ব্যাপারে ধানকল চাতালের মালিক প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।
- শ্রমজীবী মহিলাদের কোনো স্থায়ী নিয়োগ নেই, আয়ের প্রবাহ অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত। কোনো বেসরকারি সংস্থা এঁদের সাহায্য করে না। এঁদের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মস্থলের আশেপাশে 'হোম' প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থা এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- শ্রমজীবী মহিলাদের খাদ্য, পুষ্টি ও স্বস্থ্য বিষয়ে সচেতন করতে হবে। এ বিষয়ে সমাজ কল্যাণ দপ্তর ও বেসরকারি সংস্থা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

শ্রমজীবী মহিলাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, মিল মালিক, চাতাল ব্যবসায়ী, ব্যাপারী, সচেতন সমাজ সবাইকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা তাদের সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারে।

উপসংহার

ধানকলে কর্মরত মহিলারা তাদের জীবন সম্পর্কে উদাসীন। বেশির ভাগ মহিলাই অল্প বয়সে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে ছেলে-মেয়ে বা নিজের জীবনের প্রয়োজনে একদিন পরিচিত কারো মাধ্যমে এই কাজে আসেন। পরিবার থেকে দূরে ধানখলায় তাঁরা অনেকটা সামাজিক বন্ধনমুক্ত জীবন যাপন করে থাকেন। এঁদের আয়-রোজগার নিয়মিত নয় বরং নিশ্চয়তাহীন।

শ্রমজীবী মহিলাদের কাজের নিশ্চয়তা ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। কারণ একই ধরনের পরিশ্রম করে বা আনুপতিক হারে কম পরিশ্রম করেও একজন পুরুষ শ্রমিক মহিলা শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। কাজের পরিবেশ উন্নয়ন ও ঝুকি হ্রাসের পাশাপাশি এদের জন্য সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ অক্ষরজ্ঞান ও কাজের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মহিলাদের অবসর সময়ে বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ধানকলের মালিকগণ প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে পারেন। জীবন-যাপনের সামগ্রিক ব্যয়কে সংক্ষিপ্ত করে এঁদের মাঝে সঞ্চয়ের ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এই প্রবণতাই তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে পথ সৃষ্টি করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. মাহবুব-উল-হক, *দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন* ১৯৯৭ (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ৪৭।

২. মাহবুব-উল-হক, *তদেব*, পৃ. ৪৮।

৩. Government of the Peoples' Republic of Bangladesh, *Women in Work: Facts for Life* (Dhaka: Ministry of Information, 1998), p. 15.

৪. Fazlur Rashid Khan, (et al) *Women Workers in Industries: A Study of Socio-Economic Conditions of Women Workers in the Industries of Rajshahi Town* (Rajshahi University: Department of Sociology, 1985), pp. 4-5.
৫. Annabel Rodda, *Women and the Environment* (London : Zed Books Ltd., 1991), p. 67.
৬. *The Daily Independent* (Editorial), Dhaka, 9/12/99.
৭. মাহবুব-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।
৮. Geoffrey D. Wood & Iffath Shrif (editors), *Who Needs Credit* (Dhaka: University Press Limited, 1997), p. 65.
৯. Geoffrey D. Wood & Iffath Shrif, *Ibid.*, p. 166.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

গ্রামীণ বাংলাদেশে বয়োবৃদ্ধদের সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ধরন

শর্ম্মিষ্ঠা রায়*

Abstract: This writing is an attempt to ascertain the extent of the assurance the aged people have in the villages of Bangladesh in respect of getting food, clothing, nursing, medical and health services, etc. from their off-spring. Under the existing socio-economic condition, what measures can be taken the level of the individual, the family and the state for the welfare of the aged people have also been focused in this writing.

ভূমিকা

পরিবার হলো সমাজের অন্যতম আদি সংগঠন। কিন্তু পরিবারের সনাতন রূপ সর্বাবস্থায় সমান নয়। আধুনিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেসবের ফলে পরিবারের সনাতন কাঠামোয় ও কার্যাবলিতেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতীতে অধিকাংশ গ্রামীণ পরিবার ছিল যৌথ পরিবার, কিন্তু বর্তমানে সেই যৌথ পরিবারের ভিত অনেকাংশে দুর্বল হয়েছে পড়েছে। পরিবারের সদস্যদের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্থানান্তর, এমনকি ক্রমবর্ধমান হারে শ্রম শক্তিতে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির কারণে পরিবারের সনাতন কাঠামোয় তথা যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে (Sarker, 1987:83, Sarker,1997:42 Connell, 1994: 9, সেন, ১৯৭৩: ১২৬-১৩৭)। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য এই পারিবারিক সংহতি বিনষ্ট করছে। ফলে সমাজে একক পরিবার বৃদ্ধির প্রবণতা বাড়ছে। সন্তান-সন্ততি এখন আর বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতে চাইছে না। সে কারণে বয়োবৃদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য গড়ে উঠতে শুরু করেছে বৃদ্ধাবাস। এর মূলে যে শুধু পরিবারের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটছে তা নয়, উপরন্তু পরিবারের সদস্যদের মানসিকতা ও মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটছে। বয়োবৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তাকে মূল্য দেওয়া এবং তাঁদের কাছ থেকে সৎ পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানসিকতা নতুন প্রজন্মের মধ্যে থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা চালু হবার ফলে তরুণেরা আজ আর তেমন প্রবীণদের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্বজোড়া যে সামাজিক রক্তবিষণ (social toxaemia) ঘটে চলেছে যার ফলে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সম্পর্ক দূষণ (relational pollution) দেখা দিয়েছে সেটাও বৃদ্ধদের এক নতুন নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা করে তুলছে। বর্তমানে পরিবারে বয়োবৃদ্ধদের গুরুত্ব কমে এসেছে এবং সেই সাথে সাথে তাঁরা অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হচ্ছেন। বয়োবৃদ্ধ হিসাবে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতাও তাঁদের ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্বে বার্ধক্য সমস্যা তাই আজ প্রকট হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে বার্ধক্যের অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাচ্যের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। সেখানে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে এখনো পারিবারিক পর্যায়ে বয়োবৃদ্ধদের দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করার রেওয়াজ চালু থাকায় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার চাইতে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, পরিবারের সদস্যদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, শ্রমের স্থানান্তর ইত্যাদি পরিবর্তনশীল

*ড. শর্ম্মিষ্ঠা রায়, সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পরিস্থিতিতে ইদানীং এদেশের বয়োবৃদ্ধরা পারিবারিক পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও সন্তান-সন্ততির মনোযোগ আকর্ষণে ও সেবা যত্ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত বোধ হচ্ছেন।

গ্রামবাংলায় বর্তমানে বয়োবৃদ্ধগণ পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কি ধরনের এবং কতটুকু সেবাযত্ন পাচ্ছেন তার আলোকে এই নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই নিবন্ধটি নাটোর জেলার অন্তর্গত বাগাতিপাড়া থানার ৫টি ইউনিয়নের ১১৯টি অস্থিতিশীল পরিবারের নমুনায়ন ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। এখানে অস্থিতিশীল পরিবার বলতে, যে সমস্ত পরিবার যৌথ নয়, অর্থাৎ এক সদস্য ভুক্ত, দাম্পত্য, নিউক্লিয়ার এবং সাব নিউক্লিয়ার তাদেরকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকালে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আচরণ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবারের প্রকৃত অবস্থার সাথে তাদের প্রদত্ত তথ্যের সামঞ্জস্য রয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য এই গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথ্যের গভীরে প্রবেশের জন্য এবং বয়োবৃদ্ধদের জীবন যাপন প্রণালিকে সূক্ষ্মভাবে যাচাইয়ের জন্য কেসস্টাডি পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়েছে এবং তথ্যসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যয়সমূহের অর্থ

এই প্রবন্ধে 'বয়োবৃদ্ধ', 'সেবাযত্ন' ও 'চিকিৎসা' এই তিনটি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। 'বয়োবৃদ্ধ' প্রত্যয়টি আপেক্ষিক। আর্থ-সামাজিক, শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে 'বৃদ্ধ' শব্দটি বিবেচিত হতে পারে। মানব জীবনের ঠিক কোন পর্যায় থেকে বার্ধক্য শুরু হয় তার সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন দিক থেকে জরাবিজ্ঞানীগণ বার্ধক্যকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। আবার একথাও সত্য যে, গ্রাম ও শহর ভেদে বৃদ্ধদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। গ্রামে বয়স পরিমাপ করে বার্ধক্য বিবেচনা করা হয় না। এখানে দৈহিক সামর্থ্য, অক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ, যেমন বয়সের ভারে শরীর নুয়ে পড়া, চামড়া কুঁচকে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া, লাঠি ভর দিয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দিয়ে বৃদ্ধদের চিহ্নিত করা হয়। অপর পক্ষে, শহুরে বৃদ্ধ বলতে যাদের বোঝানো হয়েছে তারা চাকরি বা স্থায়ী কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করছেন। যদিও বয়স মূলত একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, তবু যে কোনো সমাজের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস সেখানকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত (Turner, 1986: 276-278, রহমান, ১৯৯৮: ১৪-১৫)। এই গবেষণায় বৃদ্ধ বলতে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের বয়স ষাট বা তারও উর্ধ্বে, যাদের শারীরিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, যারা পরিবারের অন্যান্য উপার্জনশীল ব্যক্তির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল (রায়, ২০০০: ২০)। 'সেবাযত্ন' প্রত্যয়টি দ্বারা বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণ ও দৈহিক অসুস্থতার সময়ে প্রাপ্ত সেবাযত্নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে বয়োবৃদ্ধরা সন্তান-সন্ততি অথবা আত্মীয় স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছ থেকে কতটা ভরণ-পোষণের এবং সেবার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 'চিকিৎসা' প্রত্যয়টি দ্বারা বয়োবৃদ্ধের শারীরিক অসুস্থতায় চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত ঔষধপত্র, পথ্য ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

বয়োবৃদ্ধদের কে বা কারা সেবাযত্ন করেন

প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বার্ধক্য যখন দ্বারে এসে উপস্থিত হয় তখন ফুরিয়ে যায় মানুষের কর্মোদ্যম। ভেঙে পড়ে আর্থিক মেরুদণ্ড। সন্তান-সন্ততিই হয়ে পড়ে শেষ বয়সের প্রধান অবলম্বন। পিতামাতা সন্তানদের দেখাশুনা করবেন, মানুষ করবেন, সন্তানও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার সেবাযত্ন, সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবে এটাই বাংলাদেশের প্রচলিত প্রথা। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির মধ্যে এই পারস্পরিক আদান প্রদান প্রথা আজ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সীমিত আয়, কর্মসংস্থানের নিমিত্তে শহুরমুখী প্রবণতা, সর্বোপরি আপন স্ত্রী ও

ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে বাস করার মানসিকতার কারণে সন্তান-সন্ততি আগের মতো আর বৃদ্ধ পিতা-মাতার সার্বিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে চায় না। সহায়-সম্পত্তির মতো পিতা মাতাও আজ সন্তানদের মধ্যে ভাগাভাগির বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়েছেন। যে যৌথ পরিবার ছিল বয়োবৃদ্ধদের নিরাপত্তার একমাত্র অবলম্বন তা আজ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে, রোগশয্যায় সেবাযত্ন প্রাপ্তির জন্য অনেক বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেই আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থনৈতিক কারণে অথবা আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার ফলে অনেক সন্তান-সন্ততিই পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ পোষণের ভার নিতে চায় না। এ সকল অসহায় পিতা-মাতাদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে নিজেরাই তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে নিতে হয় অথবা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হয়। সমীক্ষাধীন এলাকার ১১৯টি অস্থিতিশীল পরিবারের (এক সদস্যভুক্ত পরিবার, দাম্পত্য পরিবার, নিউক্লিয়ার ও সাব নিউক্লিয়ার পরিবার) ১৪১ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ওপর পরিচালিত সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ধরন নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১
বয়সভেদে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ধরন

নির্ভরশীলতার ধরন	পুরুষ			মোট (%)	মহিলা			মোট (%)	সর্বমোট (%)
	৬০-৬৯ (%)	৭০-৭৯ (%)	৮০ + (%)		৬০-৬৯ (%)	৭০-৭৯ (%)	৮০ + (%)		
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর	৩৪ (৬১.৮২)	১৫ (২৭.২৭)	৬ (১০.৯১)	৫৫ (১০০)	৪ (১০০)	-	-	৪ (১০০)	৫৯ (৪১.৮৪)
আংশিক পরনির্ভর	৮ (৭২.৭৩)	৩ (২৭.২৭)	-	১১ (১০০)	৬ (১০০)			৬ (১০০)	১৭ (১২.০৬)
সম্পূর্ণ অন্যের ওপর নির্ভরশীল	৮ (৬১.৫০)	৩ (২৩.০৮)	২ (১৫.৩৮)	১৩ (১০০)	৩০ (৫৭.৬৯)	১৭ (৩২.৬৯)	৫ (৯.৬২)	৫২ (১০০)	৬৫ (৪৬.১০)
মোট	৫০ (৬৩.২৯)	২১ (২৬.৫৮)	৮ (১০.১৩)	৭৯ (১০০)	১০ (৬৪.৫১)	১৭ (২৭.৪২)	৫ (৮.০৫)	৬২ (১০০)	১৪১ (১০০)

সারণিতে লক্ষ করা যায় যে, ১৪১ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মধ্যে ৪১.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ এ সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনো আপন জমি-জমার আয়, ব্যবসা অথবা অন্য যে কোনো পেশার ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বয়স ভেদে লক্ষ করা যায়, ৬০-৬৯ বছর বয়সী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই বেশি আত্মনির্ভরশীল। কারণ এই বয়সে খেটে খাওয়ার মতো শারীরিক সামর্থ্য তাদের রয়েছে। গবেষণাধীন এলাকায় ১২.০৬ শতাংশ বয়োবৃদ্ধ রয়েছেন যারা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে অন্যের ওপর আংশিক নির্ভরশীল। অর্থাৎ এরা সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে অথবা নিজে যা রোজগার করেন তা দিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন না। ফলে অন্যের সাহায্য সহযোগিতার ওপর এদের নির্ভর করতে হয়। সারণিতে আরো লক্ষ করা যায় যে, ৪৬.১০ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সম্পূর্ণভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। বয়সের কারণে শারীরিক সামর্থ্য হ্রাস অথবা উপার্জন কমে যাওয়ার ফলে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণভাবে এদেরকে সন্তান-সন্ততির, আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীর ওপর নির্ভর করতে হয়।

গ্রাম বাংলায় যে সমস্ত বয়োবৃদ্ধ আংশিক পরনির্ভর, তারা নিত্য-নৈমিত্তিক দ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আংশিক পরনির্ভর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেশা ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস নিম্নে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণি ২
আংশিক পরনির্ভর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস

পেশা	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		সর্বমোট (%)
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
কৃষি	৪ (২৩.৫৩)	৪ (২৩.৫৩)	৮ (৪৭.০৬)
কৃষি ও ব্যবসা	১ (৫.৮৮)	-	১ (৫.৮৮)
ব্যবসা	১ (৫.৮৮)	-	১ (৫.৮৮)
দিনমজুর	৫ (২৯.৪২)	-	৫ (২৯.৪২)
অন্যের বাসায় কাজ	-	১ (৫.৮৮)	১ (৫.৮৮)
ভিক্ষাবৃত্তি	-	১ (৫.৮৮)	১ (৫.৮৮)
মোট	১১ (৬৪.৭১)	৬ (৩৫.২৯)	১৭ (১০০)

সারণিতে লক্ষ করা যায়, বয়োবৃদ্ধদের অধিকাংশই কৃষি কাজে নিয়োজিত। শতকরা ২৯.৪২ শতাংশ বৃদ্ধ দিন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন । কৃষি, ব্যবসা, অন্যের বাসায় ঝি-বা চাকর হিসাবে কাজ করেন, এমনকি ভিক্ষাবৃত্তিকেও পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন কিছু সংখ্যক বয়োবৃদ্ধ । জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে এই সমস্ত পেশায় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তা থেকে প্রাপ্ত আয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা যথাযথ ভাবে পূরণ না হওয়ার কারণে সন্তান-সন্ততি বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ওপর এদেরকে আংশিক নির্ভরশীল থাকতে হয়।

আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভরণ-পোষণ

সন্তান-সন্ততি হলো বৃদ্ধ বয়সের প্রধান অবলম্বন। বার্ধক্যে শরীর-স্বাস্থ্যের অবনতি ও উপার্জন হ্রাস স্বাভাবিক ঘটনা। সব পিতা-মাতাই আশা করেন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান-সন্ততিই হবে তাঁদের বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন। আমাদের দেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি না থাকায় সন্তান-সন্ততির ওপর বৃদ্ধ বয়সে নির্ভরশীলতা বেশি লক্ষ করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই নির্ভরশীলতার হার পুত্র-সন্তানের ওপরই বেশি (Alam, 1995: 225)। শুধু আমাদের দেশেই নয়, ভারত-বর্ষ, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামেও দেখা যায় কন্যা-সন্তান অপেক্ষা পুত্র-সন্তানের ওপরই বৃদ্ধ পিতা-মাতা বেশি নির্ভরশীল (Knodel & Debavalya, 1997:9)। কিন্তু ব্যাপক দারিদ্র্য, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব ও অভিবাসন ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততির ওপর নির্ভরশীলতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের দেশে বৃদ্ধ পিতা-মাতারা এখনো পারিবারিক পরিমণ্ডলেই বসবাস করছেন, যেখানে ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ না কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের দেখাশুনা বা সেবাযত্ন করছেন। সমীক্ষাধীন এলাকায় বসবাসরত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভরণপোষণ বা সেবা যত্ন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩

আংশিক বা সম্পূর্ণ পরনির্ভর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভরণ-পোষণ সম্পর্কিত তথ্য

যাঁরা বয়োবৃদ্ধদের দেখাশুনা বা ভরণ-পোষণ করেন	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		সর্বমোট (%)
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
অবিবাহিত ছেলে	১২ (১৪.৬৩)	২৮ (৩৪.১৫)	৪০ (৪৮.৭৮)
অবিবাহিত মেয়ে/তালাক প্রাপ্তা মেয়ে	১ (১.২২)	৬ (৩.৬৬)	৪ (৪.৮৮)
নাতি / নাতনি	১ (১.২২)	২ (২.৪৪)	৩ (৩.৬৬)
মেয়ে-জামাই	-	১ (১.২২)	১ (১.২২)
আত্মীয়-স্বজন	-	১ (১.২২)	১ (১.২২)
পাড়া প্রতিবেশী	-	৭ (৮.৫৩)	৭ (৮.৫৩)
স্বামী / স্ত্রী	৯ (১০.৯৮)	৯ (১০.৯৮)	১৮ (২৯.৯৬)
কেউ না	১ (১.২২)	৭ (৮.৫৩)	৭ (৯.৭৫)
মোট	২৪ (২৯.২৭)	৫৮ (৭০.৭৩)	৮২ (১০০)

সারণিতে লক্ষ করা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই অবিবাহিত পুত্রের ওপর বেশি নির্ভরশীল। ২১.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দেখাশুনা বা ভরণ-পোষণের কেউ না থাকায় তারা স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দেখাশুনা করে থাকেন।

বয়োবৃদ্ধদের শারীরিক অসুস্থতায় প্রাপ্ত সেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

দারিদ্র্য আমাদের গ্রামবাংলার অন্যতম সদস্যা। দারিদ্র্যের কারণে তিন বেলা পেট ভরে খেতে পায় না এমন পরিবারের সংখ্যাই গ্রামবাংলায় সর্বাধিক। যার কারণে আমাদের দেশে ৫০ শতাংশ লোক পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছেন। এছাড়াও রয়েছে যথাযথ চিকিৎসার অভাব। দারিদ্র্যের পাশাপাশি গ্রামবাংলার আরো একটি প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে আর তা হলো পারিবারিক অস্থিতিশীলতা। অস্থিতিশীল পরিবারগুলোর বয়োবৃদ্ধরা যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এর কারণ সন্তান-সন্ততির অবজ্ঞা ও অবহেলা। যে পিতা-মাতা বিষয় সম্পত্তির মতো পুত্রদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে জীবন ধারণ করেন সেই সব পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব, চিকিৎসার ভার কোনো সন্তানই তখন এককভাবে নিতে চায় না। ফলে তাঁরা যথাযথ চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হন। গ্রামবাংলার বয়োবৃদ্ধরা স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে পরিবারের কাছ থেকে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তা জানার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ধরনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন— সম্পূর্ণ সেবা পান, আংশিক সেবা পান ও চিকিৎসা সেবাবঞ্চিত। এখানে উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা সেবাবঞ্চিত বলতে বোঝানো হয়েছে শারীরিক অসুস্থতায় যারা অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তবে তারা ঝাড়-ফুক, পানিপড়া অথবা স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ যেমন— গাছ-গাছড়া ইত্যাদি চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। নিম্নে সারণির মাধ্যমে বয়োবৃদ্ধদের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ধরন উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৪
বয়োবৃদ্ধদের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ধরন

চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির ধরন	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		সর্বমোট (%)
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
সম্পূর্ণ	১৩ (৯.২১)	১০ (৭.০৯)	২৩ (১৬.৩০)
আংশিক	৬২ (৪৩.২৬)	৪৫ (৩১.৯২)	১০৬ (৭৫.১৮)
বঞ্চিত	৫ (৩.৫৫)	৭ (৪.৯৭)	১২ (৮.৫২)
মোট	৭৯ (৫৬.০২)	৬২ (৪৩.৯৮)	১৪১ (১০০)

সারণিতে লক্ষ করা যায়, বয়োবৃদ্ধদের ৭৫.১৮ শতাংশই চিকিৎসা ক্ষেত্রে আংশিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। আংশিক সুযোগ সুবিধা বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ চিকিৎসা বা ঔষধ পত্র পান না। গবেষণাধীন এলাকার ৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত। এই সারণিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বৃদ্ধদের তুলনায় বৃদ্ধারা চিকিৎসার সুযোগ কম পেয়ে থাকেন। মেয়েদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এবং সামাজিক বঞ্চনাই এর প্রধান কারণ ।

শারীরিক অসুস্থতায় যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ার কারণ

মূলত পারিবারিক স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবারের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা এবং পরিবেশের উপর (Rao, 1971: 49) । পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে স্বাভাবিকভাবেই সকলের জন্য সুচিকিৎসা বা পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা গ্রামবাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা গ্রামীণ পরিবারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বয়োবৃদ্ধদের ওপর। সন্তান-সন্ততির অবজ্ঞা, অবহেলা, আর্থিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে বয়োবৃদ্ধরা প্রায়ই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিম্নে গ্রামবাংলার বয়োবৃদ্ধদের যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্য সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৫
বয়োবৃদ্ধদের যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্য

যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ার কারণ	বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী		সর্বমোট (%)
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	
আর্থিক অস্বচ্ছলতা	৩৬ (৩০.৫০)	২০ (১৬.৯৫)	৫৬ (৪৭.৪৫)
পরিবারের সদস্যদের অনীহা	১৩ (১১.০২)	১০ (৮.৪৭)	২৩ (১৯.৪৯)
বাড়ি থেকে হাসপাতাল দূরে	১৩ (১১.০২)	৯ (৭.৬৩)	২২ (১৮.৬৫)
পর্দা প্রথা	-	৫ (৪.২৪)	৫ (৪.২৫)
স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদাসীনতা	৪ (৩.৩৯)	৮ (৬.৭৮)	১২ (১০.১৭)
মোট	৬৬ (৫৫.৯৩)	৫২ (৪৪.০৭)	১১৮ (১০০)

সারণির তথ্য বিশ্লেষণ থেকে লক্ষ করা যায় যে, পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতাই বয়োবৃদ্ধদের যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় সমাজ আজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। পুরাতন রীতি-নীতি, সংস্কার ত্যাগ করে নতুন কিছু বেছে নেওয়ার প্রচেষ্টায় মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এ সমাজ পুরাতন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে এখনও টিকিয়ে রাখতে পেরেছে বলেই বয়োবৃদ্ধরা আজো পরিবারে ঠাঁই পাচ্ছেন। তারা সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে দারিদ্র্য যে দেশের নিত্যসঙ্গী সে দেশের বয়োবৃদ্ধরা পরিবারের কাছ থেকে যে খুব বেশি কিছু পাচ্ছেন তা নয়। দুঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা ও বঞ্চনার মধ্য দিয়েই কেটে যাচ্ছে তাদের জীবন। কখনো সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন বিহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছেন, আবার কখনো পরিবারের সকলের মাঝে থেকেও আশ্রিতের মতো রয়েছেন। যে বয়োবৃদ্ধরা ছিলেন পরিবারের কর্ণধার তারাই আজ বঞ্চনা ও নিগ্রহের শিকার। জীবনের নিরাপত্তা তাদের কম। এই অবস্থা থেকে তাদেরকে রক্ষা এবং তাঁদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতিতেও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা একান্ত আবশ্যক। নিম্নে এতৎসম্পর্কিত কতিপয় সুপারিশ প্রদান করা হলো:

প্রথমত, বয়োবৃদ্ধদের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতা রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে যৌথ পরিবারের কাঠামো ও সনাতন মূল্যবোধকে রক্ষা করতে হবে। যাতে পরিবারের সকল সদস্য একত্রে যৌথভাবে বসবাস করে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধনকে অটুট রাখতে পারে। আর এজন্য আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বয়োবৃদ্ধদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সর্বোপরি পরিবারে তাঁদের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যা থেকে তারা উপার্জন করে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন।

তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত দুস্থ অসহায়/বৃদ্ধ রয়েছেন যারা সন্তান-সন্ততি কর্তৃক অবহেলিত, রোজগার করার মতো শারীরিক সামর্থ্য নেই তাদের জন্য সমষ্টি-ভিত্তিক (community support) কর্মসূচি যেমন—মুষ্টিতোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় সপ্তাহ অন্তর, পনেরো দিন বা এক মাস অন্তর গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে তাদের প্রতিদিনের বরাদ্দকৃত চাল হতে একমুষ্টি করে চাল তুলে জমাকৃত চাল দিয়ে এই সমস্ত দুঃস্থ, অসহায় বয়োবৃদ্ধদের ভরণ-পোষণ চালানো যেতে পারে।

চতুর্থত, শারীরিক অসুস্থতায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো বয়োবৃদ্ধদেরও রয়েছে। তাঁদের জন্য সুচিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, অনুন্নত রাস্তাঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে বৃদ্ধদের পক্ষে দূরে শহরের বড় হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানো ও সুচিকিৎসা গ্রহণ করা অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। এজন্য গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে সুচিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাঁদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অ্যাম্বুলেন্সের পাশাপাশি রিকশা বা ভ্যানগাড়ির মতো পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পঞ্চমত, দারিদ্র্যই যেখানে পারিবারিক ভাঙ্গন, দ্বন্দ্ব ও কলহ এবং বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সন্তান সন্ততির অবজ্ঞা ও উদাসীনতার প্রধান কারণ সেই দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করতে, সর্বোপরি বয়োবৃদ্ধদের সেবা যত্নের প্রতি সন্তানদের আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে তুলতে হবে। আরসে কারণে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের জন্য সরকারিভাবে মাসিক অর্থ-বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

সারা বিশ্বে আজ বার্ধক্য সমস্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন বয়স্ক জন গোষ্ঠীর জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বয়োবৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন হওয়ার রেওয়াজ নতুন প্রজন্মের মধ্য থেকে ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সনাতন ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে "old is gold" অর্থাৎ যা কিছু পুরাতন তাই মূল্যবান। পরিবারকেই নিতে হবে পরিবারের দ্বিতীয় শৈশবের দায়িত্ব। এর জন্য চাই সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন। কেবলমাত্র যৌথ পারিবারিক বন্ধনই বার্ধক্যের নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

Alam , A.Z.M. Shamsul (1995) *Family Values*. Dhaka : co-operative Book Society Limited.

Chakrabarti, Prafulla (1998) "Health Management and care for the elderly." *The Eastern Anthropologist.* Vol. 51 (3)

Chakrabarti, Prafulla 2001, 'Problems and prospects of elder care in rural India'. The *Eastern Anthropologist.* Vol. (n.a.)

Connell, O. Helen (1994) *Women and the Family*. London and Newjersey, Zed Books Ltd.

Knodel, Johan and Debavalya, Nibhon (1997) 'Living Arrangements and support among the Elderly in South East Asia: An Introduction'. *Asia-Pacific Population Journal.* Vol.12. No. 4. ESACAP.

Kumar, S.Vijaya (1997) 'Family and Health of the Aged'. *Life in twilight years.* Calcuta, kwality Book Company.

Rao, K.N. (1971) 'Nutrition and Family Health', *Social Change.* Journal of the Council for Social Development. Vol. 1. No. 3.

Sarker,P.C.(1997) *Social Structure and Fertility Behaviour.* Dhaka, Centre for Development Services. (CDS).

Turner,Jonathan H. (1986) *Sociology: The Science of Human organization.* Chicago. Nelson Hall.

রহমান, আতিকুর (১৯৯৮) "আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ এবং বাংলাদেশ"। *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*, অক্টোবর, ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ২য়,১৪-১৫.

রায়, শর্ম্মিষ্ঠা (২০০০) "যৌথ পরিবারের অস্থিতিশীলতা এবং বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধদের নিরাপত্তার উপর এর প্রভাব: একটি থানা ভিত্তিক সমীক্ষাণ" (অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. গবেষণা প্রতিবেদন), ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী ইউনিভারসিটি রাজশাহী।

সেন, রঙ্গলাল (অনুঃ) (১৯৭৩) *সমাজ বিজ্ঞান*। ঢাকা, প্যারামাউন্ট বুক কর্পোরেশন।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি : বর্তমান ধারা বিশ্লেষণ

এস. এম. এক্রাম উল্যাহ*

Abstract: This paper is an attempt to analyze the present trends of student politics in Bangladesh. In this paper everything has been discussed mainly on the basis of primary data. Connection with student politics, objectives of student politics, its main characteristic features, relation between student politics and terrorism as well as tool collection, influence of government student organization on student politics, attachment of student politics with national politial environment have been discussed. The other focuses of this paper are – relation of student politics with session jam and terrorism, the opinion of respondents against and in favour of student politics. How student politics can get its healthy shape and glorious past has also been discussed.

১. ভূমিকা

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। ছদ্ম-উপনিবেশবাদী স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে একটি মুক্ত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য।[১] এ উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্ররা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিলো ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

ছাত্র হলো সমাজের সেই সচেতন গোষ্ঠী, যাদের সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত যে কোনো অন্যায়-অবিচার মোকাবেলা করার সাহস, নৈতিক মনোবল এবং নিরপেক্ষ মনোভাব রয়েছে। কোনো প্রকার গোঁড়ামি ছাড়াই ছাত্ররা জাতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ যে কোনো কিছুকে মোকাবেলা করে। এস.এম লিপসেট-এর মতে, সম্ভবত বুদ্ধিজীবী ছাড়া সমাজের আর যে কোনো গোষ্ঠীর চেয়ে ছাত্ররা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহের ব্যাপারে অধিকতর সাড়া প্রদাকারী গোষ্ঠী।[২] ছাত্ররা তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সভা-সমাবেশ (জনমত সৃষ্টিকারী) এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা এবং জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করে। ছাত্ররা হলো সজীব ও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, তেজোদ্দীপ্ত এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন শক্তি এবং যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সংঘটিত আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে ঝাপিয়ে পড়ে।[৩]

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] Amir-Ul Islam, "Democracy, Development and Human Rights : An Uphill Struggle for Parliamentary Democrary", *The Financial Express*, November 23, 1997.

[২] S.M. Lipset, "Student Activists" *Dialogue*, Vol. 2, No. 2, 1969, p. 5.

[৩] হাসান উজ্জামান, *আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন* (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৪), পৃ. ১২।

ছাত্ররা হচ্ছে সমাজের অন্যতম সচেতন অংশ। সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো ছাত্রদেরও রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সমাজের জনগণের এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত ছাত্ররা যখন তাদের যৌথ প্রচেষ্টা, আন্দোলন, বিক্ষোভ, সাহস, নৈতিকতা প্রভৃতি দিয়ে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে এবং নিজেদের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করে, তখন তাকে ছাত্র রাজনীতি বলা হয়ে থাকে। এই অর্থে ছাত্র রাজনীতি হচ্ছে, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সচেতন ছাত্র কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর সমাধানার্থে নিজেদের সংগঠিত করে তোলা, কর্মসূচি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করা এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোকে প্রভাবিত করে কাঙ্খিত লক্ষ্য হাসিলের একটি প্রক্রিয়া।[৪]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি একটি উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে পরিচিত। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাইরন উইনার তাঁর একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, অনুন্নত দেশের ছাত্ররা রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫] বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাক-স্বাধীনতা সময় থেকে ছাত্র রাজনীতি এদেশের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। পাকিস্তানি শাসন-আমলের সূচনায় তৎকালীন ছাত্র সমাজ তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, পীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্ররা ছাত্র স্বার্থ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে পাকিস্তানী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল।[৬] ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি জাতীয় সংকটে ছাত্ররা আত্মত্যাগী ভূমিকা পালন করে; বিশেষ করে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত আন্দোলন ও সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও ছাত্র রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসবই ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির সবচেয়ে নেতিবাচক যে দিকটি পরিলক্ষিত হয়, তা হলো অব্যাহত বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস। এর ফলে সত্তর, আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়।[৭] বস্তুত, বর্তমানকালের সংঘর্ষ প্রবণ, কর্তৃত্বপরায়ণ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-বিরোধী ছাত্র রাজনীতি তার অতীতের ভূমিকা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে আসছে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র রাজনীতির এই অসুস্থ ধারার সূচনা হয়েছিল পাকিস্তান শাসন-আমলের শেষ দিকে। তখন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য জেনারেল আইয়ুব খান 'এন এস এফ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করেছিলেন।[৮] তাদের প্রাসঙ্গিক কুকীর্তি সর্বজনবিদিত। বর্তমান ছাত্র রাজনীতির অসুস্থ অবস্থাকে উল্লিখিত আইয়ুবি পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।[৯]

সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং গোটা জাতির কাছে ছাত্র রাজনীতির এই দুরবস্থা অপ্রত্যাশিত। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র রাজনীতির উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও বর্তমানে এর সংঘর্ষ

---

[৪] হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।

[৫] Myron Weiner, *The Politics of Scarcity* (Chicago : University of Chicago Press, 1968), p. 158.

[৬] হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

[৭] Habiba Zaman, "Patterns of Student Leadership in Rajshahi University", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. 5, IBS, RU, 1981, p. 149.

[৮] সুলতান আহমদ, "বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস: কারণ, প্রকৃতি ও প্রতিকার", *বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস*, জুন ২০০১ (২)পৃ. ২৭।

[৯] আসাদ আদনান ও লুৎফর রহমান, "অবঃ বিতাড়িত নব স্বাগত:ছাত্র রাজনীতিতে পালাবদল", *কাগজ*, ১০ মে ১৯৯১, ।

প্রবণ অবস্থা, সন্ত্রাসী প্রবণতা এবং চাঁদাবাজির মতো আরো অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক অপকর্ম অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে এবং ছাত্র রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কিত এই নিবন্ধে ছাত্র রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ *তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা*

নিবন্ধটিতে প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে তাঁদের উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক নিজে এবং গবেষক কর্তৃক নিযুক্ত ছয়জন ছাত্র তথ্যসংগ্রহকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মোট একশত বিশটি প্রশ্নমালা বণ্টন করা হয়েছিল। এর মধ্যে একশত চৌদ্দজন উত্তরদাতার উত্তর পাওয়া যায়। জরিপ কার্যটি শুরু করা হয়েছিলো ২০০২ সালের ১০ এপ্রিল এবং শেষ করা হয়েছে একই বছরের ১৫ এপ্রিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশপাশের এলাকায় প্রধানত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য শ্রেণীর পেশাজীবীদের নিকট প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন পেশার উত্তরদাতাদের মতামতকে একটি সাধারণ সূত্রে একীভূত করা খুব কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আশা করা যেতে পারে যে, প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের কারণ, ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির প্রভাব, ছাত্র রাজনীতির কারণে সেশনজট ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা এবং এসব অপ্রত্যাশিত অবস্থা থেকে কিভাবে উত্তরণ সম্ভব সে সম্পর্কে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে, তাহলে তা দেশ ও জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

সারণি ১

উত্তরদাতাদের পেশা ও বয়স

বয়স গ্রুপ / উত্তরদাতা শ্রেণী	বয়সগ্রুপ					
	১৭-২২ বছর (%)	২৩-২৮ বছর (%)	২৯-৩৪ বছর (%)	৩৫-৪০ (%)	৪১-উর্ধ্বে (%)	মোট (%)
ছাত্র	২৭ (৩৫.৫৩)	৪৮ (৬৩.১৬)	-	০১ (১.৩২)	-	৭৬ (৬৬.৬৭)
শিক্ষক	-	-	০২ (১১.৬৭)	০৮ (৪৭.০৬)	০৭ (৪১.১৮)	১৭ (১৪.৯১)
কর্মকর্তা	-	০১ (১৬.৬৭)	-	০৩ (৫০.০০)	০২ (৩৩.৩৩)	০৬ (৫.২৬)
ব্যবসায়ী	০১ (১১.১১)	০১ (১১.১১)	০৩ (৩৩.৩৩)	০২ (২২.২২)	০২ (২২.২২)	০৯ (৭.৮৯)
অন্যান্য	-	০৩ (৫০.০০)	০১ (১৬.৬৭)	০২ (৩৩.৩৩)	-	০৬ (৫.২৬)
সর্বমোট	২৮ (২৪.৫৬)	৫৩ (৪৬.৪৯)	০৬ (৫.২৬)	১৬ (১৪.০৪)	১১ (৯.৬৫)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

সর্বমোট ১১৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭৬ (৬৬.৬৭%) জন ছাত্র, ১৭ (১৪.৯১%) জন শিক্ষক, ০৬ (৫.২৬%) জন কর্মকর্তা, ০৯ (৭.৮৯%) জন ব্যবসায়ী, এবং ০৬ (৫.২৬%) অন্যান্য পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট। ছাত্রদের মধ্যে ২৭ (৩৫.৫৩%) জন ১৭ থেকে ২২ বয়সের, ৪৮ (৬৩.১৬%) জন ২৩-২৮ বৎসর বয়সের, এবং মাত্র ১ (১.৩২%) জন ৩৫-৪০ বৎসর বয়সের, উত্তরদাতা। অন্যান্য শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে রয়েছেন দুইজন রাজনীতিবিদ, তিনজন উকিল এবং একজন চিকিৎসক।

সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী বয়স-গ্রুপ হলো ২৩-২৮। এদের অধিকাংশ ছাত্র। শিক্ষকদের মধ্যে ২৯-৩৪ বয়স-গ্রুপের ০২ (১১.৭৬%) জন, ৩৫-৪০ বয়স-গ্রুপের ০৮ (৪৭.০৬%) জন, এবং ৪১- উর্ধ্ব বয়স-গ্রুপের ০৭ (৪১.১৮%) জন। কর্মকর্তাদের মধ্যে ২৩-২৮ বয়স-গ্রুপের ০১ (১৬.৬৭%) জন, ৩৫-৪০ বয়স-গ্রুপের

০৩ (৫০.০০%) জন এবং ৪১-উর্ধ্ব বয়স-গ্রুপের ০২ (৩৩.৩৩%) জন উত্তরদাতা ছিলেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন ১৭-২২ বয়স-গ্রুপের ০১ (১১.১১%) জন, ২৩-২৮ বয়স-গ্রুপের ০১ (১১.১১%) জন, ২৯-৩৪ বয়স-গ্রুপের ০৩ (৩৩.৩৩%) জন, ৩৫-৪০ বয়স-গ্রুপের ০২ (২২.২২%) জন এবং ৪১-উর্ধ্ব বয়স-গ্রুপের ০২ (২২.২২%) জন। অন্যান্যদের মধ্যে ০৩ (৫০.০০%) জন ২৩-২৮ বয়স-গ্রুপের ০১ (১৬.৬৭%) জন ২৯-৩৪ বয়স-গ্রুপের এবং ০২ (৩৩.৩৩%) জন ৩৫-৪০ বয়স-গ্রুপের উত্তর প্রদান করেছেন (সারণি ১)।

১.২ ছাত্র রাজনীতির সাথে সংযুক্ততা

উত্তরদাতাদের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এই সংশ্লিষ্টতার প্রকৃতি নিচের সারণিতে প্রদান করা হলো :

সারণি ২

ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা

পেশা	উত্তরদাতাদের সংশ্লিষ্টতার অনুপাত				মোট (%)
	সংযুক্তি ছিল (%)	সংযুক্তি ছিল না (%)	এখনও আছে (%)	এখনও পর্যন্ত হয়নি (%)	
ছাত্র	১৭ (২২.৩৭)	১১ (১৪.৪৭)	০৪ (৫.২৬)	৪৪ (৫৭.৮৯)	৭৬ (৬৬.৬৭)
শিক্ষক	০৯ (৫২.৯৪)	০৬ (৩৫.২৯)	০১ (৫.৮৮)	০১ (৫.৮৮)	১৭ (১৪.৯১)
কর্মকর্তা	-	০৩ (৫০.০০)	-	০৩ (৫০.০০)	০৬ (৫.২৬)
ব্যবসায়ী	০২ (২২.২২)	০৩ (৩৩.৩৩)	০১ (১১.১১)	০৩ (৩৩.৩৩)	০৯ (৭.৮৯)
অন্যান্য	-	-	০৫ (৮৩.৩৩)	০১ (১৬.৬৬)	০৬ (৫.২৬)
সর্বমোট	২৮ (২৪.৫৬)	২৩ (২০.১৮)	১১ (৯.৬৫)	৫২ (৪৫.৬১)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত।

উপরের সারণি এটাই প্রমাণ করে যে, ১১৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৮ (২৪.৫৬%) জন ছাত্র রাজনীতির সাথে সংযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ১৭ (২২.৩৭%) জন ছাত্র, ০৯ (৫২.৯৪%) জন শিক্ষক এবং ০২ (২২.২২%) জন ব্যবসায়ী। ২৩ (২০.১৮%) জন উত্তরদাতা কখনোই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন না। ১১ (৯.৬৫%) জন উত্তরদাতা এখনো ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত আছেন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রুপের উত্তরদাতাগণ সর্বাধিক সংখ্যক ০৫ (৮৩.৩৩%) জন। ৫২ (৪৫.৬১%) জন উত্তরদাতা এখনো পর্যন্ত রাজনীতির সাথে যুক্ত হননি। এই তথ্য থেকে মনে করা যেতে পারে যে, বর্তমানে সমাজের একটি বৃহৎ অংশ ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়।

২. ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

২.১ ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের লক্ষ্যই হলো নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং ঐ স্বার্থ আদায়ের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত- প্রধানত ছাত্রদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা তা থেকে ভিন্নতর। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত - সে সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ যেসব মতামত প্রদান করেছেন, তা একে একে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৩ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১১৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৮ (৩৩.৩৩%) জন উত্তরদাতা মনে করেন, ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছাত্রদের কল্যাণ, ২২ (১৯.৩০%) জন উত্তরদাতা ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং ২৮

(২৪.৫৬%) জন উত্তরদাতা জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ২৬ (২২.৮১%) জন উত্তরদাতা বলেছেন, ছাত্ররা যেহেতু বর্তমানে কল্যাণধর্মী রাজনীতির সাথে যুক্ত নন, সুতরাং এ মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন নেই।

ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে মুজতবা খন্দকারের অভিমত এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি তাঁর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন যে, ৬০ এর দশক থেকে ৭০ এর দশক - আমাদের ছাত্র রাজনীতির এই সময়টা ছিলো এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ সময়ে ছাত্র সমাজ, ছাত্র রাজনীতি নিয়ে অনেকেই আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের অবহেলিত, শোষিত মানুষগুলো যে কোনো টানাপোড়নে ছুটে যেতেন ছাত্র নেতাদের কাছে। ছাত্র নেতারা এই মানুষগুলোর জন্য কিছু করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দেখাতেন। দেশের মানুষ যে কোন অসম্ভবে ছাত্র নেতাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু সে সময় বদলেছে। এখন ছাত্র রাজনীতিকে সবাই ঘৃণা করেন। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস করাই যেন এখন ছাত্র রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য।[১০]

সারণি ৩

ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত মতামত

পেশা	মতামতের হার				মোট (%)
	ছাত্রদের কল্যাণ করা (%)	জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রাথমিক পদক্ষেপ (%)	ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন নেই (%)	জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালন (%)	
ছাত্র	২৪ (৩১.৫৮)	১৬ (২১.৮৫)	১৩ (১৭.১০)	২৩ (৩০.২৬)	৭৬ (৬৬.৬৭)
শিক্ষক	১০ (৫৮.৮২)	০১ (৫.৮৮)	০৪ (২৩.৫৩)	০২ (১১.৭৬)	১৭ (১৪.৯১)
কর্মকর্তা	০৩ (৫০.০০)	০১ (১৬.৬৭)	০২ (৩৩.৩৩)	-	০৬ (৫.২৬)
ব্যবসায়ী	০১ (১১.১১)	০৩ (৩৩.৩৩)	০৩ (৩৩.৩৩)	০২ (২২.২২)	০৯ (৭.৮৯)
অন্যান্য	-	০১ (১৬.৬৭)	০৪ (৬৬.৬৭)	০১ (১৬.৬৭)	০৬ (৫.২৬)
সর্বমোট	৩৮ (৩৩.৩৩)	২২ (১৯.৩০)	২৬ (২২.৮১)	২৮ (২৪.৫৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

২.২ *ছাত্র রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য*

ছাত্র রাজনীতির সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা - একটি আরেকটির সম্পূর্ণ বিপরীত। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন পেশাজীবী বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। নিচের সারণির সাহায্যে ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে ৫৪ (৭১.০৫%) জন ছাত্র বলেছেন বর্তমান ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সাথে জড়িত এবং এ পরিস্থিতি জাতির জন্য হতাশাজনক ও ভয়াবহ। ০৮ (১০.৫৩%) জন ছাত্র বলেছেন বর্তমান ছাত্র রাজনীতি গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক, ১৪ (১৮.৪২%) জন ছাত্র উপরের দু'টি ধারার একটিকেও সমর্থন করেননি। শিক্ষকদের মধ্যে ১৩ (৭৬.৪৭%) জন সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কথা বলছেন এবং মাত্র ০৪ (২৩.৫৩%) জন উপরের কোনোটিকেই সমর্থন করেননি। এখানে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, কোনো শিক্ষকই বর্তমান ছাত্র রাজনীতিকে গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক বলে মনে করেন না।

---

[১০] গোলাম মোর্তোজা, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি : ছাত্র রাজনীতি প্রশ্নের মুখে", *বিচিত্রা*, ৩০ আগস্ট ১৯৯৬, পৃ. ২৩।

কর্মকর্তাদের মধ্যে ০৩ (৫০.০০%) জন সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্ভর, ০২ (৩৩.৩৩%) জন গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হিসেবে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির ধারাকে চিহ্নিত করেছেন। ০১ (১৬.৬৭%) জন কোনোটাই সমর্থন করেননি। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ০৬ (৬৬.৬৭%) জন বলেছেন, বর্তমান ছাত্র রাজনীতি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সাথে সংশ্লিষ্ট, ০২ (২২.২২%) জন বলেছেন, গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ছাত্র রাজনীতি সহায়ক এবং ০১ (১১.১১%) জন কোনোটিকেই সমর্থন করেননি। অন্যান্য পেশাজীবীর মধ্যে ০৫ (৮৩.৩৩%) জন বলেছেন, বর্তমানে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি জড়িত, ০১ (১৬.৬৭%) জন মনে করেন গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে ছাত্র রাজনীতি সহায়ক। সারণিতে উল্লিখিত মতামতের ভিত্তিতে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরদাতাদের একটি বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ ৮১ (৭১.০৫%) জন সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির উপর বর্তমান ছাত্র রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত বলে মতামত প্রদান করেছেন। গোলাম মোর্তোজার একটি প্রতিবেদনে প্রায় অভিন্ন মতামতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল, জেলাওয়ারি গ্রুপিং, ব্যক্তিগত শত্রুতা, ঠিকাদারি, চাঁদাবাজি এবং এগুলোর ফলে সংঘটিত অব্যাহত সন্ত্রাস ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখন ছাত্র রাজনীতি মানেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং বহিরাগত অছাত্রদের দাপট। এসব কারণে সবদিক দিয়েই বর্তমান ছাত্র রাজনীতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব পরিমণ্ডলেই প্রশ্নের মুখে[১১] (সারণি ৪)।

সারণি ৪
ছাত্র রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক(%)	কর্মকর্তা(%)	ব্যবসায়ী(%)	অন্যান্য(%)	
সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সাথে সংশ্লিষ্ট	৫৪ (৭১.০৫)	১৩ (৭৬.৪৭)	০৩ (৫০.০০)	০৬ (৬৬.৬৭)	০৫ (৮৩.৩৩)	৮১ (৭১.০৫)
গণতন্ত্র ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক	০৮ (১০.৫৩)	-	০২ (৩৩.৩৩)	০২ (২২.২২)	০১ (১৬.৬৯)	১৩ (১১.৪০)
কোনোটাই না	১৪ (১৮.৪২)	০৪ (২৩.৫৩)	০১ (১৬.৬৭)	০১ (১১.১১)	-	২০ (১৭.৫৫)
মোট	৭৬ (৬৬.৬৭)	১৭ (১৪.৯১)	০৬ (৫.২৬)	০৯ (৭.৮৯)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

২.৩ *সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি*

বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হত্যা, অস্থিরতা, চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাস নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ছাত্র সংগঠনগুলোতে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, প্রকৃত রাজনৈতিক-আদর্শিক শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। সন্ত্রাসের ফলে বাংলাদেশের প্রথম সারির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্রের মূল্যবান জীবন মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে। যেমন সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ৬০ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ২৫ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ৩ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ১২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।[১২] ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির অনুপ্রবেশ সম্পর্কে উত্তরদাতারা যেসব মতামত প্রদান করেছেন তা নিচে আলোচনা করা হলো :

---

[১১] রেজানুর রহমান ও ফজলুল বারী, "অস্থির শিক্ষাঙ্গন : হত্যা এবং সন্ত্রাস-গন্তব্য কোথায়", *খবরের কাগজ*, ৩ আগস্ট ১৯৮৯, পৃ. ৫।

[১২] সুলতান আহমদ, *প্রাগুক্ত*, ১৩ : ৪, নভেম্বর ১৯৯৬।

৫নং সারণিতে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কারণ হিসেবে উত্তরদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক ২৬ (২২.৮১%) জন উত্তরদাতা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন। এর মধ্যে ১৮ (২৩.৬৮%) জন ছাত্র, ০৩ (১৭.৬৫%) জন শিক্ষক, ০২ (৩৩.৩৩%) জন কর্মকর্তা, ০১ (১১.১১%) জন ব্যবসায়ী, ০২ (৩৩.৩৩%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত উত্তরদাতা। ২৪ (২১.০৫%) জন উত্তরদাতা ছাত্র রাজনীতির সাথে মূল রাজনৈতিক দলগুলোর সংযুক্তির কথা বলেছেন। এর মধ্যে ১৮ (২৩.৬৮%) জন ছাত্র, ০৩ (১৭.৬৫%) জন শিক্ষক, ০১ (১৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০১ (১১.১১%) জন ব্যবসায়ী এবং ০১ (১৬.৬৭%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত পেশাজীবী। তৃতীয় কারণ হিসেবে ১৯ (১৬.৬৭%) জন উত্তরদাতা চিহ্নিত করেছেন, রাজনীতিতে অস্ত্রের ব্যবহারকে। ১৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৩ (১৭.১১%) জন ছাত্র, ০৩ (১৭.৬৫%) জন শিক্ষক, ০১ (১৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০২ (২২.২২%) জন ব্যবসায়ী। ১৮ (১৫.৭৯%) জন উত্তরদাতা কারণ হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার কথা এবং ১১ (৯.৬৫%) জন উত্তরদাতা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। নেতৃত্বের অভাবকে দায়ী করেছেন ০৯ (৭.৮৯%) জন উত্তরদাতা।

সারণি ৫

সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সংযুক্ততা

পেশা	মতামতের হার							মোট (%)
	মূল রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্তি (%)	নেতৃত্বের অভাব (%)	রাজনীতিতে অস্ত্রের ব্যবহার (%)	আর্থ-সামাজিক অবস্থা (%)	বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা (%)	রাজনীতিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা (%)	সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা (%)	
ছাত্র	১৮ (২৩.৬৮)	০৪ (৫.২৬)	১৩ (১৭.১১)	১৮ (২৩.৬৯)	০৬ (৭.৮৯)	০৪ (৫.২৬)	১৩ (১৭.১১)	৭৬ (৬৬.৬৭)
শিক্ষক	০৩ (১৭.৬৫)	০২ (১১.৭৬)	০৩ (১৭.৬৫)	০৩ (১৭.৬৫)	০২ (১১.৭৬)	০২ (১১.৭৬)	০২ (১১.৭৬)	১৭ (১৪.৯১)
কর্মকর্তা	০১ (১৬.৬৭)	০১ (১৬.৬৭)	০১ (১৬.৬৭)	০২ (৩৩.৩৩)	-	-	০১ (১৬.৬৭)	০৬ (৫.২৬)
ব্যবসায়ী	০১ (১১.১১)	০২ (২২.২২)	০২ (২২.২২)	০১ (১১.১১)	০২ (২২.২২)	০১ (১১.১১)	-	০৯ (৭.৮৯)
অন্যান্য	০১ (১৬.৬৭)	-	-	০২ (৩৩.৩৩)	০১ (১৬.৬৭)	-	০২ (৩৩.৩৩)	০৬ (৫.২৬)
সর্বমোট	২৪ (২১.০৫)	০৯ (৭.৮৯)	১৯ (১৬.৬৭)	২৬ (২২.৮১)	১১ (৯.৬৫)	০৭ (৬.১৪)	১৮ (১৫.৭৯)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ছাত্র সংগঠনে গণতন্ত্র চর্চার অভাব, অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপথগামী শিক্ষা, দিক নির্দেশনাহীন রাজনীতি, এবং মৌলবাদের উত্থান বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে এবং ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির জন্য দায়ী।[১৩]

বিশেষভাবে সুলতান আহমদ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির কারণ হিসেবে কতকগুলো বিষয়কে দায়ী করেছেন। কারণগুলো হলো - শিক্ষা বহির্ভূত দলীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্লাটফরম হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা, রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনসমূহের বক্তৃতা-বিবৃতিতে এবং অন্যান্য কাজে উগ্র আচার-আচরণ প্রদর্শন, সন্ত্রাসীদের লালন, অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য মূল রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান, অঞ্চল বা গ্রুপভিত্তিক অন্তর্দলীয় কোন্দল, অনিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের দলীয় দৃষ্টিকোণ

[১৩] রেজানুর রহমান ও ফজলুল বারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

থেকে প্রশাসন পরিচালনা এবং তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও দায়িত্বে চরম অবহেলা, যে কোনো অন্যায়-অপকর্মের সুষ্ঠু বিচার না হওয়া ইত্যাদি।[১৪] এসব মতামতের সঙ্গে বর্তমান জরিপের মতামতের প্রায় অভিন্নতার বিষয়টি লক্ষণীয়। তবে যেহেতু প্রশ্নমালার মধ্যে মৌলবাদের উত্থানের প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, সেহেতু উত্তরদাতাদের নিকট থেকে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

২.৪ *সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের প্রভাব*

পাকিস্তানি শাসন-আমল থেকেই ছাত্র রাজনীতি এদেশে একটি গণতান্ত্রিক ও সুস্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। কিন্তু এদেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক, সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারের সময়ে সরকারি দলের প্রভাবপুষ্ট কতিপয় ছাত্র সংগঠন ছাত্র রাজনীতিকে করে তুলেছে অসুস্থ। ছাত্র রাজনীতির সুস্থতা সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের উপর কতোখানি নির্ভরশীল নিচের সারণিতে সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত তুলে ধারা হলো :

সারণি ৬-এ সন্নিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৭৫ (৬৫.৭৯%) জন উত্তরদাতার মতে, সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের উপর ছাত্র রাজনীতির সুস্থতা অনেকখানি নির্ভরশীল। এর মধ্যে ৪৯ (৬৪.৪৭%) জন ছাত্র, ১০ (৫৮.৮২%) জন শিক্ষক, ০২ (৩৩.৩৩%) জন কর্মকর্তা, ০৮ (৮৮.৮৯%) জন ব্যবসায়ী, ০৬ (১০০%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত পেশাজীবী। ৩৯ (৩৪.২১%) জন উত্তরদাতা মনে করেন, সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের উপর ছাত্র রাজনীতির সুস্থতা নির্ভরশীল নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণীর সব উত্তরদাতা সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনকে ছাত্র রাজনীতির সুস্থতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের তৎকালীন গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ছাত্রলীগের দুইজন কেন্দ্রীয় নেতার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত 'সেভেন মার্ডার', প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষ, জেনারেল এরশাদের সময়ে 'নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ'-এর সঙ্গে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষ এবং সংগঠনটির অব্যাহত সন্ত্রাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি এর অন্যতম উদাহরণ।[১৫] উত্তরদাতাদের মতামতের সঙ্গে এসব উদাহরণ বা ঘটনা কোনো প্রকার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে না।

সারণি ৬

ছাত্র রাজনীতিতে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের প্রভাব

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক (%)	কর্মকর্তা (%)	ব্যবসায়ী (%)	অন্যান্য (%)	
নির্ভরশীল (হ্যাঁ)	৪৯ (৬৪.৪৭)	১০ (৫৮.৮২)	০২ (৩৩.৩৩)	০৮ (৮৮.৮৯)	০৬ (১০০)	৭৫ (৬৫.৭৯)
নির্ভরশীল না (না)	২৭ (৩৫.৫৩)	০৭ (৪১.১৮)	০৪ (৬৬.৬৭)	০১ (১১.১১)	-	৩৯ (৩৪.২১)
মোট	৭৬ (৬৬.৬৭)	১৭ (১৪.৯১)	০৬ (৫.২৬)	০৯ (৭.৮৯)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

২.৫ *সুস্থ ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশের সংশ্লিষ্টতা*

সুস্থ জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে, যাতে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে পারে।

---

[১৪] সুলতান আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮।

[১৫] রেজানুর রহমান ও ফজলুল বারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।

জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুস্থ জাতীয় রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সু-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির অনেক পূর্ব থেকেই দেশটিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বারবার দলিত হয়েছে সামরিক-স্বৈরাচারী শাসনের দ্বারা। তাছাড়া জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব এবং দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসহনশীল মনোভাব, রাজনৈতিক পরিবেশকে করে তুলেছে বিষময়। যা ছাত্র রাজনীতিকে করেছে অসুস্থ। এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত পরবর্তী পৃষ্ঠায় পর্যালোচনা করা হলো :

সারণি ৭

ছাত্র রাজনীতির সুস্থতা

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক (%)	কর্মকর্তা (%)	ব্যবসায়ী (%)	অন্যান্য (%)	
সুস্থ রাজনীতি গড়তে সহায়ক (হ্যাঁ)	৬৯ (৯০.৭৯)	১২ (৭০.৫৯)	০৪ (৬৬.৬৭)	০৮ (৮৮.৮৯)	০৬ (১০০)	৯৯ (৮৬.৮৪)
সুস্থ রাজনীতি গড়তে সহায়ক নয় (না)	০৪ (৫০.২৬)	০৩ (১৭.৬৫)	-	-	-	০৭ (৬.১৪)
উপরের কোনোটিই না	০৩ (৩.৯৫)	০২ (১১.৭৬)	০২ (৩৩.৩৩)	০১ (১১.১১)	-	০৮ (৭.০২)
মোট	৭৬ (৬৬.৬৭)	১৭ (১৪.৯১)	০৬ (৫.২৬)	০৯ (৭.৮৯)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত।

বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবীর মধ্যে ৯৯ (৮৬.৮৪%) জন মনে করেন, সুস্থ জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থ ছাত্র রাজনীতি গড়তে সহায়ক। এর মধ্যে ৬৯ (৯০.৭৯%) জন ছাত্র, ১২ (৭০.৫৯%) জন শিক্ষক, ০৪ (৬৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০৮ (৮৮.৮৯%) জন ব্যবসায়ী এবং ০৬ (১০০%) জন অন্যান্য পেশাজীবীর উত্তরদাতা। মোট ০৭ (৬.১৪%) জন উত্তরদাতা মনে করেন, সুস্থ ছাত্র রাজনীতি গড়ার ক্ষেত্রে সুস্থ জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে না। ০৮ (৭.০২%) জন উপরের কোনো প্রকার মতামতকেই সমর্থন করেন না। তবে এ কথা সত্যি যে, সুস্থ ছাত্র রাজনীতি গড়তে সুস্থ জাতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (সারণি ৭)।

২.৬ *সেশনজট ও সন্ত্রাসের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সম্পর্ক*

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেশনজট ও সন্ত্রাস একটি সাধারণ বিষয়। এক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতি কোনো অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে কিনা-তা উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৮-এ উল্লিখিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭ (৫৮.৭৭%) জন উত্তরদাতা মনে করেন, সেশনজট ও সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৭ (৬১.৮৪%) জন ছাত্র, ০৬ (৩৫.২৯%) জন শিক্ষক, ০৪ (৬৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০৭ (৭৭.৭৮%) জন ব্যবসায়ী এবং ০৩ (৫০%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত পেশাজীবী। ৪৪ জন উত্তরদাতা মনে করেন, সেশনজট ও সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী নয়। এর মধ্যে ২৭ (৩৫.৫৩%) জন ছাত্র, ১১ (৬৪.৭১%) জন শিক্ষক, ০২ (৩৩.৩৩%) জন কর্মকর্তা, ০২ (২২.২২%) জন ব্যবসায়ী এবং ০২ (৩৩.৩৩%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত। মাত্র ০৩ (২.৬৩%) জন উত্তরদাতা কোনো প্রকার মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে শুধুমাত্র শিক্ষক শ্রেণীর উত্তরদাতারাই অন্যান্যদের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী মতামত প্রদান করেছেন এবং তাহলো সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক (১৭ জনের মধ্যে ১১ জন) সেশনজট ও সন্ত্রাসের জন্য ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করেননি। তবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয়, অন্যান্য অনুঘটকের মতো ছাত্র রাজনীতির বর্তমান অবস্থা সেশনজট ও সন্ত্রাসের একটি উল্লেখযোগ্য অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই মতামতের পক্ষে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির কারণে সৃষ্ট ষোলটি সংঘর্ষে ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত বন্ধ ছিল ২৮৭ দিন এবং ঐ সব সংঘর্ষে ৩ জন ছাত্রের মুল্যবান জীবন হারায় ও ৩৪৫ জন ছাত্র আহত হয়।[১৬]

সারণি ৮

সেশনজট ও সন্ত্রাসের সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক (%)	কর্মকর্তা (%)	ব্যবসায়ী (%)	অন্যান্য (%)	
ছাত্র রাজনীতি দায়ী	৪৭ (৬১.৮৪)	০৬ (৩৫.২৯)	০৪ (৬৬.৬৭)	০৭ (৭৭.৭৮)	০৩ (৫০)	৬৭ (৫৮.৭৭)
ছাত্র রাজনীতি দায়ী নয়	২৭ (৩৫.৫৩)	১১ (৬৪.৭১)	০২ (৩৩.৩৩)	০২ (২২.২২)	০২ (৩৩.৩৩)	৪৪ (৩৮.৬০)
মতামত নেই	০২ (২.৬৩)	-	-	-	০১ (১৬.৬৭)	০৩ (২.৬৩)
মোট	৭৬ (৬৬.৬৭)	১৭ (১৪.৯১)	০৬ (৫.২৬)	০৯ (৭.৮৯)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

৩. ছাত্র রাজনীতি চালু রাখার পক্ষে-বিপক্ষে মতামত

৩.১ *ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিতর্ক*

বর্তমান ছাত্র রাজনীতির নেতিবাচক অনেক ঘটনা দেশ ও জাতিকে মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ছাত্র রাজনীতি এদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। তাই ছাত্রদের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকা উচিত কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্তরদাতা যেসব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হলো :

সারণি ৯

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রসঙ্গ

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক (%)	কর্মকর্তা (%)	ব্যবসায়ী (%)	অন্যান্য (%)	
বন্ধ থাকা উচিত	৫৫ (৭২.৩৭)	১১ (৬৪.৭১)	০৪ (৬৬.৬৭)	০৯ (১০০.০০)	০৬ (১০০)	৮৫ (৭৪.৫৬)
বন্ধ থাকা উচিত না	১৮ (২৩.৬৮)	০৪ (২৩.৫৩)	-	-	-	২২ (১৯.৩০)
কোনোটাই না	০৩ (৩.৯৫)	০২ (১১.৭৬)	০২ (৩৩.৩৩)	-	-	০৭ (৬.১৪)
মোট	৭৬ (৬৬.৬৭)	১৭ (১৪.৯১)	০৬ (৫.২৬)	০৯ (৭.৮৯)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ৮৫ (৭৪.৫৬%) জন উত্তরদাতা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ৫৫ (৭২.৩৭%) ছাত্র, ১১ (৬৪.৭১%) জন শিক্ষক, ০৪ (৬৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০৯ (১০০%) জন ব্যবসায়ী এবং ০৬ (১০০%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত। ছাত্র

[১৬] তথ্যসূত্র : পাবলিক রিলেশন অফিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

রাজনীতি বন্ধ না থাকার পক্ষে মতামত দিয়েছেন ২২ (১৯.৩০%) জন উত্তরদাতা। এর মধ্যে ১৮ (২৩.৬৮%) জন ছাত্র, ০৪ (২৩.৫৩%) জন শিক্ষক। উত্তর দানে বিরত ছিলেন ০৭ (৬.১৪%) জন উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা কোনো মতেই ছাত্রদের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল নয়। এ কারণে ছাত্রদের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকা উচিত। দৈনিক *ভোরের কাগজ* পরিচালিত এক জরিপে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে প্রায় একই রকম মতামত পাওয়া যায়। ভোরের কাগজ পরিচালিত জরিপে ৯২০২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৬৯৪৭ (৭৫.৪৯%) জন উত্তরদাতা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মতামত প্রদান করেন, ১৬৪৫ (১৭.৮৮%) জন উত্তরদাতা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন এবং ৬১০ (৬.৬৩%) জন উত্তরদাতা কোনো প্রকার মতামত প্রদান করেননি।[১৭]

৩.২ *ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার সময় নির্ধারণ*

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার পক্ষে বিভিন্ন পেশাজীবী উত্তরদাতার মতামত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি প্রশ্ন প্রশ্নমালার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রশ্নটি হলো - ছাত্র রাজনীতি দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হওয়া উচিত, না স্বল্প সময়ের জন্য বন্ধ হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে উত্তরদাতার মতামত তুলে ধরা হলো :

সারণি ১০

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকার সময় নির্ধারণ

পেশা / মতামত	উত্তরদাতাদের মতামতের হার					সর্বমোট (%)
	ছাত্র (%)	শিক্ষক (%)	কর্মকর্তা (%)	ব্যবসায়ী (%)	অন্যান্য (%)	
দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হওয়া উচিত	৪৫ (৬৫.২২)	০৮ (১১.৫৯)	০৩ (৪.৩৫)	০৭ (১০.১৪)	০৬ (৮.৭০)	৬৯ (৮১.১৮)
স্বল্প সময়ের জন্য বন্ধ হওয়া উচিত	১০ (৬২.৫)	০৩ (১৮.৭৫)	০১ (৬.২৫)	০২ (১২.৫০)	-	১৬ (১৮.৮২)
মোট	৫৫ (৬৪.৭০)	১১ (১২.৯৪)	০৪ (৪.৭১)	০৯ (১০.৫৯)	০৬ (৭.০৬)	৮৫ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

১০ নম্বর সারণি অনুযায়ী বলা যায় যে, সর্বমোট ৬৯ (৮১.১৮%) জন উত্তরদাতা দীর্ঘ সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন। এর মধ্যে ৪৫ (৬৫.২২%) জন ছাত্র, ০৮ (১১.৫৯%) জন শিক্ষক, ০৩ (৪.৩৫%) জন কর্মকর্তা, ০৭ (১০.১৪%) জন ব্যবসায়ী এবং ০৬ (৮.৭০%) জন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত। মাত্র ১৬ জন উত্তরদাতা স্বল্প সময়ের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে ১০ (৬২.৫%) জন ছাত্র, ০৩ (১৮.৭৫%) জন শিক্ষক, ০১ (৬.২৫%) জন কর্মকর্তা এবং ০২ (১২.৫০%) জন ব্যবসায়ী। উত্তরদাতাদের মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা ছাত্রদের এবং জাতির জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়।

৪. ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা থেকে উত্তরণের উপায়

৪.১ *উত্তরদাতাদের মতামত*

ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এরশাদীয় সামরিক স্বৈরাচারের শাসনকাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন- সংগ্রামে ছাত্র সমাজ পালন করেছে অনুঘটকের ভূমিকা। ছাত্র আন্দোলন কোনো স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংক্রিয় ঘটনা নয়। এদেশে ছাত্র আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক তোলপাড় ঘটাতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গঠনেও ছাত্র সমাজ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে বর্তমানে নেতিবাচক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নব্বইয়ের

[১৭] দৈনিক *ভোরের কাগজ*, ১২ মে ১৯৯৮।

গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ছাত্র আন্দোলনে দেখা দেয় বন্ধ্যাত্ব।[১৮] কিভাবে এ অবস্থার উত্তরণ সম্ভব এবং ছাত্র রাজনীতি কিভাবে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ফিরে পেতে পারে সে সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ যেসব মতামত প্রদান করেছেন নিচের সারণির মাধ্যমে তা বিশ্লেষণ করা হলো :

সারণি ১১
ছাত্র রাজনীতির সুস্থতা পুনরুদ্ধার

পেশা	মতামতের হার					মোট (%)
	রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ রাখা (%)	ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করা (%)	আইন ও বিচার প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষ ও সক্রিয় হওয়া (%)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা (%)	ছাত্র সংসদ বন্ধ রাখা (%)	
ছাত্র	২০ (২৬.৩২)	১৮ (২৩.৬৮)	১৭ (২২.৩৭)	১৭ (২২.৩৭)	০৪ (৫.২৬)	৭৬ (৬৬.৬৭)
শিক্ষক	০৪ (২৩.৫৩)	০৪ (২৩.৫৩)	০৩ (১৭.৬৫)	০৫ (২৯.৪১)	০১ (৫.৮৮)	১৭ (১৪.৯১)
কর্মকর্তা	০২ (৩৩.৩৩)	০২ (২৩.৩৩)	০১ (১৬.৬৭)	০১ (১৬.৬৭)	-	০৬ (৫.২৬)
ব্যবসায়ী	০২ (২২.২২)	০৩ (৩৩.৩৩)	০২ (২২.২২)	০১ (১১.১১)	০১ (১১.১১)	০৯ (৭.৮৯)
অন্যান্য	০২ (৩৩.৩৩)	০১ (১৬.৬৭)	০১ (১৬.৬৭)	০২ (৩৩.৩৩)	-	০৬ (৫.২৬)
মোট	৩০ (২৬.৩২)	২৮ (২৪.৫৬)	২৪ (২১.০৫)	২৬ (২২.৮০)	০৬ (৫.২৬)	১১৪ (১০০)

উৎস: মাঠ পর্যয়ে সংগৃহীত।

সারণি ১১তে উল্লেখিত তথ্য থেকে বলা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে ২০ (২৬.৩২%) জন, শিক্ষকদের মধ্যে ৪ (২৩.৫৩%) জন, কর্মকর্তাদের মধ্যে ০২ (২৩.৩৩%) জন, ব্যবসায়ীদের ০২ (২২.২২%) জন এবং অন্যান্য শ্রেণীভুক্তদের মধ্যে ০২ (৩৩.৩৩%) জন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ রাখার সুপারিশ করেছেন। ছাত্রদের রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন ১৮ (২৩.৬৮%) জন ছাত্র, ০৪ (২৩.৫৩%) জন শিক্ষক, ০২ (৩৩.৩৩%) জন কর্মকর্তা, ০৩ (৩৩.৩৩%) জন ব্যবসায়ী এবং ০১ (১৬.৬৭%) জন অন্যান্য শ্রেণীর উত্তরদাতা। আইন ও বিচার প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর নিরপেক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কথা সুপারিশ করেছেন ১৭ (২২.৩৭%) জন ছাত্র, ০৩ (১৭.৬৫%) জন শিক্ষক, ০১ (১৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০২ (২২.২২%) জন ব্যবসায়ী এবং ০১ (১৬.৬৭%) জন্য অন্যান্য শ্রেণীর উত্তরদাতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কথা উল্লেখ করেছেন ১৭ (২২.৩৭%) জন ছাত্র, ০৫ (২৯.৪১%) জন শিক্ষক, ০১ (১৬.৬৭%) জন কর্মকর্তা, ০১ (১১.১১%) জন ব্যবসায়ী এবং ০২ (৩৩.৩৩%) জন অন্যান্য শ্রেণীর উত্তরদাতা। সবচেয়ে কম মতামত প্রদান করা হয়েছে ছাত্র সংসদ বন্ধ রাখার পক্ষে। এ বিষয়ে ০৪ (৫.২৬%) জন ছাত্র, ০১ (৫.৮৮%) জন শিক্ষক, ০১ (১১.১১%) জন ব্যবসায়ী উত্তরদাতা মতামত প্রদান করেছেন। মতামতগুলো নিম্নরূপে সাজানো যেতে পারে।

৪.২ *বর্তমান ধারা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ*

উত্তরদাতাদের নিকট থেকে যেসব সুপারিশ পাওয়া গেছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

[১৮] আসাদ আদনান ও লুৎফর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

১. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ছাত্ররা যাতে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো যাতে নিরপেক্ষ ও কঠোর ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধির আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা, যাতে কোনো ছাত্র শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত করলে দ্রুত যথাযথ বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা যায়।

৫. ছাত্র সংসদ বন্ধ রাখতে হবে অথবা ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও বাতিল যাতে যথাসময়ে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অছাত্ররা যাতে পুনরায় ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে নির্বাচন করতে না পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনকে রাজনৈতিক দলগুলো যাতে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের জন্য দলীয় প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার না করতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

জরিপ কার্য পরিচালনার সময়ে একাধিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং একাধিক পত্রিকায় প্রতিফলিত মতামতের ভিত্তিতে উল্লিখিত সুপারিশকে আরো কিছুটা প্রলম্বিত করা যায়। উত্তরদাতাদের প্রদত্ত সুপারিশের সঙ্গে তা বিশেষ কোনো বিরোধ সৃষ্টি করে না। এ ধরনের কয়েকটি সুপারিশ নিম্নরূপ :

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়াশুনা ও গবেষণা করার জন্য, রাজনৈতিক শ্লোগান বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পরিচালিত হতে না পারে সেজন্যে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের উচিত কার্যকর বিধি-নিষেধ আরোপ করা এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করা।

২. সন্ত্রাসী ও বহিরাগত ছাত্র এবং অছাত্র অস্ত্রবাজরা যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হলগুলোকে অভয়ারণ্য বা নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে তজ্জন্য হল প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগুলোকে সময়োপযোগী নিময়-কানুন তৈরি করে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক যাঁরা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কাজে সহায়তা করেন এবং পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির বিধান রাখা উচিত।[১৯]

৪. সর্বোপরি, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত, সব ধরনের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে তাদের সব ধরনের সংযোগ ছিন্ন করা।[২০]

সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের সততা ও সদিচ্ছা থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ছাত্র রাজনীতিতে বিদ্যমান সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি এবং এগুলোর কারণে সংঘটিত সেশনজটসহ অন্যান্য খারাপ দিকগুলো চিরতরে দূর করা সম্ভব। তবে এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজের অভিভাবকবৃন্দের এবং দেশের সুশীল সমাজের সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

---

[১৯] সুলতান আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

[২০] মুজতবা খন্দকার, "ছাত্র রাজনীতি : মেধাবীরা দুরে সরে যাচ্ছে", *বিচিত্রা*, ২৩ মে ১৯৯৭, পৃ. ২৭।

উপসংহার

নিবন্ধটির লক্ষ্য ছিলো ছাত্র রাজনীতি কি, ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা অর্থাৎ ছাত্র রাজনীতিতে বর্তমানে কি ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং ছাত্র রাজনীতি কিভাবে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ অবস্থা ফিরে পেতে পারে তা উদ্‌ঘাটন করা। নিবন্ধটির আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফলে লক্ষ করা যায় যে, বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ছাত্ররা হলো সমাজের একটি সচেতন শক্তি, যারা নিজেদের, জনগণের এবং দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে। তবে বর্তমানে ছাত্র রাজনীতির অবস্থা ভিন্ন। উত্তরদাতাদের মতামতে বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতির সঠিক চিত্রটিই প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের কল্যাণের চেয়ে বরং সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট। ছাত্র রাজনীতিতে বিভিন্ন দুষ্ট চক্র (যেমন- সরকারি ও বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব, অস্ত্রের ব্যবহার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা ইত্যাদি) বিদ্যমান, যা ছাত্র রাজনীতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ছাত্র রাজনীতির এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিবন্ধে উল্লিখিত উত্তরণের উপায়গুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে একথা সত্যি যে, এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক দল, সরকার, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবকবৃন্দসহ সবাইকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় পুনরুদ্ধারে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

হস্তচালিত তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যয়ের নির্ধারকসমূহের গুরুত্ব নির্ণয়

সুব্রত কুমার দে*

Abstract: The study is based on a survey of 21 Weavers of the Delduar upazila under the district of Tangail. The entrepreuners were interviewed through a structured questionniare as per the objectives of the study. Major findings are that the entrepreuners are successful in producing quality products but due to lack of cost related ideas their profits are meagre. They are in need of better marketing services and other infrustructural facilities for their continuous development. Quality raw-materials, power supply, adequate working capital, modern machines and equipments, education and training are also required for sustainable profitability of the units.

ভূমিকা

হস্তচালিত তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সর্বপ্রধান কুটির শিল্প। এই তাঁতশিল্প দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ সরবরাহ করে। শিল্পগুলোতে উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে সুতি কাপড়, জামদানি, বানারসি, সফট সিল্ক, গ্যাস, তসর, লুঙ্গি, ধুতি, গেঞ্জি, বিছানার চাদর, গামছা, তোয়ালে, গায়ের চাদর, মশারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের শাড়ি দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। মধ্যযুগে জগৎ বিখ্যাত মসলিন শাড়ি বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অনন্য উদাহরণ। বর্তমানে তাঁতের তৈরি টাঙ্গাইল শাড়ি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার তাঁতের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বর্তমানে দেশে মোট তাঁতের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ এবং ৫০ লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। বিগত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তথ্য মতে এই শিল্পে প্রায় ৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং জিডিপি-তে এই শিল্পের অবদান হচ্ছে ৫%।[১] পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় এই শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,৩৬,৯৫০.৩০ লক্ষ টাকা।[২] ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে জিডিপি-তে এই শিল্পের অবদান হচ্ছে ৭.৫%।[৩] তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পের অবদানকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ ত্রুটি রয়েছে। শুধু তাই নয়, একদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার বাজার মূল্যের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; অপরদিকে ক্রেতা সন্তুষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে বিক্রেতাকে বাজারে টিকে থাকতে হয়।

এমতাবস্থায় পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে শিল্প উদ্যোক্তাকে উৎপাদন ব্যয় হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ, ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নির্ধারণে ব্যয় উপাদানগুলোর প্রভাব, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে

---

*এম.ফিল ফেলো, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[১] পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৯৭ - ২০০২* (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন) মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৩৩০।

[২] পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৯৭ - ২০০২* (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন) মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৩২৫।

[৩] অর্থমন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০১* (ঢাকা: অর্থ বিভাগ) জুন ২০০১, পৃ. ৫৯।

সতর্ক হওয়া একান্ত অপরিহার্য। উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিকগুলোকে এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত ব্যয় উপাদানের গুরুত্ব নির্ণয় করা, আয়ের সাথে বিভিন্ন ব্যয় উপাদানের সম্পর্ক নিরূপণ করা এবং উৎপাদন ব্যয় হিসাব পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা যাচাই করা এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বিষয় বিবরণ

কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের জন্য ব্যয়কে উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণি বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। নিম্নে ব্যয়ের উপাদান ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো:[৪]

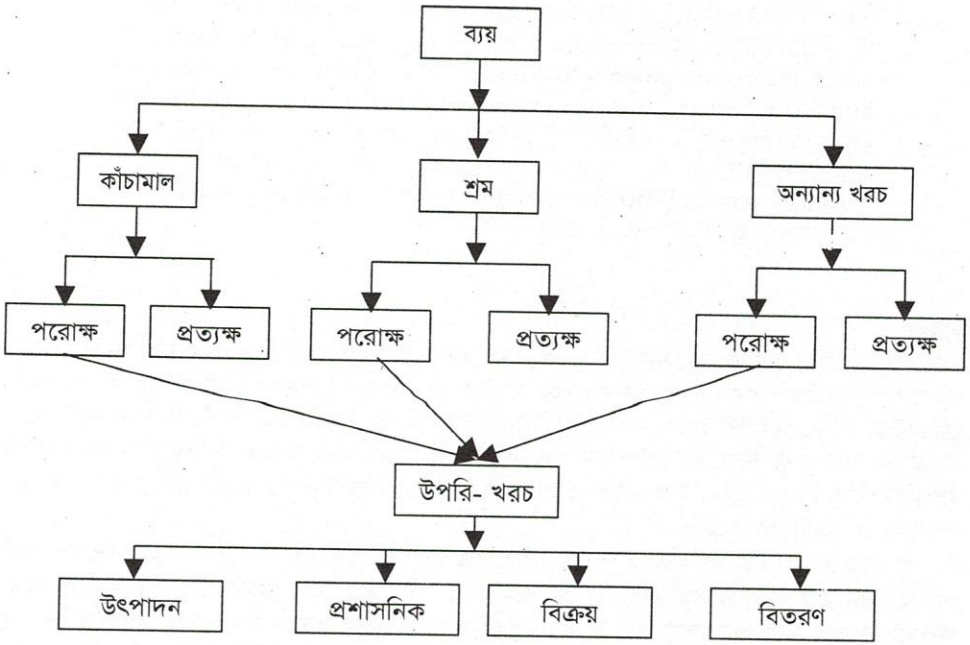

উপস্থাপিত ছক অনুযায়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের সঙ্গে প্রত্যক্ষ শ্রমব্যয় ও প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলে মুখ্য খরচ পাওয়া যায়। মুখ্য খরচে সঙ্গে কারখানা উপরি-খরচ যোগ করলে সে যোগফলকে বলা হয় কারখানা ব্যয়। কারখানা ব্যয়ের সাথে অফিস খরচ যোগ করলে পাওয়া যায় উৎপাদন ব্যয় । উৎপাদন ব্যয়ের সাথে বিক্রয় ও বিতরণ খরচ যোগ করলে সে যোগফলকে বলা হয় বিক্রিত পণ্যের ব্যয়। বিক্রিত পণ্যের ব্যয় যদি বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে এই দুইয়ের পার্থক্যকে বলা হয় ক্ষতি বা লোকসান। আর যদি বিপরীত হয় তাহলে তাকে বলে মুনাফা বা লাভ।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যয় নির্ধারণে উৎপাদনের প্রতিটি উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মোট ব্যয়কে প্রভাবিত করছে। ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলোর কোনো একটির ন্যূনতম পরিবর্তন হলে উৎপাদনের মোট ব্যয়েরও পরিবর্তন হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়মূল্যের উপর বিক্রেতার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না; ফলে ব্যয় উপাদানগুলোর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসার

---

[4] S.P. Jain and K.L. Narang, *Advanced Cost Accounting : A Managerial Approach*, 3rd. ed.,(New Delhi: Kalyani Publishers, 1982) p. 1.21.

মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা বৃদ্ধিকরণ বা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যয় হ্রাসকরণ। আর তা করতে হলে ব্যয়কে আচরণের ভিত্তিতে ভাগ করতে হবে।

আচরণের ভিত্তিতে ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ:

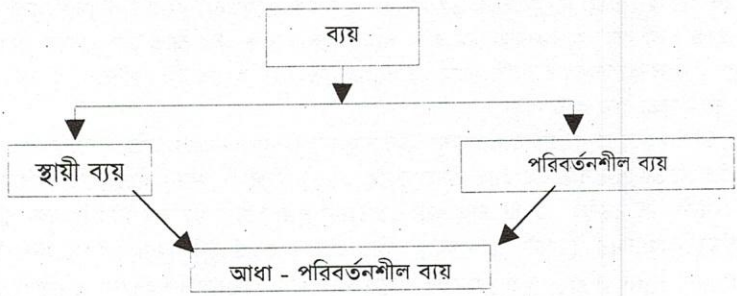

এখানে স্থির ব্যয় স্বল্পকালে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল ব্যয় যেমন– প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ব্যয়, প্রত্যক্ষ উপরি-খরচ এবং পরোক্ষ খরচগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ব্যয় আচরণ বিশ্লেষণ করে প্রান্তিক ব্যয় কৌশল, বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল, পরিশোষণ ব্যয় কৌশল সমরূপ ব্যয় কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যয় নিযন্ত্রণ করা যায়।

শুধু তাই নয়, প্রতিটি ব্যয় সংগঠিত হওয়ার পর তা উৎপাদন ব্যয় হিসাবে বিভিন্ন খতিয়ানে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে ব্যয় নির্ধারণ করা যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় হিসাবের যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সঠিকভাবে প্রতিটি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করা যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার জন্য টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল গ্রামকে ১ অক্টোবর ২০০১ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত) নির্বাচন করা হয়। গ্রামটির প্রায় ৮০% লোক তাঁতশিল্পে নিয়োজিত। এ গ্রামে ১০৭টি বাড়িতে ৯৪৫টি তাঁতে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হচ্ছে এবং ৩ থেকে ৪ হাজার লোক এই তাঁতশিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল ও মির্জাপুর উপজেলায়ও তাঁতে কাপড় তৈরি হয়। তবে দেলদুয়ার পাথরাইল গ্রামে অধিকতর মানসম্পন্ন শাড়ি কাপড় তৈরি হয়ে থাকে। এ গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায় তাঁদের তৈরি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে অধিকতর তৎপর। তবে শিল্প সম্প্রসারণে তাঁদের আর্থিক সংকট রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল গ্রামের তাঁতশিল্পকে গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামের ১০৭টি তাঁতশিল্প ইউনিট থেকে (২০% হারে) ২১টি তাঁতশিল্প ইউনিটকে বিনিয়োগকৃত মূলধনের ভিত্তিতে দৈবচয়ন পদ্ধতির আলোকে নমুনায়ন করা হয়। ১২টি ইউনিট নির্বাচন করা হয়েছে যাঁদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ২ লক্ষ টাকার কম এবং ৯টি ইউনিট নির্বাচন করা হয়েছে যাঁদের বিনিয়োগকৃত মূলধন ২ লক্ষ টাকা বা ২ লক্ষ টাকার বেশি। ৩৬টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নমালার সাহায্যে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মাসিক আয়, ব্যয়, উৎপাদন, বিক্রয়, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমব্যয়, উপরি-খরচ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের প্রতিটি তাঁতশিল্পে সুতি শাড়ি, সফ্‌ট সিল্ক, তসর, জামদানি, গ্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাড়ি কাপড় উৎপাদিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে শুধুমাত্র সফ্‌ট সিল্ক শাড়ির উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন উপাদান, ব্যয় নির্ধারণে উপাদান ব্যয়গুলোর প্রভাব, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বিক্রয় এবং উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ১টি চিত্র এবং ১০টি সারণির মাধ্যমে প্রবন্ধের পরিশিষ্টে উপস্থাপন করা হলো। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সংখ্যাসহ চিত্র এবং সারণি উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্য নির্ধারকসমূহ

ক) উৎপাদনের উপাদান ব্যয়সমূহ

১। কাঁচামাল: শাড়ি উৎপাদনের প্রধান মৌলিক উপাদান হলো সুতা। মোট উৎপাদন ব্যয়ের প্রায় ৩২% ব্যয় হয় সুতা ক্রয়ে। এই সুতা ভারত ও চীন থেকে আমদানি করতে হয়। সিল্ক সুতা আসে চীন থেকে এবং সুতি কাপড়ের সুতা আসে ভারত থেকে। মানসম্পন্ন সুতা দেশেও তৈরি হয়। দেশীয় মানসম্পন্ন সুতার মূল্য বেশি

হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ চীন ও ভারত থেকে সুতা আমদানি করে থাকে। খোলা বাজারে সুতার দামের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। প্রতি কেজি সিল্ক সুতা প্রায় ২৬০০ টাকায় ক্রয় করতে হয় । সুতা আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি আরোপ করায় সুতার প্রকৃত ক্রয়মূল্য বেশি হয়। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও বেশি হয়। ১টি শাড়ি উৎপাদনে কাঁচামাল বাবদ ব্যয় হয় ৩৬০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। বেশি পরিমাণ সুতা একসাথে ক্রয় করলে শাড়ি প্রতি সুতা ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। পাথরাইলে প্রায় ৮০% তাঁতি ঢাকা থেকে এজেন্টের মাধ্যমে সুতা ক্রয় করে। ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে তাঁদেরকে সুতা ক্রয় করতে হয়। প্রান্তিক তাঁতিরা স্থানীয় বাজার থেকেও চড়া দামে সুতা ক্রয় করে থাকে।

২। **শ্রম ব্যয়:** উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শ্রম। এখানে অতি সহজেই দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায় এবং প্রতি শাড়ির শ্রম ব্যয় হয় ২৫০ টাকা থেকে ২৬৫ টাকা । অর্থাৎ গড়ে প্রতি শাড়ির শ্রম ব্যয় হয় ২৫২ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। ২১টি তাঁতশিল্পে ১১৬ জন দক্ষ শ্রমিক ৬২ জন মাঝারি দক্ষ শ্রমিক এবং ১৫ জন অদক্ষ শ্রমিক কাজ করে (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। তাঁদের মধ্যে ১৮৬ জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। Piece rate system-এ শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষে প্রস্তুতকৃত পণ্য তাঁতিদেরকে বুঝিয়ে দিয়েই শ্রমিক তাঁর মজুরি গ্রহণ করে। তাছাড়া বছর শেষে মুনাফা এবং বাৎসরিক উৎপাদিত শাড়ির সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রমিকগণ মোটা অঙ্কের টাকা বোনাস হিসাবে পেয়ে থাকে।

৩। **উপরি-খরচ:** কাঁচামাল আন্তঃপরিবহন খরচ, যাতায়াত খরচ, সুতার রং করা খরচ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য শাড়ি প্রতি ব্যয় হয় গড়ে প্রায় ৬৮ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। শাড়ি প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা পর্যন্ত উপরি-ব্যয় হয়ে থাকে।

৪। **বিক্রয় খরচ:** উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে টাঙ্গাইল ও ঢাকা যেতে হয়। বিক্রয়ের জন্য যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতি শাড়িতে গড়ে ১০ টাকা ব্যয় হয়ে থাকে (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।

খ। উৎপাদন প্রক্রিয়া:

সফ্‌ট সিল্ক শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়া

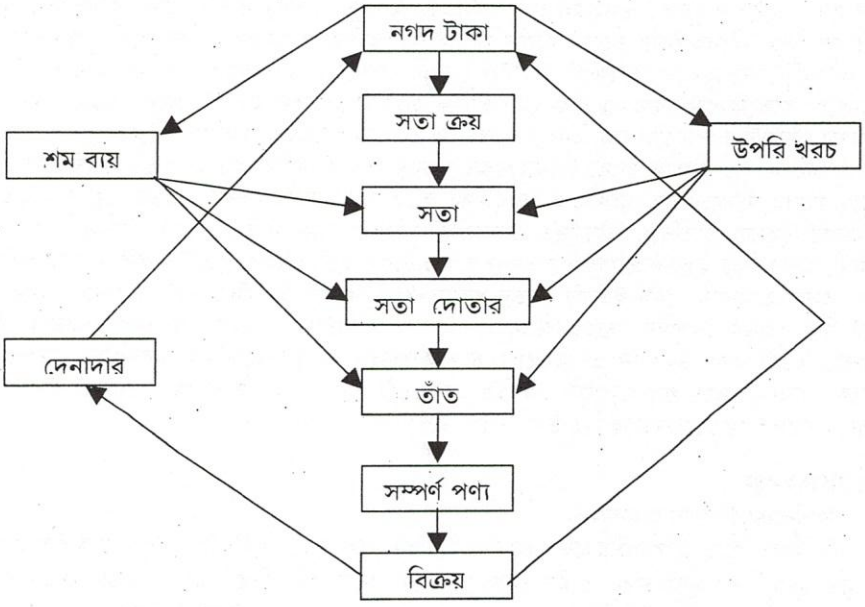

গ) প্রাসঙ্গিক নির্ধারকসমূহ

- **বিনিয়োগকৃত মূলধন:** হস্তচালিত তাঁতশিল্পে স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন দুইটিরই প্রয়োজন রয়েছে। তবে স্থায়ী মূলধনের চেয়ে চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয় বেশি। কাঁচামাল ক্রয়, মজুত, বাকিতে বিক্রয়, শ্রম ব্যয়, উপরি-খরচ, বিক্রয় খরচ ইত্যাদি বাবদ প্রচুর চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয়। তাঁত (স্থায়ী সম্পত্তি) ক্রয় বাবদ স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। আলোচ্য সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, উদ্যোক্তাদের সর্বনিম্ন মূলধন হচ্ছে ৮০,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ মূলধন হচ্ছে ৫,০০,০০০ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। গড়ে একজন উদ্যোক্তার চলতি মূলধনের পরিমাণ ১,০৮,৪২৮ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১,০৭,৭৬২ টাকা (সারণি ১০ দ্রষ্টব্য)। ২১ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ২% থেকে ৩% স্বল্প-মেয়াদি ঋণ করা মূলধন ব্যবহার করে। কৃষি ব্যাংক দেলদুয়ার উপজেলা সদর শাখা বা টাঙ্গাইল জেলা সদর শাখা ১২% সুদে শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বল্প-মেয়াদি ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে। কৃষি ব্যাংকের স্বল্প-মেয়াদি ঋণ ব্যতীত উদ্যোক্তাগণ ধার করা মূলধন ব্যবহার করে না। অর্থাৎ শিল্পে ব্যবহৃত মূলধন প্রায় সবটুকুই উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব মূলধন বলা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি মূলধনের ব্যয় এবং উদ্যোক্তার নিজস্ব শ্রমব্যয় (আরোপিত ব্যয়) বিক্রিত পণ্য ব্যয়ের সাথে যোগ করা হয় তাহলে মোট ব্যয় আরো বাড়বে। তবে শিল্প উদ্যোক্তাগণের লেনদেনের সুবিধার্থে পাথরাইল গ্রামে দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে।

- **তাঁতের সংখ্যা:** তাঁতশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ বাড়িতে এক বা একাধিক ঘরে পণ্য তৈরি করছেন। প্রতিটি তাঁত মেশিন গড়ে প্রায় ৬ বর্গফুট জায়গা দখল করে। ২১ জন তাঁতির ১৯১টি তাঁত মেশিনে কাপড় উৎপাদিত হয় (সারণি ৫ দ্রষ্টব্য)। প্রতিটি তাঁতের সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য ১৫,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ক্রয়মূল্য ১০,০০০ টাকা । প্রতিটি তাঁতে একজন মাত্র শ্রমিক কাজ করে এবং ১টি কাপড় উৎপাদন করতে ২/৩ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়। তাঁত মেশিনগুলো বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে চালানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবন হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সময় হ্রাস পাবে এবং অধিকতর মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি হবে।
- **স্থায়ী সম্পত্তির অবচয়:** স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করার কোনো পদ্ধতি বা কৌশল তাঁতিদের জানা নেই। ফলে মুনাফা নির্ধারণ করার সময় অবচয় হিসাবকে বিবেচনা করা হয় না এবং মেশিনের ক্রয়মূল্য থেকেও অবচয় বাবদ কোন অর্থ বাদ দিয়ে সম্পত্তির হিসাব করা হয় না। তাই উৎপাদন ব্যয়ের সাথে অবচয় বাবদ কোনো ব্যয় যোগ করা হয় না। অবচয় বাবদ কোনো অর্থ মোট ব্যয়ের সাথে যোগ করলে উৎপাদন ব্যয় আরো বাড়বে।

(ঘ) ব্যয়-মুনাফা বিশ্লেষণ

- **মোট ব্যয়:** ২১টি তাঁতশিল্পে প্রতি একক শাড়ির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে লক্ষণীয় ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। একক প্রতি মোট ব্যয় হয় ৬৪২ টাকা থেকে ৯৮৫ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। শাড়ির গুণগত মান এবং কাঁচামাল ক্রয়ে মূল্য বৈষম্য থাকায় মোট ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যা সংশ্লেষাঙ্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মোট ব্যয়, বিক্রয় ও মুনাফা সম্পর্ক দেখানো হয়েছে (সারণি ৮ দ্রষ্টব্য)।
- **মোট বিক্রয়:** শিল্প ইউনিটে প্রস্তুতকৃত পণ্য স্থানীয় বাজারে, টাঙ্গাইল জেলা শহরে এবং ঢাকা শহরে বিক্রয় হয়ে থাকে। পণ্যের গুণগত মানের ভিন্নতা, উপাদান ব্যয়ের বাজার মূল্যের ওঠা-নামা এবং বিক্রয় শর্তের কারণে বিক্রয় মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। ফলে প্রতিটি শাড়ির সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ৯৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ১৫০০ টাকা (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)।
- **নিট মুনাফা:** ২১টি তাঁতশিল্পের মধ্যে কোনোটিই অলাভজনক নয়। প্রতিটি তাঁতশিল্পেরই মুনাফা অর্জন ক্ষমতা রয়েছে। তবে শিল্পগুলোর মধ্যে মুনাফা অর্জন ক্ষমতার তারতম্য অনেক বেশি (সারণি ৯ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ বিনিয়োজিত মূলধন যাঁদের বেশি, নিট মুনাফাও তাঁদের বেশি। ফলে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সঙ্গে নিট মুনাফার একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। সারণি ১ -এ দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণার আওতাভুক্ত ২১টি তাঁতশিল্পে শাড়ি প্রতি গড় মুনাফা হচ্ছে ৩৫০.৯৫ টাকা। পরিমিত ব্যবধানের (২৬০.৭৭) সাহায্যে দেখা যাচ্ছে যে মুনাফার

ওঠানামার প্রবণতা খুবই বেশি। সি.ভি. বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, মুনাফা অর্জনের ব্যাপ্তিও অনেক বেশি (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

• **ব্যবস্থাপনা:** উদ্যোক্তা নিজেই শিল্পে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। সুতা ক্রয় থেকে শুরু করে শাড়ি বিক্রয় করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজের ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তাই করে থাকেন। কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিক ছাঁটাই, উৎপাদনের কৌশল নির্ণয়, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো উদ্যোক্তার একক সিদ্ধান্তেই হয়ে থাকে। প্রায় ৮০% উদ্যোক্তার স্ত্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে উদ্যোক্তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)।

• **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** উদ্যোক্তাই শিল্প পরিচালনার জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কখন সুতা ক্রয় করতে হবে, কত পরিমাণ সুতা ক্রয় করতে হবে, কিভাবে সুতা ক্রয় করতে হবে, কখন, কোথায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে হবে, বিক্রয় নীতি কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

• **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল:** ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কৌশলের সাথে কোনো উদ্যোক্তাই পরিচিত নন। উৎপাদন ব্যয় হিসাবের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন ধারণা তাঁদের মধ্যে নেই। অথচ প্রতিটি কারখানাতেই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কৌশল চালু করা যায় এবং তাতে ব্যয় সাশ্রয় হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

• **ব্যয় নির্ণয় পদ্ধতি:** উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যয় নির্ণয় করা যায়, তা তাঁদের জানা নেই। তাঁরা একটি টালি খাতার সাহায্যে শিল্পের যাবতীয় হিসাব লিখে রাখে এবং সেই হিসাব থেকেই উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয় সহ যাবতীয় হিসাব লিখে রাখে। বছর শেষে সেই টালি খাতার সাহায্যে ব্যয় নির্ণয় করে মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। এই মুনাফার একটি সুনির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকগণ বোনাস হিসেবে পেয়ে থাকে। অথচ ন্যূনতম ব্যয় তালিকার মাধ্যমে উৎপদান ব্যয় নির্ণয় করা যায়, তা তাঁদের জানা নেই।

• **হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি:** হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো উদ্যোক্তাই অবহিত নয়। ফলে হিসাবের প্রাথমিক বহি, বিভিন্ন খতিয়ান হিসাব, চূড়ান্ত হিসাব, স্থিতিপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা নেই। কাঁচামাল ক্রয়, ব্যবহার, অব্যবহৃত কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য, বিক্রয় এবং অবিক্রিত পণ্যের হিসাবে পৃথক খতিয়ানে না রেখে এক তরফা পদ্ধতিতে টালি খাতায় হিসাব সংরক্ষণ করে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহারও তাঁদের জানা নেই।

• **মজুতকরণ:** উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতেই সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু বছর শেষে মজুত পণ্য মূল্যায়নের সঠিক কোনো পদ্ধতি তাঁদের জানা নেই। ফলে বেশি সময় উৎপাদিত পণ্য মজুত থাকলে মূলধন ব্যয় এবং ঝুঁকি দুইটিই বেড়ে যায়, তাঁরা এ ব্যাপারেও সচেতন নয়।

• **কাঁচামাল মজুতকরণ:** শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অর্থাৎ সুতা মজুত করা হয়। যাঁদের চলতি মূলধন অপেক্ষকৃত কম তাঁরা মজুত বেশি করতে পারে না। ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বার বার সুতা ক্রয় করতে হয়। তাই Carrying Cost এবং Ordering Cost বেশি হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতার উপর ঋণাত্মক প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ পণ্যের উৎপাদন বেড়ে যায় এবং মুনাফা হ্রাস পায়।

• **বিপণন কৌশল:** উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। অথচ বর্তমান বিশ্বে বিক্রয়ের চালিকা শক্তি হলো বিজ্ঞাপন। তাই বিক্রয় সম্প্রসারণের জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময়ে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করতে হয়। বাকিতে বিক্রয় করলে বিক্রয়মূল্য নগদে বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। কিন্তু এতে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণ অর্থ দীর্ঘ সময় পণ্য ক্রেতার নিকট আটকা পড়ে থাকে এবং কু-ঋণেরও সৃষ্টি হয়। কু-ঋণের কোন হিসাব উদ্যোক্তাগণ সংরক্ষণ করে না। বাকিতে বিক্রয়ের ফলে অনেক সময় কার্যকর মূলধন প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং উদ্যোক্তার তারল্য সংকট দেখা দেয়।

• **প্রশিক্ষণ:** উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। উত্তরাধিকারসূত্রে উদ্যোক্তা ও শ্রমিক শিল্পের কাজে নিয়োজিত। প্রায় ৮০% উদ্যোক্তা রয়েছেন, যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি-র নিচে (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)। শ্রমিকদের প্রায় সবাই নিরক্ষর বা সাক্ষরজ্ঞান অক্ষম। ফলে নিত্য নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে পারছে না।

সুপারিশ

বিবিধ সমস্যা এবং প্রতিকূল পরিবেশে পাথরাইল গ্রামের হস্তচালিত তাঁতশিল্পগুলো উৎপাদন কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা যেতে পারে–

- দৈনিক উৎপাদন ব্যয় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা উচিত;
- ঋতুগত মূল্য ওঠা-নামার ক্ষেত্রে কাঁচামালের মজুত রাখা বাঞ্ছনীয়;
- শ্রম ব্যয় নির্ধারণের জন্য 'সময়ভিত্তিক হার' ও 'কার্যভিত্তিক হার' দুই পদ্ধতিই অবলম্বন করা যেতে পারে;
- প্রতিটি তাঁতের ক্রয়মূল্য পৃথকভাবে রাখা এবং স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় নির্ধারণ করা আবশ্যক;
- ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তাঁতশিল্পের মূলধন তহবিল বাড়ানো উচিত;
- ধারে বিক্রয় করলে যথাসময়ে বকেয়া অর্থ আদায় করা উচিত;
- শিল্পজোট গঠন করা উচিত;
- কাঁচামাল শিল্পজোটের মাধ্যমে ক্রয় করা আবশ্যক;
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখা উচিত নয় ;
- কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য মজুত রাখার জন্য বীমা ব্যবস্থা চালু করা উচিত; এবং
- যান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করা উচিত।

উপসংহার

আধুনিক ভুবনীকরণের যুগে উন্নতির দুইটি প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। প্রথমত, বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন এবং দ্বিতীয়ত, কুটির শিল্প স্থাপন। আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক দেশই এভাবে তাদের অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদ্র কুটির শিল্প রয়েছে। এ দেশের শিল্পখাতের উভয় অংশকে গতিশীল এবং সমৃদ্ধ করতে পারলে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, মূলধন কাঠামো গড়ে উঠবে, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, রপ্তানি বাড়বে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতশিল্প একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৭০% সরবরাহ করছে তাঁতশিল্প। নতুন নতুন ডিজাইনের পণ্য তৈরি হচ্ছে শিল্প ইউনিটগুলোতে। নিত্য নতুন ভোক্তার চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে পণ্য তৈরির সম্ভাবনা ও সুযোগ দুটিই তাঁতশিল্পের রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ২১টি শিল্প ইউনিটেরই মুনাফা অর্জন ক্ষমতা রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভোক্তার চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে তাঁরা পণ্য উৎপাদন করছেন এবং প্রতিনিয়ত নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছেন।

প্রতিটি শিল্প ইউনিটে মুনাফা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কোনো শিল্প ইউনিটেই উৎপাদন ব্যয় সংশ্লিষ্ট হিসাব পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ এখনো লক্ষ করা যায় না। এমনকি সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও সঠিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যয় নির্ধারণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা নেই।

তাছাড়া প্রায় প্রতিটি শিল্পোদ্যোক্তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদেরও কোনো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই । তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পোদ্যোক্তারাও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতার আলোকে উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবৈজ্ঞানিক পন্থায় সম্পাদন করছেন। তাঁতশিল্পগুলোতে পদ্ধতিগত হিসাববিজ্ঞান ও উৎপাদন ব্যয় হিসাব পদ্ধতির প্রয়োগ যেমন নেই; তেমনি নেই সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। ফলে ভোক্তার চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে উৎপাদন ব্যবস্থায় তেমন কোনো বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়নি।

অর্থাৎ এঁরা উৎপাদন, বণ্টন, হিসাবরক্ষণ, উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় নির্ধারণ, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি গতিশীল বিষয়গুলো সনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছেন।

কোনো উৎপাদনকারী কারবারি প্রতিষ্ঠান যদি উৎপাদন পরিকল্পনা, কার্যভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ না করে তাহলে তার উন্নতির গতিধারা ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। একইভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পদ্ধতিগত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, সঠিক হিসাবরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যয় পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত তাঁতশিল্প তাঁদের উন্নয়নের গতিধারাকে সচল রাখতে পারবে না। ফলে আধুনিক বিশ্ব বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে দেশের সরকার ও শিল্প উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসা উচিত যাতে সম্ভাবনাময় এই খাতটিকে যুগোপযোগী করা যায়।

বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্পগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প, যার মাধ্যমে মোট দেশীয় রপ্তানির ৭৩.২৮% (১৯৯৯-২০০০) অর্জিত হয়। সম্প্রতি এই শিল্পও হুমকির মুখে পড়েছে। আমেরিকা থেকে কোটা ব্যবস্থা উঠে যাওয়ার ফলে ইতিমধ্যে প্রায় ১৩০০ তৈরি পোশাক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপীয় দেশসমূহ থেকে অনুরূপ আচরণের পূর্বভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। তাঁতশিল্পসহ অন্যান্য কুটির শিল্পকে ঐ সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো যায়।

উক্ত সম্ভাব্য বিকল্পের অন্যতম খাত তাঁতশিল্পকে গতিশীল করার জন্য উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ, উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং বাজার চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা দরকার। উৎপাদনকারীকে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হয়। তাই তাঁতশিল্পের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যয়ের বিভিন্ন নির্ধারকের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এ ব্যাপারে জাতীয় নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট

চিত্র ১

দণ্ড চিত্রের মাধ্যমে একক প্রতি গড় বিক্রয়মূল্য এবং উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানসমূহের একক প্রতি গড় ব্যয় প্রকাশ করা হলো:

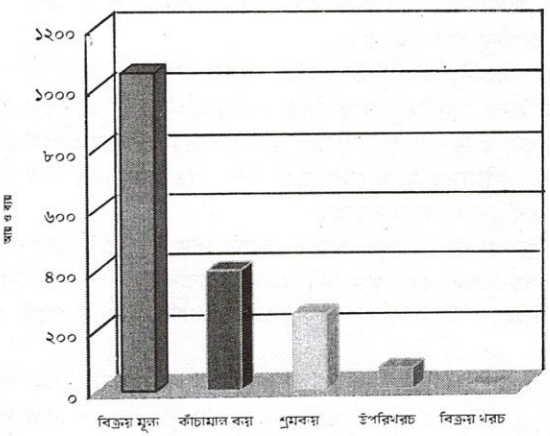

বিক্রয় ও উৎপাদন ব্যয় উপাদান

সূত্র: ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ১

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মুনাফার গড়, পরিমিত ব্যবধান এবং সি.ভি.

এনাফা (টাকা)	f	x	d =	d	Fd	Fd
৭০-২৭০	১০	১৭০	-২	৪	-২০	৪০
২৭০-৪৭০	০৮	৩৭০	-১	১	-৮	৮
৪৭০-৬৭০	০১	৫৭০	০	০	০	০
৬৭০-৮৭০	০০	৭৭০	১	১	০	০
৮৭০-১০৭০	০১	৯৭০	২	৪	২	৪
১০৭০-১২৭০	০১	১১৭০	৩	৯	৩	৯
মোট	২১	-	-	-	-২৩	৬১

$$\overline{X} = A + \frac{\sum fd}{N} \times C = 570 + \frac{-23}{21} \times 200 = 350.95$$

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{n} - \left(\frac{\sum fd}{n}\right)^2} \times c = \sqrt{\frac{61}{21} - \left(\frac{-23}{-21}\right)^2} \times 200$$

$$C.V = \frac{\delta}{\overline{X}} \times 100 = \frac{261.17}{350.95} \times 100 = 74.42\ \%$$

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ২

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শতকরা হার

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	কতকরা হার (%)
নিরক্ষও	০৩	১৪.২৯%
১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি	১০	৪৭.৬২%
৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি	০৪	১৯.০৪%
এস.এস. সি পাস	০৩	১৪.২৯%
এইচ. এস. সি পাস	০০	-
বি.এ পাস	০১	৪.৭৬%
মোট	২১	১০০%

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ

সারণি ৩

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের স্ত্রীদের পেশা ও শতকরা হার

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
গৃহিণী	০৪	২০%
তাঁতি	১৬	৮০%
মোট	২০	১০০%

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ। নোটঃ একজন উদ্যোক্তা অবিবাহিত ছিলেন।

সারণি ৪

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের বয়স ও শতকরা হার

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
২০-৩০	১২	৫৭.১৫%
৩০-৪০	৬	২৮.৫৭%
৪০-৫০	১	৪.৭৬%
৫০-৬০	১	৪.৭৬%
৬০-৭০	১	৪.৭৬%
মোট	২১	১০০.০০%

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ৫

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ও শতকরা হার

তাঁতের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫	২	৯.৫২%
৫-১০	১০	৪৭.৬২%
১০-১৫	৫	২৩.৮১%
১৫-২০	৩	১৪.২৯%
২০-২৫	১	৪.৭৬%
মোট	২১	১০০.০০%

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ৬

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা ও শতকরা হার

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
মিষ্টির দোকান	১১	৫২.৩৮%
তাঁতি	০৬	২৮.৫৭%
কৃষক	০৩	১৪.২৯%
বেসরকারি চাকুরি	০১	৪.৭৬%
মোট	২১	১০০.০০%

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ৭

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের তাঁত সংখ্যা ও শতকরা হার

তাঁতের সংখ্যা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	মোট তাঁত সংখ্যা	ক্রমযোজিত তাঁত সংখ্যা
৪টি	২ জন	৮	৮
৫টি	৩ জন	১৫	২৩
৬টি	২ জন	১২	৩৫
৭টি	৪ জন	২৮	৬৩
৮টি	১ জন	৮	৭১
১০টি	৪ জন	৪০	১১১
১৪টি	১ জন	১৪	১২৫
১৫টি	২ জন	৩০	১৫৫
১৬টি	১ জন	১৬	১৭১
২০টি	১ জন	২০	১৯১

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ৯

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের মোট উৎপাদন ব্যয়, বিক্রয়, মুনাফা এবং লাভজনকতা বিবরণী

তাঁত শিল্প ইউনিট	কাঁচামাল (একক প্রতি) টাকা	শ্রম ব্যয় (একক প্রতি) টাকা	উপরি-খরচ (একক প্রতি) টাকা	কারখানা (একক প্রতি) টাকা	বিক্রয় খরচ (একক প্রতি) টাকা	মোট ব্যয় (একক প্রতি) টাকা	বিক্রয় মূল্য (একক প্রতি) টাকা	মুনাফা (একক প্রতি) টাকা	বাৎসরিক উৎপাদন (একক)	বাৎসরিক মুনাফা (টাকা)	বিনিয়োগকৃত মূলধন (টাকা)	লাভজন কতা* (অনুপাত)
০১	৬২৫/=	২৫০/=	১০০/=	৯৭৫/=	১০/=	৯৮৫/=	১,১০০/=	১১৫/=	১২৯৬	১,৪৯,০৪০/=	১,২০,০০০/=	১.২৪
০২	৩৭২/=	২৬০/=	৭০/=	৭০২/=	১০/=	৭১২/=	১,০০০/=	২৮৮/=	১৪৪০	৪,১৪,৭২০/=	২,২০,০০০/=	১.৮৯
০৩	৩১২/=	২৫০/=	৭০/=	৬৩২/=	১০/=	৬৪২/=	১,০৫০/=	৪০৮/=	১২০০	৪,৮৯,৬০০/=	৯০,০০০/=	৫.৪৪
০৪	৩৭২/=	২৫০/=	৭০/=	৬৯২/=	১০/=	৭০২/=	১,০০০/=	২৯৮/=	১২৯৬	৩,৮৬,২০৮/=	২,০০,০০০/=	১.৯৩
০৫	৩৭২/=	২৫০/=	৬০/=	৬৮২/=	১০/=	৬৯২/=	১,০০০/=	৩০৮/=	৮৪০	২,৫৮,৭২০/=	১,৩০,০০০/=	১.৯৯
০৬	৩৭২/=	২৫০/=	৭০/=	৬৯২/=	১০/=	৭০২/=	৯৫০/=	২৪৮/=	৭২০	১,৭৮,৫৬০/=	১,৫০,০০০/=	১.১৯
০৭	৩৭২/=	২৫০/=	৬০/=	৬৮২/=	১০/=	৬৯২/=	১১৫০/=	৪৯৮/=	১০২০	৪,৬৭,১৬০/=	৪,৫০,০০০/=	১.০৪
০৮	৩৭২/=	২৫০/=	৫০/=	৬৮২/=	১০/=	৬৯২/=	১,১০০/=	৪০৮/=	৭২০	২,৯৩,৭৬০/=	১,৮০,০০০/=	১.৬৩
০৯	৩৭২/=	২৫০/=	৫৫/=	৬৭৭/=	১০/=	৬৮৭/=	১,১০০/=	৪১৩/=	২৮৮০	১১,৯০,৪৪০/=	৫,০০,০০০/=	২.৩৮
১০	৩৭২/=	২৫০/=	৫০/=	৬৭২/=	১০/=	৬৯২/=	১,০০০/=	৩০৮/=	৮৪০	২,৫৮,৭২০/=	২,০০,০০০/=	১.২৯
১১	৩৭২/=	২৫০/=	৬৫/=	৬৮৭/=	১০/=	৬৯৭/=	১,০০০/=	৩০৩/=	৮৬৪	২,৫৬,৩৩৮/=	১,০০,০০০/=	২.৫৬
১২	৩৭২/=	২৫০/=	৬০/=	৬৯৭/=	১০/=	৭০৭/=	১,০০০/=	২৯৩/=	৫৭৬	১,৬৮,৭৬৮/=	১,৫০,০০০/=	১.১৩
১৩	৩৭২/=	২৫০/=	৫০/=	৬৭২/=	১০/=	৬৮২/=	১,০০০/=	৩১৮/=	১০৮০	৩,৪৩,৪৪০/=	১,৫০,০০০/=	২.২৯
১৪	৩৭২/=	২৬০/=	৭০/=	৭০২/=	১০/=	৭১২/=	১,০০০/=	২৮৮/=	২৫২	৭২,৫৭৬/=	১,৪০,০০০/=	০.৫২
১৫	৩৭২/=	২৫০/=	৬০/=	৬৮২/=	১০/=	৬৯২/=	১,১০০/=	৪০৮/=	১০৮০	৪,৪০,৬৪০/=	৪,০০,০০০/=	১.১০
১৬	৩৬০/=	২৫০/=	৭০/=	৬৮০/=	১০/=	৬৯০/=	১,০০০/=	৩১০/=	১২০০	৩,৭২,০০০/=	১,৫০,০০০/=	২.৪৮
১৭	৩৭২/=	২৫০/=	৭০/=	৬৯২/=	১০/=	৭০২/=	১,০০০/=	২৯৮/=	৬০০	১,৭৮,১০০/=	৮০,০০০/=	২.২৪
১৮	৩৭২/=	২৫০/=	৬০/=	৬৮২/=	১০/=	৬৯২/=	১,০০০/=	৩০৮/=	১২৯৬	৩,৯৯,৭৬৮/=	১,৩০,০০০/=	৩.০৮
১৯	৩৬০/=	২৫০/=	১০০/=	৭১০/=	১০/=	৭২০/=	১,১০০/=	৩৮০/=	৭৮০	২,৯৬,৪০০/=	২,০০,০০০/=	১.৪৮
২০	৫১০/=	২৫০/=	১০০/=	৮৬০/=	১০/=	৮৭০/=	১,২০০/=	৩৩০/=	৭২০	২,৩৭,৬০০/=	৫,০০,০০০/=	০.৪৮
২১	৬৫০/=	২৫০/=	৬০/=	৯৬০/=	১০/=	৯৭০/=	১,১৫০/=	১৮০/=	১৩৪৪	২,৪১,৯২০/=	৩,০০,০০০/=	০.৮১

- লাভজনকতা = বাৎসরিক মুনাফা ÷ বিনিয়োগকৃত মূলধন

উৎস : ক্ষেত্র জরিপ।

সারণি ৮

মোট ব্যয়, বিক্রয় মূল্য এবং মুনাফার মধ্যে সংশ্লেষাংক নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো-

চলক	সংশ্লেষাঙ্ক
মোট ব্যয়ের সাথে বিক্রয় মূল্যের	০.৫৪২**
মোট ব্যয়ের সাথে মুনাফার	-০.৬৭২**
বিক্রয় মূল্যের সাথে মুনাফার	০.২৫৩

সূত্রঃ ক্ষেত্র জরিপ।** দ্বারা ১%-এ তাৎপর্যপূর্ণ বোঝানো হয়েছে।

সারণি ১০

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের নাম,তাঁত সংখ্যা ও তাঁদের বিনিয়োগকৃত মূলধন বিবরণী

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তাদের নাম	চলতি মূলধন	স্থায়ি মূলধন	মোট বিনিয়োগকৃত মূলধন
০১	মি. রঞ্জিত ঘোষ	৪০,০০০/=	৮০,০০০/=	১,২০,০০০/=
০২	মি. অধীর ঘোষ	১,৪০,০০০/=	৮০,০০০/=	২,২০,০০০/=
০৩	মি. মহাদেব বসাক	৩০,০০০/=	৬০,০০০/=	৯০,০০০/=
০৪	মি. আশিস কুমার ঘোষ	১,১২,০০০/=	৮৮,০০০/=	২,০০,০০০/=
০৫	মি. আনন্দ মোহন ঘোষ	৬০,০০০/=	৭০,০০০/=	১,৩০,০০০/=
০৬	মি. দিলীপ ঘোষ	৮০,০০০/=	৭০,০০০/=	১,৫০,০০০/=
০৭	মি. সুজন বসাক	২,১০,০০০/=	২,৪০,০০০/=	৪,৫০,০০০/=
০৮	মি. অনিল ঘোষ	৯০,০০০/=	৯০,০০০/=	১,৮০,০০০/=
০৯	মি. দুলাল বসাক	২,৭৫,০০০/=	২,২৫,০০০/=	৫,০০,০০০/=
১০	মি. সুশীল ঘোষ	১,১০,০০০/=	৯০,০০০/=	২,০০,০০০/=
১১	মি. মনি চন্দ্র	৪০,০০০/=	৬০,০০০/=	১,০০,০০০/=
১২	মি. অমল বসাক	৯৮,০০০/=	৫২,০০০/=	১,৫০,০০০/=
১৩	মি. নকুল ঘোষ	৬৬,০০০/=	৮৪,০০০/=	১,৫০,০০০/=
১৪	মি. রঞ্জিৎ কুমার ঘোষ	৬৩,০০০/=	৭৭,০০০/=	১,৪০,০০০/=
১৫	মি. প্রাণ গোপাল ঘোষ	১,৭৫,০০০/=	২,২৫,০০০/=	৪,০০,০০০/=
১৬	মি. বিশ্বজিত বসাক	৫০,০০০/=	১,০০,০০০/=	১,৫০,০০০/=
১৭	মি. নগেন ঘোষ	৩২,০০০/=	৪৮,০০০/=	৮০,০০০/=
১৮	মি. সুরেশ ঘোষ	৫০,০০০/=	৮০,০০০/=	১,৩০,০০০/=
১৯	মি. তাপস বসাক	১,১০,০০০/=	৯০,০০০/=	২,০০,০০০/=
২০	মি. অখিল বসাক	৩,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৫,০০,০০০/=
২১	মি. ভরত চন্দ্র ঘোষ	১,৪৬,০০০/=	১,৫৪,০০০/=	৩,০০,০০০/=
	মোট	২২,৭৭,০০০/=	২২,৬৩,০০০/=	৪৫,৪০,০০০/=
	গড়	১,০৮,৪২৮/=	১,০৭,৭৬২/=	২,১৬,১৯০/=

গ্রন্থপঞ্জি

অর্থমন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০১* (ঢাকা: অর্থ বিভাগ) জুন ২০০১।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৯৭ - ২০০২* (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন) মার্চ ১৯৯৮।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, *চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৯০ - ১৯৯৫* (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন) মার্চ ১৯৯১।

Bhattacharyya, S.K. and S.K. Roy. *Management Accounting: Incorporating Accounting Theory*. New Delhi: S.Chand and Co. Ltd., 1999.

Jain, S.P. and K.L. Narang. *Advanced Cost Accounting*. 2nd. ed. New Delhi: Kalyani Publisher, 1982.

Kaplan, R.S. *Advanced Management Accounting*. London: Prentice-Hall International Inc., 1982.

Lyngar, S.P. *Cost Accounting*. 6th ed. New Delhi: Sultan Chand and sons, 1994.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ১০ম সংখ্যা ১৪০৯

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

খবির উদ্দীন আহম্মদ*

Abstract: The article deals with the measures taken to protect women and children from various offences in Bangladesh. The prevalent law to this effect is *nari o shishu nirjatan daman ain, 2000.* It contains substantive and procedural laws. Rape, causing death or grievous hurt for dowry or in committing rape, sexual harassment, kidnapping or abduction of women and children, etc. are punishable under this Act. Definition and punishment of offences as well as investigation method of accusation, trial procedure of cases and other measures along with the gradual development of the law were discussed.

ভূমিকা

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রায়ই আইন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। নতুন ব্যবস্থা প্রদান বা উন্নয়নের প্রয়োজনেই সাধারণত এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ দমন বিষয়ে প্রচলিত আইন পর্যালোচনায় এরূপ একটি উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। এ দেশে মোঘল সম্রাটের ইসলামি ফৌজদারি আইন ছিল। পরে উপমহাদেশে ব্রিটিশ আইন প্রণীত হয়েছিল। পাকিস্তানের পর বাংলাদেশের নতুন চাহিদায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুনভাবে আইন প্রণীত হয়ে আসছে। নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ দমনে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে প্রথম পৃথক একটি আইন The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, 1983 পাশ হয়। আইনের Substantive ও Adjective শাখায় ব্যবহারিক প্রয়োজনে ঐ আইনের স্থলাভিষিক্তকরণে আসে ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫। এতে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ বিচারের প্রচলিত ১৯৭৪ সালের The Special Powers Act – এর বিধানে প্রতিষ্ঠিত। স্পেশাল ট্রাইবুনালের পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উত্তরোত্তর উন্নয়নের লক্ষে বাংলাদেশে ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ পাশ করা হয়। রহিত হয় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন। পূর্বের আদালতের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। এভাবে বাংলাদেশে বিচারের নিয়ম ও বিচারালয়ের অবয়বের পরিবতনের ভিতর দিয়ে নারী নির্যাতন রোধে Adjective law –এর উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি Substantive Law এর উন্নয়ন সাধনে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের নতুন নতুন দিক এ আইনের আওতাভুক্ত ও বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারী নির্যাতন রোধে প্রকৃত উন্নতি হয়েছে কি না এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত আইনগুলোর একটি পর্যালোচনার জন্য এ প্রবন্ধ। অপরাধ ও তার দণ্ড এবং আদালতের কার্যধারার বিভিন্ন দিকের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণের দিক

* ড. খবির উদ্দীন আহম্মদ, সহযোগী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নির্দেশনা এ প্রবন্ধে দেওয়া হবে এবং এ আইনের প্রভাবে নারী ও পুরুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে।

১. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের প্রকৃতি ও পরিধি

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইনের দুটি শাখা Substantive ও Adjective law –এর উন্নয়ন অব্যাহত আছে।[১] নারী ও শিশুর শরীর ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন আক্রমণকে অপরাধ গণ্য করা হয়, সেগুলোর শাস্তির বিধানসহ অপরাপর অপরাধের শাস্তি বৃদ্ধি এবং অপরাধীর বিচারের জন্য প্রচলিত কার্যধারায় প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ অব্যাহতভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী কেবল শারীরিক কারণে নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ নয়, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাপর কিছু আক্রমণ এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপও নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ হিসেবে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য এ প্রকারের অপরাধ হচ্ছে ধর্ষণ, ধর্ষণে মৃত্যু ঘটানো বা আহত করা; যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো বা আহত করা বা তার চেষ্টা করা; যৌনপীড়ন, যৌন হয়রানি, অপহরণ ও পাচার। এ প্রকারের নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। এ আইনে নারী অর্থ যে কোনো বয়সের নারী[২] এবং শিশু অর্থ অনধিক চৌদ্দ বৎসর বয়সের কোনো ব্যক্তি।[৩] প্রত্যেক জেলায় জেলা ও দায়রা জজ সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনালে এ অপরাধের বিচার পরিচালিত হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ ও তার দণ্ড; এবং তার বিচার সম্পর্কিত নিয়মসহ অপরাপর বিষয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর বিভিন্ন বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৪] বিচার পরিচালনা বা দণ্ড কার্যকরণে এ আইনের অপূর্ণতা ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিদ্বারা পূরণ হয়ে আসছে।[৫]

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিকাশ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য বাংলাদেশে বরাবরই ফৌজদারি আইন প্রচলিত আছে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানে প্রতিষ্ঠিত দেশের দায়রা জজ আদালত ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হতো। নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত চিহ্নিত অপরাধ ১৮৬০ সালে দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিষয়ক আইনের দুই শাখা Substantive ও Adjective Law –এ সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে পরিবর্তন সূচিত হয়। নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য Adjective Law হিসেবে The Special Powers Act, 1974[৬] –কে গ্রহণ করার পাশাপাশি নিবর্তনমূলক শাস্তির বিধান প্রদানে Substantive Law হিসেবে The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, 1983[৭] –কে কার্যকরতা দেওয়া হয়। এ Ordinance –এর মাধ্যমে দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার ধর্ষণ মামলার বিচার The Special Powers Act, 1974 –এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত Special Tribunal –এ ন্যস্ত করা হয়; এছাড়া ধর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরাধসহ কতিপয় অপরাধের বিচার The Cruelty to Women Ordinance –এর মাধ্যমে ঐ একই Tribunal –এ ন্যস্ত করা হয়। নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য ফৌজদারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ। নারীর সাথে শিশুর জন্যও ১৯৯৫ সালে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এজন্য পাশ হয় ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫। এ আইন নারী ও শিশুর বিরুদ্ধের বিভিন্ন আক্রমণকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং অপরাধের বিচারের জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করে। নারী ও শিশুর শরীর ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ দমনের জন্য ২০০০ সালে নতুন একটি আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন পাশ হয়।[৮] নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রণীত এ আইনগুলোর Substantive Law অর্থাৎ অপরাধ ও তার দণ্ড বিষয়ক বিধান এবং Adjective Law অর্থাৎ বিচার সম্পর্কিত নিয়ম বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচিত হলো:

২.১. নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ ও তার দণ্ড

নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক ফৌজদারি আইনের Substantive Law অর্থাৎ অধিকার আইন হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ ও তার দণ্ড বিষয়ক বিধি-বিধান।

নারী ও শিশুর শরীর ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সাধারণত যে আক্রমণগুলো পরিচালিত হয় বা হতে পারে তার প্রায় সবগুলোই ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অপরাধযোগ্য হয়েছে। এ আইনে বিভিন্ন মাত্রায় এ অপরাধগুলোকে শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে। এ অপরাধগুলোর কিছু কেবল নারীর বিরুদ্ধে এবং অপরগুলো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধে সংঘটিত হতে পারে। নারীর বিরুদ্ধের অপরধগুলো হচ্ছে ধর্ষণ, যৌনপীড়ন, যৌন হয়রানি ও যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধ। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হতে পারে, পাচার, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধ। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক ঐ অপরাধগুলোর দণ্ড বিভিন্ন প্রকারের। যথা: মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ১০-২০ বৎসর, ৭-১৪ বৎসর এবং ৩-৭ বৎসর কারাদণ্ড বা সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। বিভিন্ন অপরাধে বিকল্প দণ্ডের বিধান আছে। অর্থদণ্ডের সাথে অন্য যে কোনো একটি দণ্ড ছাড়াও কোনো কোনো অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের সাথে অর্থদণ্ড এবং বিকল্প মেয়াদি কারাদণ্ডের বিধান আছে। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ ও তার দণ্ড বিষয়ক নিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলো:

২.১.১. ধর্ষণ

কেবলমাত্র ধর্ষণ দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত ছিল। ১৯৮৩ সালে The Cruelty to Women Ordirance দ্বারা ঐ ধর্ষণসহ ধর্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপরাপর অপরাধ Special Powers Act –এর অধীনে চলে আসে। এতে নতুন মাত্রায় ধর্ষণের সংজ্ঞাদানসহ তার দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রণীত আইনের মাধ্যমে। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধিতে ধর্ষণকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

> A man is said to commit "rape" who, except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions:
> **First**. – Against her will
> **Secondly**. – Without her consent
> **Thirdly**. – With her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death, or of hurt.
> **Fourthly**. – With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.
> **Fifthly**. – With or without her consent, when she is under fourteen years of age.
> **Explanation**. – Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.
> **Exception**. – Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under, thirteen years of age is not rape.[৯]

১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে নিম্নরূপে ধর্ষণকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

> ধর্ষণ শব্দটি Penal code এর section 375 এ উল্লেখিত rape শব্দটির ন্যায় একই অর্থ বহন করবে।
>
> তবে শর্ত থাকে যে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত section 375 –এর পঞ্চম উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত fourteen শব্দটির পরিবর্তে, এবং "Exception" শিরোনাম বিশিষ্ট উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত thirteen শব্দটির পরিবর্তে, উভয় ক্ষেত্রে sixteen শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।[১০]

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ধর্ষণ পুনরায় সংজ্ঞায়িত হয়। এতে বলা হয়েছে ধর্ষণ অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে Penal Code 1860 Act XLV of 1860 এর Section 375–এ সংজ্ঞায়িত rape।[১১] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ –এর ধারা ৯ ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি

বিষয়ক। এখানে ধর্ষণ বিষয়ক একটি ব্যাখ্যা ও ধর্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধ ও সেগুলোর শাস্তি বর্ণিত আছে। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ:

> ব্যাখ্যা – যদি কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের নারীর সাথে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোনো নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।[১২]

ধর্ষণের সংজ্ঞায় বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক সহবাসও তাতে ধর্ষণ হতে পারে। দণ্ডবিধি অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সাথে সহবাসও ধর্ষণ ও শাস্তিযোগ্য; ১৯৯৫ সালের আইনের সংজ্ঞায় বয়সের পরিবর্তন আনায় ১৬ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সাথে সহবাসও ধর্ষণ; ২০০০ সালের আইনে ১৪ বছরের কম বয়সের স্ত্রীর সাথে সহবাস ধর্ষণ হিসেবে গণ্য।

ধর্ষণ ও ধর্ষণজনিত অপরাপর অপরাধের শাস্তির বিষয় নিম্নে আলোচিত হলো:

দণ্ডবিধি অনুযায়ী এরূপ ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক দশ বছর কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ড। ধর্ষিতা নিজের স্ত্রী এবং তার বয়স ১২ বছরের নীচে না হলে তার শাস্তি অনধিক দুই বছর কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড।[১৩]

The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, 1983 অনুযায়ী ধর্ষণে বা ধর্ষণের চেষ্টায় মৃত্যু বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।[১৪] ধর্ষণে বা ধর্ষণের চেষ্টায় মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টায় বা গুরুতর জখমের চেষ্টাজনিত অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা তদনধিক ১৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।[১৫] ধর্ষণ সম্পর্কিত নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধ ও তার শাস্তি বিষয়ক বিধান নিম্নরূপ:

ধর্ষণ ও তার শাস্তি

(১) যদি কোনো ব্যক্তি কোনো শিশু অথবা নারীকে ধর্ষণ করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণ করে কোনো শিশু অথবা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোনো শিশুকে বা নারীকে ধর্ষণ করেন তা হলে ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

(৪) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান তা হলে ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।[১৬]

ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণ করে কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটাতে বা আহত করতে চেষ্টা করেন তা হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।[১৭]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯ ধারায় বর্ণিত শাস্তি নিম্নরূপ:

ধর্ষণ, ধর্ষণ জনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির দণ্ড:

(১) ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[১৮]

(২) ধর্ষণ বা ধর্ষণ পরবর্তী কার্যকলাপে মৃত্যুর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।[১৯]

(৩) দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ফলে মৃত্যুর শাস্তি প্রত্যেকের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।[২০]

(৪) ধর্ষণে মৃত্যু ঘটানো বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[২১]
(৫) ধর্ষণের চেষ্টার শাস্তি ৫-১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[২২]

ধর্ষণ কেবল সতীত্বের বিরুদ্ধেই নয় সমভাবে শরীর ও জীবনের বিরুদ্ধেও পরিচালিত আক্রমণ। বাংলাদেশের হাল নাগাদ ধর্ষণের সমন্বিত সংজ্ঞা বিবাহ বন্ধন ব্যতীত বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের যৌন সঙ্গমকেই শর্ত সাপেক্ষে অপরাধমূলক অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রে নারীর বয়সের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অবশ্য বৈবাহিক বন্ধনও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২.১.২. ধর্ষণ-সন্তান সম্পর্কিত ব্যবস্থা

ধর্ষণ মূলত বিবাহ বহির্ভূত একটি পূর্ণ বা অপূর্ণ যৌন মিলন। ফলে ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে। ধর্ষণকারীর সংখ্যা একাধিক হতে পারে। তাদেরকে চিহ্নিত করাও যেতে পারে।
সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণে এরূপ চিহ্নিতকরণ বিশেষ সহায়ক। কিন্তু ঐরূপ পিতৃত্ব নির্ধারণ দ্বারা কোনো ব্যক্তির উত্তরাধিকারী করার কোনো বিধান এখনও ব্যক্তিগত আইনে সন্নিবেশিত হয়নি। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশুর ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত বিধান প্রণীত হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী ধর্ষণকারী কর্তৃক (১) সন্তান পঙ্গু না হলে (ক) পুত্র
সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর এবং (খ) কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং (২) পঙ্গু সন্তান তার ভরণ-পোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত, ভরণ-পোষণ বহনের দায়িত্ব পালন করতে হবে।[২৩]

২.১.৩. যৌন পীড়ন ও যৌন হয়রানি

পীড়ন ও হয়রানের শিকার বরাবরই নিরীহ মানুষ। নারী ও শিশু এরই এক অংশ। যৌন কামনার পরিতৃপ্তিতে এদের উপকরণ হিসেবে গণ্য করা পুরাতন নয়। মানুষের যৌন আকাঙ্খা/কামনার উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌন পীড়ন ও যৌন হয়রানিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। এ অপরাধে পুরুষের অবৈধভাবে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য থাকে। স্পর্শ বা স্পর্শ ছাড়া এ প্রকারের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এ সম্পর্কিত আইন নিম্নে আলোচিত হলো:

(১) **যৌন পীড়ন:** সংজ্ঞা হিসেবে যৌন পীড়ন হচ্ছে "কোনো পুরুষ কর্তৃক অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করা।[২৪] এর শাস্তি ৩-১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[২৫]

(২) **যৌন হয়রানি:** কোনো পুরুষ কর্তৃক অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করা, বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা যৌন হয়রানি।[২৬] যৌন হয়রানির প্রধান উপাদান শ্লীলতাহানি ও অশোভন অঙ্গভঙ্গি করা। এগুলো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অভদ্র, অশিষ্ট বা কুরুচিপূর্ণ আচরণ শ্লীলতাহানির জন্য যথেষ্ট।[২৭] অশোভনের অর্থ অসুন্দর, কুৎসিত, অনুচিত বা বে-মানান।[২৮] এর শাস্তি ২-৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[২৯]

২.১.৪. যৌতুক

বিবাহের কনে বা কনে পক্ষের কোনো ব্যক্তির নিকট যৌতুক দাবি এবং তা আদায়ের জন্য নির্যাতন এবং তার ফলাফলে মৃত্যু বা সরাসরি হত্যা করা এ উপমহাদেশের একটি সাধারণ ঘটনা। এ কারণে যৌতুক নিষিদ্ধকরণে এ উপমহাদেশের ভারত[৩০] ও পাকিস্তানে[৩১] পৃথক পৃথক আইন চালু আছে। বাংলাদেশেও যৌতুক নিষিদ্ধকরণে The Dowry Prohibition Act, 1980 প্রণীত হয়েছে।[৩২] ঐ আইনে যৌতুক দাবিসহ যৌতুক দেওয়া নেওয়া অপরাধ। ঐ আইনের পাশাপাশি বর্তমান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ যৌতুক বিষয়ক কিছু গুরুতর অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে করেছে। এ আইনের আওতাভুক্ত অপরাধ হলো যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা বা আহত করা বা আহত করার চেষ্টা। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম The Dowry Prohibition Act, 1980 যৌতুকের একটি আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

যৌতুক অর্থ এ আইনের বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে-

(১) বিবাহের কোনো এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে অথবা

(২) বিবাহের কোনো এক পক্ষের পিতামাতা বা অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের অপর পক্ষকে বিবাহের সময়ে বা বিবাহের আগে বা পরে কোনো এক সময়ে কোনো সম্পত্তি বা বিষয় সামগ্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদান বা প্রদানের সম্মতি বুঝায়। তবে মুসলিম পারসোনাল ল (শরিয়ত) প্রযোজ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মোহর বা দেনমোহর বা মোহরানা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা -সন্দেহ দূর করার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বিবাহের সময়ে বিবাহের পক্ষ ব্যতীত অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের কোনো পক্ষকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত অনধিক পাঁচশত টাকা মূল্যের সামগ্রী এ ধারার অর্থে যৌতুক অনুমিত হবে না যদি না তা পক্ষদের বিবাহের প্রতিদান হিসেবে দেওয়া হয়।[৩৩]

উপর্যুক্ত আইনের উপস্থিতিতেই The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983 পাস করা হয়। তাতে যৌতুক বিষয়ক গুরুতর অপরাধের নিবর্তনমূলক শাস্তির বিধান দেয়া হয় । ঐ আইনে যৌতুকের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল। সেটাই ঐ আইনের ধর্তব্য অপরাধের সংজ্ঞা। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ:

Explanation – In this section 'dowry' means any Property or valuable security demanded from the wife or her parent, guardian or any other relation as consideration for the marriage, but does not include dower or mohr in the case a person to whom the Muslim Personal Law (Shariat) applies.[৩৪]

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ The Dowry Prohibition Act, 1980-এর সংজ্ঞা গ্রহণ করে। যৌতুকের জন্য হত্যা বা গুরুতর জখম বা হত্যার চেষ্টা বা গুরুতর জখমের চেষ্টা করার জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের শাস্তির বিধান করা হয়েছিল ঐ Cruelty to the Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983-এর ৬ ধারায়। তবে নির্দিষ্ট অপরাধের নির্ধারিত দণ্ডের বিধান অস্পষ্ট ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫-এ অস্পষ্টতা দূর করে। এ আইনের ১০ ধারা যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ও মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা, এবং ১১ ধারা যৌতুকের জন্য গুরুতর আহত করা বিষয়ক। এখানে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য দণ্ড নির্ধারিত ছিল। তাতে ছিল মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ড।[৩৫] মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।[৩৬] গুরুতর জখমের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ৫-১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৩৭] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা, আহত করা ও আহত করার চেষ্টা করার অপরাধ সংক্রান্ত। এ আইনে যৌতুকের নতুন অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ:

যৌতুক অর্থ কোনো বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বা বিবাহের পণ হিসাবে, প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ, এবং উক্ত শর্ত বা পণ হিসাবে উক্ত বর বা বরের পিতা, মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কনে বা কনে পক্ষের কোনো ব্যক্তির নিকট দাবিকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।[৩৮]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আওতায় যৌতুকের জন্য কোনো নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটানো, মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা, আহত করা বা আহত করার চেষ্টা করা অপরাধ।[৩৯] যৌতুক বিষয়ে উপরোক্ত প্রকারের বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নিম্নরূপ:

যৌতুকের জন্য (১) মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪০] (২) মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪১] (৩) আহত করার শাস্তি যাবজ্জীবন সশ্রম

কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪২] (৪) আহত করার চেষ্টার শাস্তি ৫-১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪৩]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ আহত করা বা আহত করার চেষ্টার ব্যাখ্যায় নীরব। তা শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক কিনা পরিষ্কার নয়। তবে আঘাতটি শারীরিক হবে। কারণ মৃত্যু ঘটানো বা তার চেষ্টা শারীরিক আঘাত। এর পর আহত অর্থ শারীরিকভাবে আঘাত পাওয়া হয়। Ejusdem generis নীতি এরূপ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে।[৪৪] সর্বশেষ আইনে যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে আহত করা বা আহত করার চেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য করার মাধ্যমে। ১৯৯৫ সালের আইনে গুরুতর আহত করা শাস্তি যোগ্য ছিল। ঐ সময়ের ঐ অপরাধের শাস্তি অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ আহত করা বা আহত করার চেষ্টার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

২.১.৫.নারী ও শিশু পাচার, ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধ

পাচারের অর্থ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে কাউকে একস্থান থেকে অপর স্থানে সরানো।[৪৫] বিশেষভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি বা চক্র পাচারের সাথে জড়িত থাকে। এজন্য তারা নারী বা শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে অথবা বিদেশ থেকে আনয়ন করে বা বিদেশে প্রেরণ করে। রাষ্ট্রের জন্য পাচার একটি বড় সমস্যা। নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য সরকারের প্রশাসনিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনার পাশাপাশি আইনানুগ অন্যান্য পদক্ষেপের অন্যতম হচ্ছে পাচারের শিকার নারী বা শিশুকে উদ্ধার করাসহ পাচারকারীকে ফৌজদারি আইনের আওতায় নিয়ে আসা। দণ্ডবিধিতে পাচারের শাস্তি ছিল।[৪৬] কঠোর হস্তে পাচার রোধের জন্য এ সংক্রান্ত অপরাধ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৮৩ সালের Cruelty to Women Ordinance দ্বারা নারী পাচারকে বিশেষ আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে নারী পাচারসহ শিশু পাচার ১৯৯৫ সালের এ আইনের আওতায় আসে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নারী ও শিশু পাচারের শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে। এ আইন অনুযায়ী নারী পাচার হচ্ছে পতিতাবৃত্তি বা বেআইনি বা নীতিবিগর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশ হতে আনয়ন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করা অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করা বা কোনো নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে কারো দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখা।[৪৭]

উপর্যুক্ত নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০-২০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪৮]

কোনো নারীকে পতিতার বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্যভাবে হস্তান্তরের জন্য হস্তান্তরকারী এবং কোনো পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নারী ক্রয়, ভাড়া করা বা অন্য কোনভাবে দখলে নেওয়া বা জিম্মায় রাখার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০-২০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৪৯]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী শিশু পাচার হচ্ছে বেআইনি বা নীতি বিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে বিদেশ হতে আনয়ন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার অথবা ক্রয় বা বিক্রয় বা উক্তরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে কারো দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখা। এ প্রকার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৫০]

নবজাতক শিশুকে (অনূর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়স)[৫১] হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিংহোম, ক্লিনিক, ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হতে চুরির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৫২]

২.১.৬. নারী ও শিশু অপহরণ

এ দেশে অপহরণ বহু পূর্ব থেকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। দণ্ডবিধিতে তা শাস্তিযোগ্য। এর অপহরণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে কোনো স্থান থেকে গমন করার জন্য প্রতারণামূলক

উপায়ে প্রলুব্ধ করে বা জোরপূর্বক বাধ্য করে সে ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ করেছে বলে গণ্য হবে।[৫৩] অর্থাৎ জোর করে বা প্রতারণামূলকভাবে প্রলুব্ধ করে কোনো ব্যক্তিকে স্থানান্তর করাই হলো অপহরণ।[৫৪] ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে "অপহরণ অর্থ বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোনো স্থান হইতে কোনো ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা।"[৫৫]

বর্তমানে নারী ও শিশু অপহরণের বিষয়টি ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতাভুক্ত। এ আইনের নারী পাচার, ইত্যাদি বিষয়ক কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কেনো উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশু অপহরণ হলে তা অপহরণ হিসেবে শাস্তিযোগ্য।[৫৬] ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে কেবল মাত্র নারীর বিরুদ্ধে অপহরণের অপরাধ সংঘটিত হতো। এ আইনে অপহরণের উদ্দেশ্য ছিল কোনো নারীকে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোনো বেআইনি বা নীতি বিগর্হিত কাজে নিয়োজিত বা ব্যবহার করার বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে বাধ্য করার বা বলপ্রয়োগ করে বা প্রলুব্ধ করে বা ফুসলিয়ে যৌন সঙ্গম করতে বাধ্য করা।[৫৭] দণ্ডবিধিতে অপহরণের অনেক উদ্দেশ্য দেখা যায়। যেমন – খুন করা,[৫৮] গুম করা,[৫৯] বিয়ে করা।[৬০] ২০০০ সালের আইনের ৫ ধারায় এ উদ্দেশ্যগুলো অন্তর্ভুক্ত নেই। সে হিসেবে বিয়ে করা বা বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোভ দেখিয়ে কোনো নারীকে গৃহচ্যুত করা এ ধারার অপরাধ।[৬১] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০–এর ধারায় ৫ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশু অপহরনের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৬২]

২.১.৭. মুক্তিপণ

মুক্তিপণ আটকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী "আটক অর্থ কোনো ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো স্থানে আটকাইয়া রাখা।"[৬৩] এরূপ কোনো ব্যক্তিকে আটকের পর মুক্তি দানের বিনিময়ে প্রতিদান গ্রহণই মুক্তিপণ। এ প্রকারের প্রতিদান হচ্ছে আর্থিক সুবিধা বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধা। এভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০–এর সংজ্ঞানুযায়ী মুক্তিপণ পদের অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য কোনো প্রকারের সুবিধা।[৬৪] বাংলাদেশে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণত এ অপরাধ সংঘটন বেশি হতে দেখা যায়। নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ দমন আইন কেবল নারী ও শিশুর মুক্তিপণ বিষয়ক। দরিদ্র পরিবারের বিরুদ্ধে এ অপরাধ সংঘটন হওয়ার সম্ভাবনা কম। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৮ ধারা অনুসারে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশু আটক করা মুক্তিপণের অপরাধ। তবে ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন শিশু সম্পর্কিত ছিল। ঐ আইনের ১৩ ধারা অনুসারে মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে অপহরণ করা বা আটক রাখায় মুক্তিপণ আদায়ের অপরাধ সংঘটিত হতো। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৬৫]

২.১.৮. দহনকারী পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত অপরাধ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০–এর ৪ ধারার অপরাধ দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ। এ অপরাধগুলি নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ এর ৪ ও ৫ ধারার আওতাভুক্ত ছিল। উল্লিখিত ঐ প্রকারের পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটানোসহ নিম্নবর্ণিত আঘাতগুলি নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ এর আওতাভুক্ত ছিল:

(১) ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ (corrosive substance) দ্বারা কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটানো।[৬৬] (২) ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা এমন গুরুতর আঘাত যাতে শিশু বা নারীর, (ক) চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, (খ) মাথা বা মুখমণ্ডল বিকৃত হয়, (গ) শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়, (ঘ) শরীরেব কোনো অঙ্গ বা গ্রন্থি নষ্ট হয়; বা (ঙ) শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ বিকৃত হয়।[৬৭]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ উপরোক্ত মৃত্যু ঘটানো এবং অন্যান্য আঘাতজনিত অপরাধসহ আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ আইনের আওতাভূক্ত অপরাধগুলো নিম্নরূপ:

(১) দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শিশু বা নারীর, (ক) মৃত্যু ঘটানো, (খ) মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা। এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড।[৬৮] (২) দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শিশু বা নারীকে এমনভাবে আঘাত করা যাতে শিশু বা নারীর (ক) দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়, (খ) শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, (গ) মুখ মণ্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হয়। এ প্রকারের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ড।[৬৯] (৩) দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শিশু বা নারীকে এমনভাবে আঘাত করা যাতে শিশু বা নারীর, (ক) শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয়, বা (খ) শরীরের কোনো স্থান আঘাত পায়। এ প্রকারের অপরাধের শাস্তি ৭-১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড।[৭০] (৪) দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোনো নারী বা শিশুর উপর (ক) নিক্ষেপ করা (খ) নিক্ষেপ করার চেষ্টা করা। এতে শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও এ প্রকারের অপরাধের শাস্তি ৩-৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড।[৭১]

২.১.৯. ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে অঙ্গহানি

ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো শিশুর হাত, পা, চোখ বা অন্য কোনো অঙ্গ বিনষ্ট করা বা অন্য কোনোভাবে বিকলাঙ্গ করা বা বিকৃত করা অঙ্গহানি সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটন করে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১২ ধারায় এ অপরাধ শাস্তিযোগ্য। এ প্রকারের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।[৭২]

২.১.১০. সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ

অনেক ঘটনা অনেক সময়ে সংবাদযোগ্যতার গুরুত্ব পায়। কিন্তু অপরাধের এমন কিছু তথ্য আছে যা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ নিষিদ্ধ। তাই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অপরাধ বিষয়ক ঘটনা সংবাদযোগ্যতা রাখলেও যে নারী বা শিশু এরূপ অপরাধের শিকার সে নারী বা শিশুর পরিচয় বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন নিষিদ্ধ। সংবাদ মাধ্যমে এরূপ অপরাধের শিকার নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না করার নিষেধাজ্ঞা লংঘন করা অপরাধ। সংবাদ মাধ্যমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংবাদ প্রকাশের এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১৪ ধারানুসারে তিনি বা তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন। এর শাস্তি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা একত্রে উভয় দণ্ড।[৭৩]

২.২ . বিচার সম্পর্কিত নিয়ম

Adjective Law তথা বিচার কার্যবিধি সংক্রান্ত আইন হচ্ছে বিচার কার্য পরিচালনা করার নিয়ম-কানুন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে বিচার বিষয়ক আইনের উন্নয়ন অর্থ বিচার পদ্ধতির প্রবহমান গতিকে অধিকতর কার্যকর করা এবং তাকে অপরাধীর জন্য ভয়াবহ করা। অপরাধ দমনে কেবল দণ্ড নয় বিচার পদ্ধতির কাঠিন্যও যাতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনমূলক হয় সে লক্ষ্যে বিচার বিষয়ক নিয়ম প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশের সকল অপরাধের বিচারের জন্য অনুসরণ করা হতো ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি। বিচার পরিচালনার জন্য এটি প্রধান আইন। এ আইনের কিছু ধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রণীত হয় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন, যার অধীনে অন্যান্য অপরাধের বিচারের পাশাপাশি Special Tribunal-এ সর্বপ্রথম নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৯৫ সালের প্রণীত হওয়া নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন সম্পূর্ণ পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠাসহ নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধগুলোকে ঘৃণ্য অপরাধ গণ্য করে এবং তার বিচার পদ্ধতির বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কাঠিন্য ও রূঢ়তা দেয় যা দণ্ডতুল্য এবং বিচারপূর্ব দণ্ডের সামিল। এ আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের নাম হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত।[৭৪] প্রচলিত ঐসব নিয়মের অন্তর্ভুক্তিসহ ২০০০ সালে নতুন কিছু নিয়ম সমৃদ্ধ হয়ে প্রণীত হয় ২০০০ সালের নারী ও শিশু

নির্যাতন দমন আইন। এতে পরিবর্তন আনা হয় আদালতের নামের। নাম রাখা হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল।[৭৫] বর্তমানে বাংলাদেশে বিচার পরিচালনায় এ আইনের সুস্পষ্ট বিধানসহ ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিভিন্ন নিয়মে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধের অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিচারের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

২.২.১. নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ দমনে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির নিয়মাবলী

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কার্যকরতা দিয়েছে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বেশ কিছু বিষয় প্রণীত হওয়ায় ঐ বিষয়গুলোর বিধান সাপেক্ষে কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধিরি বিধানাবলিকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৭৬]

নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধের বিচারের আদালতকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হলেও তা একটি ফৌজদারি আদালত এবং এই ট্রাইব্যুনাল অপরাধ বিচারের জন্য স্বীকৃত দায়রা আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

ফৌজদারি কার্যবিধিতে ফৌজদারি কার্যক্রমের বিভিন্ন নিয়ম, অনুসন্ধান, বিচার, আসামি গ্রেফতার ও অপরাধ দমন ও তদন্তে পুলিশের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির বিভিন্ন ভাগে এসব নিয়ম বিধৃত আছে। কার্যবিধির নয়টি ভাগের প্রথম ভাগে প্রাথমিক বিষয়; দ্বিতীয় ভাগে ফৌজদারি আদালতের গঠন, শ্রেণী, ক্ষমতা; তৃতীয় ভাগে আসামি গ্রেফতারসহ অন্যান্য সাধারণ বিধান; চতুর্থ ভাগে অপরাধ দমন বা নিবারণ; পঞ্চম ভাগে বে-আইনি সমাবেশ, গণউৎপাতসহ পুলিশে সংবাদ প্রদান ও পুলিশের তদন্তের ক্ষমতা; ষষ্ঠ ভাগে ফৌজারিতে সোপর্দ করার কার্যক্রম অর্থাৎ মামলার বিচার নিষ্পত্তি বিষয়ক নিয়ম; সপ্তম ভাগে আপিল, রেফারেন্স ও রিভিশন/মোশান; অষ্টম ভাগে বিশেষ কার্যক্রম; এবং নবম ভাগে জামিন, জামিননামা, ইত্যাদি বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে।

অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ফৌজদারি কার্যবিধিতে দণ্ডবিধির কতকগুলো অপরাধকে আপোষযোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর কিছু আদালতের অনুমতিতে এবং কিছু অনুমতি ব্যতীত আপোষ করা যায়।[৭৭] অবশিষ্ট অপরাধগুলো আপোস-অযোগ্য। এগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

২.২.২. জামিন

অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আসামির জামিনে মুক্ত থাকা বা না থাকা ফৌজদারি মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল ফৌজদারি অপরাধেরই নিজ নিয়মে জামিন নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০থ-এর বিধানে নারী নির্যাতনমূলক অপরাধের জামিন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫-এর বিধানের অপরাধের জামিনের বিষয় ঐ আইন নিয়ন্ত্রিত ছিল। তার পূর্বের প্রচলিত The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983-এর আওতাধীন অপরাধের জামিনের বিষয় The Special Powers Act, 1974-এর বিধান নিয়ন্ত্রিত ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ জামিন অযোগ্য। এ আইনগুলোর নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ প্রসঙ্গে জামিন বিধানের ক্রমবিকাশ নিম্নে আলোচিত হলো:

১৯৭৪ সালের The Special Powers Act, 1974 আইনের অধীন বিচার্য অপরাধের জামিন সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ:

Offences to be cognizable and non-bailable

Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the timebeing in force, --

a) ... ...

b) ... ...

c) No person accused or convicted of an offence triable under this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless –

(i) The prosecution has had opportunity of being heard in respect of the application for such release; and

(ii) Where the prosecution opposes the application, the Magistrate, Special Tribunal or Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is guilty of the offence.[৭৮]

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ আইনের জামিনের বিধান মামলার তদন্তের সাথে অনেকাংশে সম্পর্কযুক্ত। প্রাসঙ্গিক বিধান নিম্নে উল্লিখিত হলো:

অপরাধের তদন্ত

(১) এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত কাজ অপরাধটির সংঘটনের রিপোর্ট প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময় সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে আদালত তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ তিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে উপধারা (১) এ নির্ধারিত ও বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর আদালত কোনো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা অন্য কোনো কারণে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে কোনো অপরাধের উপর আরও তদন্ত হওয়া সমীচীন ও প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আদালত, অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন ও অন্যান্য বিষয়ে তৎকর্তৃক নির্দেশ সাপেক্ষে অতিরিক্ত সময়ের জন্য তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) এ নির্ধারিত তদন্তের সময়সীমা পর্যন্ত আসামীদের জামিন মঞ্জুর করা যাইবে না।

(৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তদন্ত সম্পন্ন না হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত আসামীকে মুক্তি দিতে পারিবে এবং জামিন মঞ্জুর না করা হইলে সেই জন্য কারন লিপিবদ্ধ করিবে।[৭৯]

জামিন সংক্রান্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর প্রাসঙ্গিক বিধান নিম্নরূপ:

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ইত্যাদি

(১) ... ...

(২) এই আইনের অধীনে সকল অপরাধ অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত বা শাস্তিযোগ্য কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি –

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন; এবং

(গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট না হন।[৮০]

জামিন বিষয়ক আদালতের ঐ ক্ষমতা একটা পর্যায় তথা মামলার তদন্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায় নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ দ্বারা।[৮২] ফলে তদন্ত কালের ৬০ অথবা ৯০ দিন আদালতের জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীনতা ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ নারী নির্যাতনমূলক

অপরাধকে অজামিনযোগ্য করেছে। অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ দেওয়া সাপেক্ষে ১৯ ধারায় বর্ণিত অপরাপর কারনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যায়। আবার মামলা প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করা না গেলে আদালত আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন।[৮৩] ফলে আদালতের জামিন দানের অক্ষমতা কাটে। তবে কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা The Special Powers Act 1974–এর মত আরোপিত হয়। অভিযোগকারীকে সুযোগ না দিয়ে জামিনের শুনানি করা যাবে না বিষয়ক ২০০০ সালের আইনের ধারা ১৯ (২) (ক) জামিন সংক্রান্ত বিধান অভিযুক্তের জামিনে একটি বড় বাধা।

২.২.৩. অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি এবং আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অন্যান্য প্রকারের দণ্ডের সাথে অর্থদণ্ডের বিধান দিয়েছে। আরোপিত অর্থদণ্ডের অর্থ আদায় ও আদায়কৃত অর্থ ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান ৪(৪) ও ১৬ ধারায় বর্ণিত আছে। ঐ আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত দহনকারী পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অর্থ দণ্ড আরোপ করা হয়। এ অর্থদণ্ড আদায় প্রসঙ্গে ঐ ধারার সাথে সুস্পষ্ট বিধান আছে। তা নিম্নরূপ:

> এ ধারার অধীন অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুন যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।[৮৪]

অর্থদণ্ড আদায় ও তার ব্যবহার বিষয়ক উপরোক্ত বিধান ছাড়াও একটি সাধারণ অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০–এ বর্ণিত আছে। উক্ত নিয়ম নিম্নরূপ:

অর্থদণ্ড ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি

এই আইনের অধীনে কোনো অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল সন্নিষ্ট জেলার কালেক্টরেট, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইবুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।[৮৫]

ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিধান ছাড়াও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পত্তি বিষয়ে নিম্নরূপ বিধান প্রাসঙ্গিক:

> **ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে অর্থদণ্ড আদায়:** এই আইনের ধারা ৪ হইতে ১৪ পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবি অপেক্ষা উক্ত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ প্রাধান্য পাইবে।[৮৬]

২.২.৪. অপরাধের আমলযোগ্যতা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০–এর অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ আমলযোগ্য তথা বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable)[৮৭] অপরাধ।[৮৮] নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫–এর অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধও একইরূপ আমলযোগ্য ছিল।[৮৯] The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983–এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ The Special Powers Act 1974 এর আওতায় Cognizable ছিল।[৯০] অপরাধ আমলযোগ্য হওয়ার অর্থ অপরাধের অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে ১৯৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ ধারা অনুসারে পুলিশ তদন্ত কাজ শুরু করতে পারে।[৯১] এরূপে অপরাধের অভিযুক্তকে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে।[৯২]

২.২.৫. অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

দীর্ঘ দিনের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতিতে পরিবর্তন গৃহীত হয় বিশেষ আইনে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানে দুই পদ্ধতিতে অভিযোগ দায়ের করা যায়। যথা: (১) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ[৯৩] এবং (২) থানায় এজাহার[৯৪] দায়ের। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে আদালত মামলা গ্রহণ, খারিজ[৯৫] বা অভিযোগের সত্যতা বা ভিত্তিহীনতা নির্ধারণের জন্য গ্রহণ-পূর্ব তদন্তের[৯৬] ব্যবস্থা করতে পারে। Cognizable Case-এর থানায় এজাহার দায়ের মূলত মৌখিক বা লিখিতভাবে অপরাধ বিষয়ে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে হয়।[৯৭] Non-cognizable case এর ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন নিয়ে পুলিশ মামলায় তদন্ত পরিচালনা করে এবং আসামি গ্রেফতার বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়।[৯৮] Cognizable offence বিষয়ে পুলিশের ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের প্রয়োজন হয় না।[৯৯] ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ দায়ের বিষয়ক এ সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983 নারী নির্যাতন বিষয়ক অপরাধ The Special Powers Act, 1974 -এর আওতাভুক্ত করে। ফলে নারী নির্যাতন বিষয়ক ১৯৮৩-এর Ordinance-ভুক্ত সকল অপরাধ The Special Powers Act, 1974-এর ২৭ ধারার অধীন চলে যায়। এর ফলে কমপক্ষে সাব ইনস্পেক্টরের পদ মর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত Special Tribunal কোনো অভিযোগ আমলে নিতে পারেন না।[১০০] এই পদ্ধতিগত নিয়ম ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রবর্তিত হয়।[১০১] ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান নিম্নরূপ:

> **ট্রাইবুনালের এখতিয়ার:** (১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোনো ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোনো ট্রাইব্যুনাল কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করবে না:
>
> তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে অভিযোগকারী এই উপধারার অধীন কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্তরূপ রিপোর্ট ব্যতিরেকে সরাসরি উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।[১০২]

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ সংক্রান্ত উপরোক্ত একই বিধান ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীন সকল অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলে ১৪ ধারার সংবাদ মাধ্যমে পরিচয় প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা লংঘনের অভিযোগ দায়েরও ঐ একই নিয়মের অধীন।

আলোচনা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে বাংলাদেশে প্রচলিত সর্বশেষ প্রণীত ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। তা Substantive ও Adjective Law সমন্বয়ে প্রণীত। এ আইন দ্বারা নারী ও শিশু রক্ষার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নারী ও শিশুর বিরুদ্ধের আক্রমণকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলোর জন্য মৃত্যুদণ্ড থেকে যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তনও গ্রহণ করা হয়েছে। এ আইনের বিধান সাপেক্ষে ফৌজদারি কার্যবিধি বিভিন্ন বিধান দ্বারা মামলার বিচার নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে ফৌজদারি আইনের সহযোগিতা যাতে ব্যর্থ না হয় সে জন্যে অপরাধীর বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ ও সোচ্চার এবং নারী ও শিশুকেও অপরাধ এলাকা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। তাতে অপরাধ দমনে সাফল্য আসার সম্ভাবনা বেশি।

নারী ও শিশু অপরাধ দমনে এ আইনের কার্যকারিতা যে সুবিধা ও অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্নে সেগুলো আলোচিত হলো:

(১) জামিন ও অপরাধের আমলযোগ্যতা

অপরাধের অজামিনযোগ্যতা বিচারপূর্ব দণ্ডের সমতুল্য। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর আওতাভুক্ত অপরাধ অজামিনযোগ্য হওয়ায় সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ প্রমাণের পূর্বেই আমলযোগ্য মামলায় অভিযুক্তের ঐরূপ বিচার পূর্বদণ্ড ভোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে। নিম্ন আদালত অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এরূপ মামলায় জামিন প্রদানে সতর্কতা থাকে। স্বয়ং ট্রাইবুনালেও এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে হত্যা বিষয়ক অপরাধগুলো ব্যতীত অন্য সকল অপরাধ অআমলযোগ্য (Non-cognizable) করার বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে ধারা ৪(১), ৪(৩), ৫, ৬, ৭, ৮, ৯(খ), ১০(১), ১০(২) এবং ১১(ক) ও ১১(খ) ধারার অপরাধগুলো আমলঅযোগ্য হলে প্রথমেই আদালতের নোটিশে আসবে অভিযোগ এবং বিচারিক দৃষ্টিতে গহণ করা যাবে ব্যবস্থা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এতে সুবিচারের সম্ভাবনা থাকবে অনেক বেশি।

উল্লিখিত অপরাধগুলি অআমলযোগ্য করার পাশাপাশি জামিনযোগ্য করতে হবে। অধিকার বলে অভিযুক্ত মুক্ত থাকতে পারবে। আইনের চরিত্র আইনকে misuse করার সুযোগ নষ্ট ও বন্ধ করবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে রেখে মামলার তদন্ত এবং বিচার ও নিষ্পত্তি সম্ভব। শুরু থেকেই আসামির অনুপস্থিতি বিচারকে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে পারে না। বিচার ও জামিন দুটি ভিন্ন প্রবহমানতা। এ কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত জামিন বিষয়ক বিধান আক্ষরিকভাবে পরিবর্তণ না হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা উচ্চকিত করতে জামিন দেওয়ায় ধীর হওয়া উচিত নয়।

(২) অর্থদণ্ডের পরিমাণ ও নির্ধারণ পুনর্নির্ধারণ

নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ড এখন অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তা অপরাধ প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক। অর্থদণ্ডেরও এরূপ ভূমিকা আছে। দণ্ডের অর্থ ক্ষতিগ্রস্তকে প্রদান করা হলে সে বা তার পরিবার অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। যার কাছে অর্থের মূল্য যত বেশি অর্থদণ্ড তার জন্য তত গুরুতর। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের কিছু অপরাধের অর্থদণ্ডের কথা বলা থাকলেও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। এগুলোর পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের পাশাপাশি নির্ধারিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ টাকার অবমূল্যায়নের সাথে সাথে পুনর্নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

(৩) অপরাধ আপোষযোগ্যতা

বিরোধের আপোস মীমাংসা মানুষের একটি সহজাত অধিকার। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অপরাধের আপোস মীমাংসা সুস্পষ্ট বিধি দ্বারা রুদ্ধ করা না থাকলেও কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে অআপোষযোগ্য গণ্য হয়ে আসছে। পক্ষদের মধ্যে আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে না। ফলে আপোস মীমাংসার ক্ষেত্রে পক্ষদেরকে বিকল্প পথ বেছে নিতে হচ্ছে। মামলার রেকর্ডে আপোসের কথা লেখা হচ্ছে না বলে পক্ষদের জবানবন্দী, জেরা, পুনঃপরীক্ষার কৌশলগত উপস্থাপনা মামলার নিষ্পত্তিতে আপোসের ফলাফল দিচ্ছে। এ আইনে অনেক মামলা আছে যা আপোষ নিষ্পত্তি হতে পারে। যথা – ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার, যৌতুক ইত্যাদি। অর্থ বা অন্যবিধ সুবিধার বিনিময়ে আপোস মীমাংসা দ্বারা পক্ষরা বিরোধ নিষ্পত্তি করে পরবর্তী কালে অনেক সময়ে একই সাথে জীবন যাপন করে থাকে। এ আইনের অধীনের মামলাগুলো আপোসযোগ্য হলেও অনেক বিরোধ আপোসে নিষ্পত্তি সম্ভব হবে এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে দ্রুততা আসবে।

(৪) অপরাধের সংজ্ঞা

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ কতকগুলো পদ আছে যার ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট আইন নীরব। যেমন যৌন হয়রানির জন্য শ্লীলতাহানি এবং অশোভন অঙ্গভঙ্গি। অভিধানে এগুলোর প্রচুর অর্থ হয়। তাতে কোনো আচরণই অপরাধের আওতামুক্ত থাকতে পারে না। তাছাড়া কতকগুলো অপরাধের চেষ্টা সহজে মামলা বাধানোর সুযোগ করেছে। যেমন ধারা ৪(১) দহনকারী পদার্থ ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা, ধারা ৪(৩) দহনকারী পদার্থ ইত্যাদি নিক্ষেপ করার চেষ্টা, ধারা ৯(৪)(খ) ধর্ষণের চেষ্টা, ধারা ১১(ক) যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা, ধারা ১১(গ) যৌতুকের জন্য আহত করার চেষ্টা। এ সকল ধারায় কোনো ব্যাখ্যা সংযোজন নেই। চেষ্টা বিষয়ক অপরাধ সংঘটনে The Penal Code 1860-এর স্পষ্টতার মতো এ আইনের স্পষ্টতার প্রয়োজন।

Penal Code-এ ব্যবহৃত ৩০৯ (আত্মহত্যার চেষ্টায়) এবং ৫১১ (অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা) ধারায় ঐ সম্পর্কিত একটি বাক্য হচ্ছে does any act towards the commission of such offence; এজন্য অপরাধের চেষ্টা সম্পর্কিত দণ্ডবিধির ৩০৯ ও ৫১১ ধারায় ব্যবহৃত বাক্যাংশ বা উদাহরণ বা ব্যাখ্যা এ আইনের চেষ্টা বিষয়ক অপরাধের ধারায় সংযোজিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) অপরাধের অভিযোগ দায়ের

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের ও তা বিচারার্থে গ্রহণ ঐ আইনের ২৭ ধারার নিয়ম নিয়ন্ত্রিত। ফলে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ১৪(১) ধারার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের ঐ পদ্ধতির আওতাভুক্ত। নির্যাতিতা নারী বা শিশুর পরিচয়ের সংবাদ প্রকাশে এদের বিরুদ্ধে দুটি অপরাধ সংঘটিত হয়। শেষোক্তটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের সহজ করা হলে অন্তত সংবাদ প্রকাশে সতর্কতাসহ অন্যান্য ভালো অবস্থা হতে পারে।

(৬) বিচারের স্থানের নাম

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর অপরাধ বিচারের জন্য গঠিত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনাল শব্দের বদলে আদালত শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইতিপূর্বেরটিতে আদালত শব্দ ছিল। এরূপ হলে বিচারের স্থানের নাম হবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত।

(৭) উত্তরাধিকারে অগ্রাধিকার

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১৫ ধারার ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হতে অর্থদণ্ডের অর্থ আদায় সম্পর্কিত বিধান, মুসলমানের উত্তরাধিকার নিয়মে সম্পত্তি বণ্টনের অগ্রাধিকারে পরিবর্তন দিয়েছে। এ আইনের অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ দাবি অংশীদারের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বেই পরিশোধযোগ্য হয়েছে।

উপসংহার

একটি আইন সকল পক্ষের মধ্যে সমান ব্যবস্থার অঙ্গীকার। কিন্তু এতে দু তিনটি পক্ষ হয়ে যায়। কেউ সুবিধা ভোগ করে। কেউ অসুবিধায় পড়ে। বিশেষ উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রণীত। তা নারী ও শিশুর বিশেষ ত্রাতা। সাহায্যকারী এ আইনের বিধানের কার্যকারিতা বা অকার্যকর অবস্থা এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে বা ব্যর্থ করতে পারে। যাদের নির্যাতনমূলক অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার সম্ভাবনা তারা অকার্যকর অবস্থার ফলাফল প্রত্যাশী। আবার যারা নির্যাতনের শিকার তারা কঠোরভাবে কার্যকর হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। কিন্তু আইনের কঠোরতম অপরাধের সংজ্ঞায়ন এবং অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর বিধান প্রকৃতপক্ষে ও অর্থে এ আইনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিপতিত করেছে। অভিযোগকারীর ভূমিকায় নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ এ আইন প্রয়োগের সুযোগ গ্রহণ দ্বারা এ আইনকে অপব্যবহারের সুযোগ যেমন নিতে পারে, তেমন এ আইনের বিভিন্ন বিধানের দ্বারা যাদের উপর এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের দ্বারা এ আইন অপব্যবহারের সুযোগও অনেক বেশি। ফলে সকলেরই সমান অংশ-গ্রহণে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ Substantive ও Adjective law এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:
Law defines the rights. which it will aid and specifies the way in which it will aid them. So far as it defines. thereby creating. it is 'substantive law'. So far as it provides a method of aiding and protecting. it is 'Adjective law'. Dr Tahir Mahmood. *N.S. Bindra Interpretation of Statutes*. 7th ed.. (Allahabad: The Law Book company (p) Ltd.. 1984). p.645.

২ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(২০০০ সালের ৮ নং আইন)*, ধারা ২ (ছ)।

৩ প্রাগুক্ত, ধারা ২ (ট)।
৪ ২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন।
৫ *The Code of Criminal Procedure 1898* (Act V of 1898).
৬ (Act XIV of 1974).
৭ Ordinance No.LX of 1983.
৮ ২০০০ সালের ৮ নম্বর আইন।
৯ *The Penal Code, 1860,* Section 375.
১০ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ২(গ)।
১১ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ২(ঙ)।
১২ প্রাগুক্ত, ধারা ৯।
১৩ *The Penal Code, 1860,* Section 376.
১৪ *The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983*, Section 7.
১৫ প্রাগুক্ত, ধারা ৮।
১৬ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ৬।
১৭ প্রাগুক্ত, ধারা ৭।
১৮ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ৯(১)।
১৯ প্রাগুক্ত, ধারা ৯(২)।
২০ প্রাগুক্ত, ধারা ৯(৩)।
২১ প্রাগুক্ত, ধারা ৯(৪)(ক)।
২২ প্রাগুক্ত, ধারা ৯(৪)(খ)।
২৩ প্রাগুক্ত, ধারা ১৩।
২৪ প্রাগুক্ত, ধারা ১০(১)।
২৫ প্রাগুক্ত।
২৬ প্রাগুক্ত, ধারা ১০(২)।
২৭ আব্দুর রহিম (সংকলিত), *সোনার বাঙলা অভিধান* (ঢাকা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৩৮২), পৃ. ১০৭৮।
২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।
২৯ প্রাগুক্ত, ধারা ১০(২)।
৩০ *The Dowry Prohibition Act 1961.*
৩১ *The Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976.*
৩২ Act XXXV of 1980.
৩৩ *The Dowry Prohibition Act,* 1980, Section 2.
৩৪ *The Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance 1983*, Section 6.
৩৫ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ১০(১)।
৩৬ প্রাগুক্ত, ধারা ১০(২)।
৩৭ প্রাগুক্ত, ধারা ১১।
৩৮ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ২(ঞ)।
৩৯ প্রাগুক্ত, ধারা ১১।
৪০ প্রাগুক্ত, ধারা ১১(ক)।
৪১ প্রাগুক্ত।
৪২ প্রাগুক্ত, ধারা ১১(খ)।
৪৩ প্রাগুক্ত।
৪৪ Ejusdem generis পদের অর্থ একই ধরন বা প্রকৃতির (of the same kind or nature). Dr. Tahir Mahmood, *N.S. Bindra interpretation of Statutes*, 7th ed., (Allahabad: The Law Book Company (P) Ltd., 1984). P.337.
৪৫ আব্দুর রহিম (সংকলিত), *সোনার বাঙলা অভিধান*, পৃ. ৭৬৫।
৪৬ দণ্ডবিধি, ৩৬৩ খ।
৪৭ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ৫।
৪৮ প্রাগুক্ত, ধারা ৫(১)।
৪৯ প্রাগুক্ত, ধারা ৫(২) ৫(৩)।

৫০ প্রাগুক্ত, ধারা ৬(১)।
৫১ প্রাগুক্ত, ধারা ২(ঢ়)।
৫২ প্রাগুক্ত, ধারা ৬(২)।
৫৩ দণ্ডবিধি, ৩৬২।
৫৪ ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৩৩।
৫৫ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ২(খ)।
৫৬ প্রাগুক্ত, ধারা ৭।
৫৭ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ৯।
৫৮ দণ্ডবিধি, ৩৬৪।
৫৯ দণ্ডবিধি, ৩৬৫।
৬০ দণ্ডবিধি, ৩৬৬।
৬১ ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং যৌতুক নিরোধ আইন*,(ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৩৪।
৬২ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ৭।
৬৩ প্রাগুক্ত, ধারা ২(গ)।
৬৪ প্রাগুক্ত, ধারা ২(জ)।
৬৫ প্রাগুক্ত, ধারা ৮।
৬৬ প্রাগুক্ত, ধারা ৪।
৬৭ প্রাগুক্ত, ধারা ৫।
৬৮ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(১)।
৬৯ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(২)(ক)।
৭০ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(২)(খ)।
৭১ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(৩)।
৭২ প্রাগুক্ত, ধারা ১২।
৭৩ প্রাগুক্ত, ধারা ১৪(২)।
৭৪ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ১৬।
৭৫ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ৩৪(৪)।
৭৬ প্রাগুক্ত, ধারা ২৫(১)।
৭৭ দণ্ডবিধি, ৩৪৫।
৭৮ The Special Powers Act, 1974, Section 32.
৭৯ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ১৮।
৮০ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ১৯।
৮২ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ১৮(৩)।
৮৩ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ২০(৪)।
৮৪ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(৪)।
৮৫ প্রাগুক্ত, ধারা ১৬।
৮৬ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫।
৮৭ Cognizable পদটি Cognizsble offence ও Cognizable case হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে তার সংজ্ঞা দেওয়া আছে। প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত এ পদের সংজ্ঞা তার ফলাফল বর্ণনা করে। (1) 'Cognizable offence' এবং 'Cognizable Case' এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে - 'cognizable Offence' means an offence for, and 'Cognizable Case' means a case in, which a police officer, may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant. - *The Code of Criminal Procedure 1898* Section 2(f). (2) Cognizable এর বিপরীত পদ Non-Cognizable; এই Non-cognizable offence এবং Non-Cognizable Case এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে Non-Cognizable offence' means an offence for, and 'non-cognizable case' means a case in, which a police officer, may not arrest without warrant. *The Code of Criminal Procedure 1898*, Section 2(n).
৮৮ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ১৯(১)।
৮৯ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ২৬(১)।
৯০ *The Special Powers Act, 1974*, Section 32.
৯১ *Abdul Huq* v. *State* 29 DLR 428

৯২ The Code of Criminal Procedure 1898, Section 2(f).
৯৩ প্রাগুক্ত, ধারা ২০০।
৯৪ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫৪।
৯৫ প্রাগুক্ত, ধারা ২০৩।
৯৬ প্রাগুক্ত, ধারা ২০২(১)।
৯৭ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫৪।
৯৮ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫৫।
৯৯ প্রাগুক্ত, ধারা ২(চ)।
১০০ *The Special Powers Act, 1974*, Section 27(1); *Siraj Miah* v. *Bangladesh* 32 DLR(AD) 35
১০১ *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫*, ধারা ১৭(১)।
১০২ *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০*, ধারা ২৭(১)।

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪০৭:৮

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার ভল্যুম ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার ভল্যুম ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার ভল্যুম ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার ভল্যুম ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৯৭)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I–XXIV (1976-2001)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S. A. Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal And Assam *(1905-1911)* by M.K.U.Mollah (1981)

Provincial Autonomy in Bengal *(1937-1943)* by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi: Its Past and Present (Seminar Volume 4) edited by S.A. Akanda (1983)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A. Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal: Mughal Period, Vol. 1 & 2 by Abdul Karim (1992, 1995)

The **Institute of Bangladesh Studies: An Introduction** (2000)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index by Md. Shahjahan Rarhi (1993)

Socio-Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore (1883-1925) by Muhammad Muhibullah Siddiquee (1997)

Research Resources of IBS: Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

৯ম সংখ্যার সূচিপত্র

ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে নীল চাষ: নীলকর ও নীল চাষির সম্পর্ক
মো. রেজাউল করিম ১

উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব: একটি দার্শনিক সমীক্ষা
এম শফিকুল আলম ১৭

ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা
আব্দুল্লাহ আল মামুন ২৭

চর্যাপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য
কৃষ্ণপদ মণ্ডল ৪৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে লোকজীবন
শহীদ ইকবাল ৬৩

বাইবেল-কথার নবরূপায়ণ: সত্যেন সেনের উপন্যাস
সৌমিত্র শেখর ৭৩

চল্লিশের দশকে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা
শরীফা সালোয়া ডিনা ৮৯

বাংলাদেশের নকশি কাঁথা
আবু তাহের ১০৭

বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটি-ফলকে গল্পচিত্রণ: ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতিফলন
আবদুল মতিন তালুকদার ১১৭

বাংলার দৃশ্যশিল্পে উপনিবেশবাদ ১৮৩৯-১৯৪৭
মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী ১২১

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তারণের ধরন
মোঃ কামরুজ্জামান
মোঃ একরামুল হক
মোঃ আবু হানিফ শেখ ১৩৩

সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা
মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী ১৪৫

খুলনা মহানগরীর মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে নগরবাসীর অংশগ্রহণ
মোঃ গোলাম মরতুজা ১৫৩

সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ: রাজশাহীর সংবাদপত্রের উপর একটি সমীক্ষা
মোঃ খাদেমুল ইসলাম ১৫৯

বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের প্রবণতা: একটি পর্যালোচনা
মোঃ রুহুল আমিন ১৬৯

বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি আধুনিকীকরণ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব
মোঃ মাসুদ পারভেজ রানা
সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী ১৮১

বিশ্বায়ন ও নয়া তথ্য প্রযুক্তির অতিকথন ও বাস্তবতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
তানভীর আহমদ
আকতার জাহান ১৯১